১০ই নভেম্বর স্মরণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

"যে যত আদর্শবান, সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী,
সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শি হতে পারে।"

"ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তিত
হওয়ার গুণ–এই তিন গুণের অধিকারী না হলে
প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।"

"যারা মরতে জানে পৃথিবীতে তারা অজেয়।
যে জাতি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে
পারে না, পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন
অধিকার থাকতে পারে না।"

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

'পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।'

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

'বাংলাদেশের ৮৫% লোক কৃষক। আজকে যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে ফসল ফলাচ্ছে, তাদের ভাগ্য আগে যে অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থায় রয়েছে, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। কৃষকরা ভাঙ্গা ঘরে বাস করে। বর্ষা এসে গেলে বৃষ্টির পানিতে তাদের বিছানাপত্র ভিজে যায়। যে শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে কলের চাকা ঘোরাচ্ছে, তাদের অবস্থার কি করা হয়েছে? এই কৃষক আর শ্রমিক আমাদের দেশের মূল শ্রমশক্তি। খাদ্য উৎপাদন এবং কল-কারখানা থেকে আমাদের যেসব জিনিসপত্রের প্রয়োজন রয়েছে, সেই প্রয়োজন পূরণ করার ভার কৃষক আর শ্রমিকের উপর। কৃষক এবং শ্রমিকের মুক্তি আনতে হবে।'

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

১০ই নভেম্বর স্মরণে

তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০১৪

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss-cht.org

মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/পৃষ্ঠা i - ii

প্রবন্ধঃ স্মৃতি তর্পণ
বিভেদপন্থীদের 'দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই'..... ❑ উদয়ন তঞ্চঙ্গ্যা/পৃষ্ঠা ১
লারমা ঃ মুক্তিকামী মানুষের স্বপ্নসারথী ❑ বসুমিত্র চাকমা/পৃষ্ঠা ৫
জুম্ম জাতির অস্তিত্বের সংকট ও এম এন লারমার প্রাসঙ্গিক ভাবনা ❑ ধীর কুমার চাকমা/পৃষ্ঠা ৮
রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর ঃ প্রয়াত নেতা তোমার জন্য একটি খোলা চিঠি ❑ বাচ্চু চাকমা/পৃষ্ঠা ১৩
জীবন দিয়ে এম এন লারমার যে শিক্ষা তা ভুলে যাবার নয় ❑ রিপেশ চাকমা/পৃষ্ঠা ১৬
দশই নভেম্বর নিয়ে কিছু স্মৃতি, অতঃপর কিছু কথা ❑ হেলি চাকমা/পৃষ্ঠা ২০
এম এন লারমা : জুম্ম জাতীয় চেতনার স্ফুলিঙ্গ ❑ তেজোদীপ্ত চাকমা অজিত/পৃষ্ঠা ২২
জুম্ম নারী আন্দোলনে এম এন লারমা ও আদিবাসী নারীদের বর্তমান অবস্থা ❑ জড়িতা চাকমা/পৃষ্ঠা ২৫
বন্দুকভাঙ্গার কৃতি সন্তান শহীদ বনমালী চাকমা (মানস) ❑ সত্যবীর দেওয়ান/পৃষ্ঠা ২৮
প্রীতিষবাবুর আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি ❑ ধীর কুমার চাকমা ও ঝর্ণা চাকমা/পৃষ্ঠা ৩০

সাক্ষাৎকার
সহপাঠী-সমসাময়িক পরিচিতজনদের স্মৃতিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ❑
সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন- সজীব চাকমা/পৃষ্ঠা ৩৩

প্রবন্ধঃ আদিবাসী অধিকার
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের আদিবাসীদের অবস্থা ❑ গৌতম কুমার চাকমা/পৃষ্ঠা ৩৯
ফারুয়া সফরের কিছু অনুভূতি ❑ মোনালিসা চাকমা/পৃষ্ঠা ৫১

কবিতা/পৃষ্ঠা ৫৩ - ৫৪
মানবেন্দ্র, একজন রাজনীতির কবি ❑ আনন্দ জ্যোতি চাকমা
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ❑ শরৎ জ্যোতি চাকমা
আহ্বান ❑ জুয়েল চাকমা

বিশেষ প্রতিবেদন/পৃষ্ঠা ৫৫ - ৮১
দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর ঐতিহাসিক জয়
৪র্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ঃ জনসংহতি সমিতির সমর্থিত ৮ জন চেয়ারম্যান, ১০ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ৯ জন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত
'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহারে সরকারি নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে সারাদেশে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত
দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ায় বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা ঃ সরকারের তালবাহানা নীতি এবং চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রমের ধারা পূর্ববর্তী মেয়াদের মতো অব্যাহত রয়েছে
সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ভূমি বেদখল এবং আদিবাসী জুম্মদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ

সংবাদ প্রবাহ/পৃষ্ঠা ৮২ - ১০৪
জুম্ম নারীর উপর যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা
প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন
সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল
ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা

সাংগঠনিক সংবাদ/পৃষ্ঠা ১০৫ - ১২০

আন্তর্জাতিক সংবাদ/পৃষ্ঠা ১২১ - ১২৪

সম্পাদকীয়

১০ নভেম্বর ২০১৪ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। ১৯৮৩ সালের এই দিনে পৈশাচিক কালো রাত্রে বিভেদ, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা আর জাতীয় স্বার্থ হননের হোতা জুম্ম জাতির ইতিহাসের কলঙ্ক গিরি (ভবতোষ তেওয়ান) – প্রকাশ (প্রীতি কুমার চাকমা) – দেবেন (দেবজ্যোতি চাকমা) – পলাশ (ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান) চক্রের অতর্কিত হামলায় নির্মমভাবে অথচ বীরত্বের সাথে তাঁর আট সহযোদ্ধাসহ তিনি শাহাদত বরণ করেন। সেদিন প্রাণপ্রিয় নেতাকে বাঁচাতে গিয়ে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কাপুরুষোচিত সশস্ত্র আক্রমণ মোকাবেলা করতে গিয়ে অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে মৃত্যুকে বরণ করে অতুলনীয় ত্যাগ ও স্বজাতিপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন নেতার বড় ভাই পিআরসি'র প্রথম সম্পাদক শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান), মেজর পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন), গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের সহকারী পরিচালক অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত), সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অমর কান্তি চাকমা (মিন্তক), উদীয়মান কর্মী মনিময় দেওয়ান (স্বাগত), ডাক্তার কল্যাণময় খীসা (জুনি), সন্তোষময় চাকমা (সৌমিত্র) ও লেন্স কর্পোরেল অর্জন ত্রিপুরা (অর্জুন)। অবিস্মরণীয়, শোকাবহ ও সাহসী আত্মবলিদানের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত এই দিনে প্রয়াত মহান নেতাসহ সেই সাহসী বীরদের জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও লাল সালাম।

১০ই নভেম্বর আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, যে মানুষটি অসচেতন জুম্মজাতিকে জাগিয়েছেন, স্বপ্নহীন মানুষকে দেখিয়েছেন নতুন দিনের স্বপ্ন, অবহেলিত-অবদমিত মানুষকে যুগিয়েছেন মেরুদন্ড খাঁড়া করে দাঁড়াবার শক্তি, পরম মমতা ও ধৈর্য্য দিয়ে মানুষকে ক্ষমা আর মানবতার দীক্ষা দিয়েছিলেন, এমন মানুষকেও ষড়যন্ত্রকারীরা কত সহজে, অবিবেচকভাবে, মানবতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে পারে। আর উপদলীয় চক্রান্তকারী, ক্ষমতালোভী, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিক্রিয়াশীলরা কীভাবে নির্বোধ পতঙ্গের মত এমন আত্মবিধ্বংসী ও ষড়যন্ত্রের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে! ১০ই নভেম্বর আমাদের আরও দেখিয়ে দেয় চার কুচক্রী এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করলেও তাঁর দর্শন, বিপ্লবী চেতনা ও কর্মপ্রেরণাকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি এবং সেই কাপুরুষ, বেঈমান ও অপরিণামদর্শী হত্যাকারীরা চিরতরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, এম এন লারমার মহান আদর্শ ও স্বপ্ন অবিনাশী, অনিবার্য এবং অনস্বীকার্য। যে আদর্শ ও স্বপ্ন জীবনের কথা বলে, মানবতা ও প্রগতির কথা বলে তা দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবেই।

এম এন লারমা ছিলেন জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রথম রাজনৈতিক পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রগতিশীল আদর্শের ধারক বাহক এবং বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত জুম্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা। অপরদিকে তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংসদের একজন পথিকৃৎ ও অনুসরণীয় সাংসদ এবং অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশেরও অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। তিনি চেয়েছিলেন দেশের বাঙালি ও পৃথিবীর অপরাপর অগ্রসর জাতির পাশাপাশি জুম্ম জাতি তথা অপরাপর সংখ্যালঘু জাতিসমূহও স্বকীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে পৃথিবীর বুকে মর্যাদা নিয়ে টিকে থেকে যাতে অপরাপর সভ্য জাতির ন্যায় সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

এম এন লারমার মৃত্যু হলেও তাঁর নীতি-আদর্শ, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, স্বপ্ন, কর্মজীবন ও দিকনির্দেশনাকে অনুসরণ করে তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার গতিতে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তৎকালীন সামরিক ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর নানা ষড়যন্ত্রের মধ্যেও জনসংহতি সমিতি তার আন্দোলনের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব ও ন্যায্যতা দেশের জনগণ ও আন্তর্জাতিক মহলের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। তারই ফলশ্রুতিতে জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান ও এ অঞ্চলের জুম্ম জনগণসহ স্থায়ী অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যে চুক্তিকে সম্মান ও ভরসা করে এবং যে সরকার ও রাষ্ট্রকে বিশ্বাস করে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ সশস্ত্র আন্দোলনের পথ পরিহার করেছে এবং সরকারের কাছে অস্ত্র জমা দিয়েছে, অপরদিকে যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করে সরকার ও রাষ্ট্র সুনাম অর্জন করেছে, রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শান্তির জন্য ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার ও ইন্দিরাগান্ধী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে, সেই সরকার ও রাষ্ট্র বিগত ১৭ বছরেও চুক্তিটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করেনি। চুক্তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়ন করা হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি, এমনকি এখনও পর্যন্ত মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বরঞ্চ চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার বরাবরই গড়িমসি, মিথ্যাচার, তালবাহানা ও কালক্ষেপণ করে চলেছে।

উপরন্তু গভীর উদ্বেগ ও পরিতাপের বিষয় যে, সরকার সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও আপামর জুম্ম জনগণের মতামত ও পরামর্শকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট আইনকে লংঘন করে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, ১ জুলাই ২৯১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন প্রণয়ন করেছে এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যে কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহ সম্পূর্ণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়বস্তু পরিপন্থী এবং জুম্ম জাতীয় স্বার্থ ও অধিকার পরিপন্থী। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা সমাধানে চুক্তি মোতাবেক ভূমি কমিশন আইন সংশোধন, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যকরকরণ, চুক্তি মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ এবং এলক্ষ্যে ভোটার তালিকা বিধিমালা ও নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি কার্যকরকরণ, সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী সেনা, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহারকরণ, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সরকারের কোন কার্যকর ও আন্তরিক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। অপরপক্ষে সাম্প্রতিককালে আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা ও জুম্মদের ভূমি বেদখলের নানা অপচেষ্টা এবং উদ্বেগজনকভাবে জোরদার হয়েছে বিজিবি ও সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে বিভিন্ন জুম্ম বসতি ও জুমভূমি বেদখল বা অধিগ্রহণ করে ক্যাম্প স্থাপন, ক্যাম্প সম্প্রসারণ, পর্যটন কেন্দ্র ও রিসোর্ট, বিলাসবহুল হোটেল-মোটেল স্থাপনের উদ্যোগ যা জুম্ম জনগণকে প্রতিনিয়ত এক বাস্তুচ্যুতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এরই পাশাপাশি চার কুচক্রীর প্রেতাত্মা নব্য বিভেদপন্থী, ক্ষমতালোভী ও ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ ও তার দোসর তথাকথিত সংস্কারপন্থীরা চুক্তিবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চুক্তির পক্ষের মানুষদের খুনসহ সাধারণ মানুষের উপর জোরপূর্বক চাঁদাবাজি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও অকথ্য নিপীড়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। বলাবাহুল্য তারা মুখে গালভরা দাবি-দাওয়ার কথা উচ্চারণ করলেও এবং বিভিন্ন সময়ে সুযোগ বুঝে বিভিন্ন কর্মসূচির নামে নানা নাটকের অবতাড়না করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে এবং জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষাসহ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে চরম ক্ষতিসাধন করে চলেছে। জুম্ম জনগণের প্রগতির পথে তারা আজ চরম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বলাবাহুল্য, ষড়যন্ত্রকারী, বিভেদপন্থী ও সন্ত্রাসীদের দিয়ে কিংবা ষড়যন্ত্র, বিভেদ ও সন্ত্রাসের জাল সৃষ্টি করে এবং বহু মানুষের রক্ত ও অপরিসীম ত্যাগতিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে উপেক্ষা করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে পদদলিত করে কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান এবং এই এলাকায় শান্তি ও উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে না।

তাই এই দিনে জুম্ম জনগণসহ দেশের শান্তিকামী ও মানবতাবাদী সর্বস্তরের মানুষকে আমরা আহ্বান জানাই-- আসুন, সকল প্রকার বিভেদ ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করি।

বিভেদপন্থীদের 'দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই', চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' আর সংস্কারপন্থীদের 'সংস্কার' একই সূত্রে গাঁথা

উদয়ন তঞ্চঙ্গ্যা

১০ই নভেম্বর ২০১৪ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে বিভেদপন্থী, জাতীয় কুলাঙ্গার, বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মহান বিপ্লবী, জুম্ম জনগণের একমাত্র পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর আটজন সহযোদ্ধাসহ নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। বিভেদপন্থীদের এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে সমগ্র জুম্ম জাতিসহ বিশ্বের অধিকারকামী জনগণ যেমন হতবাক হয়েছিল, তেমনি সংগ্রামরত জুম্ম জনতা এসব জাতীয় বেঈমানদের ঘৃণাভরে নিক্ষেপ করেছিল ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

যুগ যুগ ধরে জুম্ম জনগণ সামন্ততান্ত্রিক, উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। বৃটিশ, পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশের শাসনামলে ক্রমাগত শাসন-শোষণের ফলে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যখন চরম সংকটে পর্যবসিত হতে থাকে এবং নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যখন তাদের অধিকার লুণ্ঠিত হতে থাকে তখন মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা হাজির হন জাতীয় মুক্তির মন্ত্র নিয়ে এবং সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত করে তুলেন ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে। তাঁর দূরদর্শী, সুদক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অধিকার হারা জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন যখন এগিয়ে যেতে থাকে দুর্বার গতিতে এবং আন্দোলন যখন হয়ে উঠে অপ্রতিরোধ্য, ঠিক সেই মুহূর্তে পার্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুবিধাবাদী, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু ভবতোষ দেওয়ান (গিরি) – প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ) – দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন) – ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) চার কুচক্রী উপদলীয় চক্রান্তের মাধ্যমে পার্টির মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীরা পার্টির সশস্ত্র বাহিনীকে উস্কানী দিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের এক ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু পার্টির সুদক্ষ নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনীর সতর্কতা ও যোগ্যতার কারণে তাদের সেই ষড়যন্ত্র ভুন্ডল হয়ে যায়। জাতীয় ও আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় সম্মেলন তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করে এবং পুনর্বার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে।

কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বিভেদকামিতা যাদের রক্তের শিরায় শিরায় প্রোথিত তারা কখনোই ঐক্য-সংহতিতে বিশ্বাস করে না। তারা কখনোই বৃহত্তর জাতীয় ও আন্দোলনের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় না। তাই তারা বিভেদ ও ষড়যন্ত্রের ঘৃণ্য পথ থেকে সরে না এসে পার্টির অভ্যন্তরে থেকে পার্টির বিরুদ্ধেই অব্যাহতভাবে বিভেদ ও ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। তারা সমগ্র পার্টির মধ্যে এক চরম সঙ্কট ও অচলাবস্থা সৃষ্টির অপতৎপরতা চালাতে থাকে। কিন্তু তারা দিন দিন একের পর এক ঘটনায় তারা কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকে। এমনি অবস্থায় তাদের অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে উঠলো তারা তখন ছলনার আশ্রয় খুঁজছিল এবং সমঝোতার প্রস্তাব দিতে থাকে। অতপর পার্টি নেতৃত্ব জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কথা বিবেচনা করে 'ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া নীতির' ভিত্তিতে এক সমঝোতায় রাজি হয়। এরপর কর্মীবাহিনী ঐক্যবদ্ধভাবে আবার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। কিন্তু তাদের সেই ঐক্যের স্বপ্ন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। যাদের রক্ত-মাংস ছিল বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের চক্রান্তে ভরা, তাদের পক্ষে ঐক্য-সংহতি কিংবা 'ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া' নীতি ছিল নিছক ছেলেখেলা। তাই সমঝোতার আবেগে ভাসতে না ভাসতে কর্মীবাহিনীকে হতবাক করে ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বরের রক্তাক্ত ঘটনার সূত্রপাত ঘটায় বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রকারীরা। বস্তুতঃ বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রকারীরা এম এন লারমাকে প্রাণে মেরে ফেললেও তাঁর সংগ্রামী চেতনা ও চিন্তাধারাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। এম এন লারমার অগ্নিমন্ত্রে শাণিত হয়ে দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনীর একের পর এক প্রবল আক্রমণে বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীরা কোণঠাসা হয়ে অবশেষে সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

বস্তুতঃ দেশ-বিদেশের ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রান্তকারীরা চেয়েছিল পার্টির ক্ষমতা কুক্ষিগত করে জুম্ম জনগণের চলমান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করে চূড়ান্তভাবে আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করতে। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র যদিও দীর্ঘদিন যাবৎ পার্টির পতাকাতলে সমবেত হয়ে কাজ করেছে তথাপি

পার্টি নেতৃত্বকে কখনই মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা জনগণ ও কর্মীবাহিনীকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'দ্রুত নিষ্পত্তি লড়াই'-এর শ্লোগান তুলে। আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী না করে দ্রুত শেষ করে জুম্ম জনগণের অধিকার নিয়ে আসবে বলে তারা সস্তা শ্লোগান প্রচার করতে থাকে। বস্তুতঃ বিভেদপন্থী এই চার কুচক্রী পার্টির রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম এবং রণকৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াইয়ের নির্ভুল তত্ত্বকে খন্ডিতভাবে উপস্থাপন করে কর্মীবাহিনী ও জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। দুর্নীতি, ক্ষমতালিপ্সা, সুবিধাবাদিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ এদের স্বভাব চরিত্রে মজ্জাগত ছিল। অথচ এই কুচক্রীরা মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে পশ্চাতে ও সঙ্গোপনে অনেক বিরূপ মন্তব্য ও অপপ্রচার যেমন কখনও বলতো ধর্মভীরু, কখনও বা আপোষপন্থী, কখনও বলতো একরোখা, সর্বোপরি তার একনিষ্ঠ ও যোগ্যতর সহকর্মীদের বিশেষতঃ সন্তু লারমার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করতে বরাবরই প্রয়াসী ছিল। সমগ্র পার্টিতে একটা প্রভাব বিস্তারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাদের সেই দুরভিসন্ধিকে ধামাচাপা দিতেই তারা 'দ্রুত নিষ্পত্তি লড়াই'-এর সস্তা শ্লোগান তুলে ধরে।

গৃহযুদ্ধের ফলে পার্টির মধ্যে ব্যাপক শক্তি ক্ষয় হলেও পার্টির নতুন নেতৃত্ব কর্তৃক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে বেগবান করা ও দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে থাকে। গৃহযুদ্ধের সফল সমাপ্তির পর পরই সরকারের সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে পার্টি দক্ষতার সাথে লড়তে থাকে। ফলে আন্দোলনের গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে সরকার ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। সরকার এই চুক্তি স্বাক্ষরে সহজে এগিয়ে আসেনি। সশস্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এবং দেশ-বিদেশের প্রবল জনমতের চাপে পড়ে সরকার এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে পার্টি নেতৃত্বের বিচক্ষণতা এবং জুম্ম জনগণের মধ্যে অটুট ও দৃঢ় সংগ্রামী চেতনার ফলে। এই চুক্তিতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের চিরাচরিত মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় এবং বিধান করা হয় এই মর্যাদা সংরক্ষণের। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসন প্রবর্তনের বিধিব্যবস্থা করা হয় চুক্তিতে। এছাড়া জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকার এ চুক্তিতে স্বীকৃতি লাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি জুম্ম জনগণের জাতীয় ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক অর্জন।

কিন্তু জুম্ম জনগণের এই ঐতিহাসিক অর্জনের প্রাক্কালেও জুম্ম জনগণ আবারও নতুন করে বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতার মুখোমুখী হতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিরোধিতা করে প্রসিত-সঞ্চয়-রবিশংকরের নেতৃত্বে শাসকগোষ্ঠী মদদপুষ্ট হয়ে তৎকালীন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ি গণপরিষদের অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-যারা 'ইউপিডিএফ' নামে সমধিক পরিচিত- তারা এই নতুন ষড়যন্ত্র ও বিভেদের সূত্রপাত ঘটায়। তারা দেশে-বিদেশে জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য অপপ্রচার চালায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে এবং সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে ইত্যাদি। তারা আরো প্রচার করে যে, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। তাদের মূল ষড়যন্ত্রকারী প্রসিত খীসা প্রচার করে যে, "আগে জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করতে হবে। কারণ জনসংহতি সমিতি হচ্ছে আন্দোলনের প্রতিবন্ধক, জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করা ব্যতিরেকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। তারই আলোকে জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীদের হত্যা করার জন্য প্রসিত খীসা তার অনুগামীদের সর্বাত্মক নির্দেশ প্রদান করে। শুরু হয় প্রসিত খীসার অনুচরদের ধ্বংসযজ্ঞ" (সূত্রঃ কোন চোরাবালিতে ডুবছে ইউডিপিএফ???)। তারা বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের মতো জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকে।

পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বেগবান করার নামে ইউপিডিএফ জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করার হঠকারী ও জাতি-বিধ্বংসী কার্যক্রম হাতে নেয়। পরবর্তীতে তারা শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ মহলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম অবাধে চালাতে থাকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চুক্তি সমর্থনকারীদের অব্যাহতভাবে হত্যা ও অপহরণ করতে থাকে। তারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের শ্লোগান তুলে ধরলেও আজ অবধি তারা পূর্ণ স্বয়ত্তশাসনের কোন রূপরেখা বা কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারেনি। তথাকথিত 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' আদায়ের রাজনৈতিক কর্মসূচীর পরিবর্তে তারা কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সমর্থনকারীদের হত্যা ও অপহরণ করা এবং ব্যবসায়ীসহ সাধারণ জুম্ম জনগণের কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে অবাধে চাঁদা আদায় করা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম হাতে নিতে থাকে।

ইউপিডিএফ নামধারী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী এই সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী স্থানীয় প্রশাসন ও শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিন বিদেশী অপহরণ এবং মুক্তিপণ বাবদ কোটি কোটি টাকা আদায় করে থাকে। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জুম্মদের ভোটগুলি ভাগ করে সন্ত্রাসী গডফাদার বিএনপির আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে জয়যুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। ২০০৯ সালে সমতল অঞ্চল থেকে আসা আইলা দুর্গত ২০০ সেটেলার পরিবারকে মোটা অঙ্কের চাঁদা নিয়ে লক্ষ্মিছড়ি উপজেলায় নাভাঙ্গা এলাকায় বসতি স্থাপনে সহায়তা করে। ২০০৭-২০০৮ সালে জরুরী অবস্থার সময় শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চুক্তি সমর্থনকারীদের হত্যা ও অপহরণ ও ব্যবসায়ীসহ সাধারণ জুম্ম জনগণের কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে অবাধে চাঁদা আদায় করা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম আরো জোরদার করে তুলে। জন্মলগ্ন থেকে ইউপিডিএফ আজ অবধি জনসংহতি সমিতির ৯৪ জন সদস্যসহ তিন শতাধিক জুম্মকে হত্যা করেছে। তারা জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকেও হত্যা করার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ তিনবার সশস্ত্র হামলা চালায়। ২০১৩ সালে

পিসিপির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সময় রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের উপর নৃশংস গ্রেনেড হামলা চালায়। ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গ সংগঠনের ৬২ জন সদস্য ও সমর্থককে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছে এবং মোটা অংকের মুক্তিপণ আদায় করেছে। জলপথে কাট্রি বোর্ট যোগে অস্ত্রসহ ইউনিফর্ম পরিধান করে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক রাঙ্গামাটি শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে যথাক্রমে বনরুপার সমতাঘাট এলাকার একটি করাতকল থেকে ৩ ডিসেম্বর ২০১২ একজন ব্যাপস্থাপকসহ তিন বাঙালি শ্রমিককে অস্ত্রের মুখে অপহরণ, ১৭ এপ্রিল ২০১৩ রাজবাড়ি স' মিল থেকে অস্ত্রের মুখে দু'জন বাঙালি শ্রমিক অপহরণ, ২৮ মার্চ ২০১৪ রিজার্ভ বাজার সংলগ্ন ডকইয়ার্ড এলাকা থেকে দু'জন বাঙালি লঞ্চ শ্রমিক অপহরণ ইত্যাদি ঘটনা প্রশাসন ও শাসকগোষ্ঠীর মদদ ছাড়া যে কখনোই সম্ভব হতে পারে না তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধীদের এসব তৎপরতা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ মহলের পক্ষ থেকে তাদেরকে মদদদানের মূল উদ্দেশ্য হলো জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করা, চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বানচাল করা এবং সর্বোপরি জুম্মদের দিয়ে জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নেয়া; পক্ষান্তরে তথাকথিত 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন'-এর সস্তা শ্লোগান তুলে ধরে জুম্ম জনগণসহ দেশ-বিদেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করা। ইউপিডিএফের দলত্যাগী নেতাকর্মীদের প্রকাশিত পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রসিত খীসার নেতৃত্বাধীন ইউপিডিএফের মূল কাজ হচ্ছে- প্রথমত: শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ডা হিসেবে জুম্ম জনগণের মধ্যে একটি সংঘাত জিইয়ে রাখা; দ্বিতীয়ত: সেটেলার বাঙালিদের দু-একজনকে অপহরণ-হত্যা করে তাদেরকে জুম্মদের উপর হামলা করতে প্ররোচিত করা; তৃতীয়ত: জুম্মদের অপহরণ করে মোটা অংকের মুক্তিপণ আদায় করা, জোরজবরদস্তি করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জুম্মদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য থেকে উচ্চ হারে চাঁদা আদায় করে শ্রমজীবী জুম্মদের সর্বশান্ত করা; চতুর্থত: বিভিন্ন ছোটখাট ব্যবসায় নিয়োজিত জুম্মদের উপরে মোটা ট্যাক্স নির্ধারণ করে দিয়ে বাঙালিদেরতে অবাধে ব্যবসার সুযোগ করে দেয়া; পঞ্চমত: সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহাল রাখার সুযোগ করে দেয়া; ষষ্ঠত: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়ন না করার পরিবেশ তৈরি করে দেয়া।

শাসকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্র কেবল ইউপিডিএফ নামে একটি পঞ্চম বাহিনী গড়ে তোলার মধ্যে সীমিত নেই। সেই সাথে ২০০৭-২০০৮ সালে জরুরী অবস্থার সময় 'সংস্কারের' ধুয়ো তুলে জনসংহতি সমিতির মধ্যে ক্ষুদে দলবাদকে মদদ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। বহুল আলোচিত ১/১১ এর পর দেশে জরুরী অবস্থা জারী হলে পার্টি সংগঠনের চরম দুর্দিনে পার্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা কায়েমী স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী কতিপয় সিনিয়র সদস্য শাসকগোষ্ঠীর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে পার্টির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। ১/১১ এর কুশিলবরা জরুরী অবস্থার সুযোগে এবং জরুরী অবস্থাকে ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে চিরতরে ধ্বংস করা এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। এলক্ষ্যে মিথ্যা ও সাজানো মামলায় জড়িত করে ও অস্ত্র গুঁজে দিয়ে জনসংহতি সমিতি ও এর অঙ্গসংগঠনের সদস্য ও সমর্থকদের উপর ব্যাপকভাবে গ্রেফতারী অভিযান চালানো হয়। পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদকসহ কমপক্ষে ২৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের মধ্যে অনেককে অতি স্বল্প সময়ে নিষ্পন্ন প্রহসনমূলক বিচারে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে পার্টির সভাপতিসহ শতাধিক সদস্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় সেনা ক্যাম্প কর্তৃক পার্টির স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে জনসংহতি সমিতির সদস্যপদ ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ প্রদান করা হয়। অন্যথায় ক্রশ ফায়ারে হত্যা, মামলা-মোকদ্দমা, চরম নিপীড়ন-নির্যাতনের মুখোমুখী হতে হবে বলে হুমকি দেয়া হয়।

দেশে জরুরী অবস্থাকে ব্যবহার করে যখন শাসকগোষ্ঠী পার্টির নেতৃত্ব ও সংগঠনের উপর একের পর এক নির্মম দমন-পীড়ন চালাচ্ছিল এবং তৎকারণে পার্টির নেতৃত্ব ও সংগঠন ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পর্যবসিত হচ্ছিল সেই অবস্থায় তারা ক্ষুদে দলবাদী ভূমিকা নিয়ে বিভেদপন্থা অবলম্বন করে এবং তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্কারের হীনকর্মসূচীতে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, আদর্শ-বিচ্যুত এই সুধাসিন্ধু-রূপায়ণ-তাতিন্দ্র লাল নেতৃত্বাধীন ক্ষুদে দলবাদী তথাকথিত সংস্কারপন্থী চক্রান্তকারীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদসহ শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছিষ্ট লাভের উদগ্র লোভে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পার্টি প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারাভিযান চালায়।

সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত এসব ক্ষুদে দলবাদী গোষ্ঠী জুম্ম জনগণসহ দেশ-বিদেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য একদিকে পার্টির মধ্যে তথাকথিত 'সংস্কার'-এর ধুয়া তুলে; অন্যদিকে নিজেদের দুর্নীতি, ক্ষমতালিপ্সা, স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্চাভিলাষকে ধামাচাপা দিতে ও সস্তায় নিজেদেরকে সাচ্চা সংগ্রামী হিসেবে তুলে ধরতে পার্টি সভাপতি সন্তু লারমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকে এবং মনগড়া নানা কল্পকাহিনী দিয়ে পার্টি সভাপতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নামে-বেনামে লিফলেট বের করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তারা ইউপিডিএফ নামধারী চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব ধ্বংস করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করা ইত্যাদি কার্যক্রমে অবতীর্ণ হতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বস্তুত: মুখে তারা যতই সংস্কারের ধুয়া তুলুক না কেন, তাদের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সংস্কারের সস্তা শ্লোগানের আড়ালে জুম্ম জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা এবং তার মাধ্যমে জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে দুর্বল করা।

তাই এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীদের 'দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই', পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী ইউপিডিএফের 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন' আর ক্ষুদে দলবাদী সংস্কারপন্থীদের 'সংস্কার'-এর শ্লোগান একই সূত্রে গাঁথা। তারা বিভেদপন্থী চার কুচক্রী, চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ বা সংস্কারপন্থী যেই নামেই তারা নাম ধারন করুক না কেন বা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে যেই শ্লোগান তুলে ধরুক না কেন তারা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একই গর্তের শেয়াল। তদের অপপ্রচারনার কৌশল, জনগণকে বিভ্রান্ত করার ধরণ, সস্তা শ্লোগান তুলে ধরে জনমতকে নিজেদের পক্ষে নেয়ার ধোঁকাবাজি, সর্বোপরি শাসকগোষ্ঠীর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আতাঁত করার লেজুরবৃত্তি ইত্যাদির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তারা মুখে অনলবর্ষী ভাষায় আন্দোলন-সংগ্রাম, জাতীয়তাবোধ, জুম্ম জনগণের অধিকারের কথা বললেও তাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে জুম্ম জনগণকে ভাগ করা এবং ভাগ করে সংঘাত জিইয়ে রাখা, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করা, সর্বোপরি জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ডা বাস্তবায়নে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করা।

বর্তমানে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের প্রেতাত্মা চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ এবং ক্ষুদে দলবাদী সংস্কারপন্থীদের বিভেদকামী তৎপরতা, ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম ও লেজুরবৃত্তি ভূমিকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের আন্দোলন এক গভীর সংকটে পতিত হয়েছে।' ৮৩-এর সেই বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের মতো বিভেদপন্থা গ্রহণ করে ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থী চক্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ সাধারণ জুম্মদের অপহরণ, হত্যা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অবতারনা করেছে এই অনাকাঙ্ক্ষিত জাতীয় সংকট। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত ও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। ফলতঃ '৮৩ এর গৃহযুদ্ধের মতো জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয়েছে হানাহানি ও রক্তক্ষরণ। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বর্তমান মহাজোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসছে না। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে নস্যাৎ করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম বর্তমানে অতি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জুম্মদের মধ্যে এমনতর বিভেদ, সংঘাত ও সংকট তৈরি করে দিয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠী তাদের এজেন্ডা- অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার নীলনক্সা- নীরবে নির্বিঘ্নে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

এমনিতর এক কঠিন পরিস্থিতিতে ১০ই নভেম্বরের চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়ে ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থী-মৌলবাদী গোষ্ঠী তথা শাসকশ্রেণির সকল প্রকার বিভেদপন্থী চক্রান্ত মোকাবেলা ও নির্মূল করা ব্যতীত বিকল্প কোন পথ নেই। তাই '৮৩ গৃহযুদ্ধের মতো গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলে বিভেদকামীদের সকল সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক তৎপরতা সমূলে উৎপাটন করা আশু করণীয় হয়ে পড়েছে। বিগত সময়ে অধিকারকামী সংগ্রামী জুম্ম জনগণ জনসংহতি সমিতির আপোষহীন নেতৃত্বে কর্মীবাহিনীর সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে সকল ধরনের প্রতি-বিপ্লবী ও গণবিরোধী কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। গৃহযুদ্ধের মতো কঠিন প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকেও সমূলে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। তাই ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থী-মৌলবাদী গোষ্ঠী তথা শাসকশ্রেণির সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইস্পাত-কঠিন জাতীয় ঐক্য আরো শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিতে হবে।

লারমা ঃ মুক্তিকামী মানুষের স্বপ্নসারথী

বসুমিত্র চাকমা

"...লারমা তোমায় আমাদের লাল সালাম...

ভুলিনি আমরা ভুলেনি জুম্ম জাতি..."

প্রথম যখন এই গান শুনি তখন কনকনে এক শীতের সন্ধ্যা। লোকে লোকারণ্য স্কুল প্রাঙ্গণ, স্টেজের দুপাশে বিশাল দুটো সাউন্ড বক্স। ছোট্ট দুটি চোখ আমার কৌতুহলে উদ্দীপিত। এত বিশাল সাউন্ড বক্স আগে কখনো দেখিনি যার উচ্চ কম্পিত শব্দ আমার বুকে কম্পন সৃষ্টি করছে। বলতে হবে এটাই আমার প্রথম লাইভ কনসার্ট। আনন্দ আর উত্তেজনায় ভরপুর আমি। কোন এক সময়কার লংগদুর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সে দিন প্রথম এই গান শোনা। প্রতিক্রিয়া হিসেবে বারবার মনে প্রশ্ন জাগলো সালামেরও বুঝি বিভিন্ন রকমফের রয়েছে ঠিক যেভাবে স্কুলে আমাদেরকে প্রায় প্রত্যেক বস্তুর প্রকারভেদ শেখানো হতো। সালামের ধরন যে লাল-নীল-গোলাপী হতে পারে এর আগে কখনো কল্পনাই আসেনি।

কিন্তু কাকে কোন সালাম দিতে হয়? লারমা নামধারী লোকটাকে কেন সবাই লাল সালাম জানাচ্ছি? সে কেন লাল সালাম পাওয়ার যোগ্য? প্রভৃতি প্রশ্নভান্ডার মনে জমা হয়েছিল সেদিন।

বিশেষত সালামের রকমফের নিয়ে বিশেষ আগ্রহের কারণ প্রাইমারী লেভেলে পড়ার সময় আমার এক বিদঘুটে পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। স্কুলের হেডস্যারকে রাস্তায় পেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একবার বেখেয়ালে বাম হাত উচিয়ে সালাম দিয়ে পাবলিক প্লেসে কান ধরতে হয়েছিল। শাস্তির অনেক পরেই বুঝতে পারি ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতটা উচিয়ে ধরেছিলাম। সেদিন মনে মনে বুঝে নিয়েছিলাম "বাম সালাম" দিলেই নিশ্চিত শাস্তি। লারমাকে যখন গানে গানে সবাই দাঁড়িয়ে লাল সালাম জানাচ্ছে ছোট্ট মনে বারবার আগ্রহ জেগেছিল-লারমা কে? সবাই দাঁড়িয়ে কেন লাল সালাম জানাচ্ছে? এই সালামের মাহাত্ম্যই বা কী? সেই প্রথম লারমার সাথে পরিচয়।

মূলত নতুন প্রজন্ম লারমাকে আমরা যারা পাইনি তাদের কাছে লারমা কীভাবে পরিচিত। তাঁর সংস্পর্শ না পাওয়া প্রজন্মের কাছে লারমার আবেদন কেমন, তাঁর মূল্যায়ন প্রভৃতি আলোচনা-পর্যালোচনার সময় এসেছে। যারা লারমা যুগের সংস্পর্শ পেয়েছে তারা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান। কিন্তু আমরা যারা পাইনি তারা তাঁর চিন্তা-চেতনা, স্বপ্ন, তাঁর আদর্শ লালন পালন ও ধারণের ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে কিনা তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে আনতে হবে। তাঁকে মূল্যায়ন ও তাঁর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাতগুলি সময়ের নিরিখে পর্যালোচনার আবেদন রাখছে।

লারমার ২২ আর আমাদের ২২

১৯৬১ সাল। লারমার বয়স তখনো মাত্র ২২ বছর। পাকিস্তান সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে। যে বাঁধ শুধু জুম্ম জনগোষ্ঠীকে বাহ্যিক বস্তুগত দিক থেকে স্থানান্তরিত করেনি, উন্নয়নের ধামাঢোল বাজিয়ে পাহাড়ি নিরীহ মানুষদের মানসিকভাবে নিদারুণ বিপর্যস্ত করেছে। প্রায় লক্ষাধিক মানুষ যখন জায়গা-জমি, বাস্তুভিটা থেকে নিজেদের শুধু সম্মান বাঁচানোর সম্বল নিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছে। দেশান্তরিত হওয়ার যাতনা তাদের মানসিক ভিত্তিকে নড়বড়ে, আস্থাহীন আর অসহায়ত্বের গভীরে প্রোথিত করেছে। উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিবাদহীনভাবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে তাদের মন দৈহিক যন্ত্রণা। সবচেয়ে বড় বিষয় রাষ্ট্র নামক আস্পৃহ্য যন্ত্রকাঠামোটি জুম্মদের দুর্গম প্রান্তিকতায় ঠেলে দিয়েছিল মানসিকভাবে। ১৯৪৭ এর দেশভাগ, ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প এবং ১৯৭১ সালে এক কোটি বাঙালির দেশান্তরের চাইতে কোন অংশে কম যন্ত্রণাকাতর ছিল না পার্বত্যবাসীর ১৯৬০ সালের কাপ্তাই বাঁধ। যখন কোন লোক বা সম্প্রদায় তার বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয় ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয় তখন সে শুধু বস্তুগত বাহ্যিক সম্পত্তি থেকে দূরে সরে যায় না বা বিচ্ছেদ ঘটে না, তার চাইতে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তার মানসিকতায়, টান পড়ে আবেগ আর অনুভূতির জায়গাটিতে। ৫৪ হাজার একর ভূমি চোখের সামনে জলে ডুবে গেল তা কি শুধুই ৫৪ হাজার একর অর্থনীতি? শুধুই কি দেশান্তরের যন্ত্রণা? শুধু কি অর্থনীতিকেই ধ্বংস সাধন? যদি উদাহরণ হিসেবে সামান্য কোন এক ভাড়াটিয়ার কথাই ধরি তার সমস্ত সম্পত্তিসমেত এক এলাকা থেকে যখন অন্য জায়গায় স্থানান্তর করে তার শুধু আর্থিক নয় বরং মানসিক

পরিশ্রমেই বেশি কান্ত হয়। আর যেখনে লক্ষাধিক মানুষ জোর করে স্থানান্তরিত, দেশান্তরিত (Forced Migration) হয়েছে সহায় সম্বলহীনভাবে তাদের মানসিক সুস্থতাকে শুধু বিকল কিংবা ধ্বংস করেনি বরং প্রান্তিকতাতো বটেই প্রান্তিকতার চরম সীমায় শেষ প্রান্তে ঠেলে দিয়েছিল। এটাতে গেলো মানসিক অবস্থার কথা, এর বাইরেও পুরো স্থায়ী এক সমাজ ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল এই কাপ্তাই বাঁধ। গতিশীল এক সমাজব্যবস্থার রীতিনীতি, সংস্কৃতি আর মূল্যবোধকে ধ্বংসের শেষ সীমায় যেতে বাধ্য করেছিল এই উন্নয়ন নামের অগ্রযাত্রা! উন্নয়নের বলি লাখখানেক জুম্ম মানুষ যাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ডির্ভোস হওয়া কোন পরিবারের শিশু সন্তানের মত যারা মানসিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত, সমাজের চোখে নিরীহ, বিধ্বস্ত যাদের আগামীর ভবিষ্যৎ। বস্তুত অনগ্রসর জনগণের কাপ্তাই বাঁধের পরিণতি, দুর্গতির চিত্র বুঝে উঠা ছিল নিতান্তই জটিল সমীকরণ। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা অন্যদিকে সামন্তীয় আপোষমুখী চিন্তাধারা সেকালের সমাজ চিন্তকদের অন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু সেই পশ্চাৎপদ, প্রান্তিক অনগ্রসর সেকেলে সমাজব্যবস্থা থেকে দূরদর্শী চিন্তা-চেতনায় কিছু অগ্রগামীদের মধ্যে যারা ছিল, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাদের অন্যতম। তাঁর বয়স তখন ২২ বছর।

সেই মাত্র ২২ বছর বয়সেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন রাষ্ট্র কর্তৃক জুম্মদের শোষণ-বঞ্চনা আর সর্বস্ব হারিয়ে উচ্ছেদের বেদনাদায়ক বিলুপ্তির ইতিহাস সূচনা হতে যাচ্ছে। এই কাপ্তাই বাঁধের ভয়াবহ পরিণতির চিত্র অঙ্কনে তিনি শুধু উপলব্ধির মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখেননি। ১৯৬১ সালে তিনি সরকারে অশুভ চক্রান্তের বিরোধিতা করে এবং এর বিরুদ্ধে অসচেতন জনগোষ্ঠীকে জাগিয়ে তুলে সংগঠিত করার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সের অন্ধকার, অসচেতন সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেড়ে উঠা যে যুবক সমগ্র জুম্ম সমাজের দূর আগামীর চিত্র কী নিদারুণ নিগ্রহে ধাবিত হচ্ছে তা বুঝে উঠতে পারা সেই সময় বাস্তবতার প্রেক্ষিতে শুধু দূরদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ নয় এক সুগভীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, চিন্তার প্রগাঢ়তা আর সুক্ষ্ম বিচক্ষণতার প্রমাণ। যা ৫৩ বছর পরও একবিংশ শতাব্দীতে বসে আমরা যার ভয়াবহতা উপলব্দির ক্ষেত্রে অনেকেই ন্যূনতম সমতার পরিচয় দিতে পারি না। তাঁর মত অগ্রগামী চিন্তার মানুষ আমাদের সামাজিক প্রতিকূল বাস্তবতায় খুঁজে পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের প্রতীক বৈকি! শ্রী লারমার চিন্তাশীলতার সুক্ষ্মতা, আদর্শিক উচ্চতা আর কর্মের প্রসারতা তাঁকে জুম্ম জাতির মহান অগ্রদূতের জায়গায় বসাতে আমাদের বাধ্য করে। অর্ধশত বছর আগের ২২ বছরের যুবকের প্রগাঢ়তা, বিচক্ষণতা আর দূরদর্শিতার কাছে আজকের একবিংশ শতাব্দীর ২২ বছর হার মানতে বাধ্য।

এম এন লারমা সত্য ও বাস্তবতার ধারক

শ্রী লারমার সত্যতা ও বাস্তবতাবোধকে তুলনা করি মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এর বাস্তবতাবোধের সাথে। মার্টিন লুথার নোবেল প্রাইজ গ্রহণের সময় আবেগঘন বাস্তবতাভিত্তিক বক্তব্যের সাথে এম এন লারমার সংসদীয় বক্তব্য। পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার নোবেল গ্রহণের প্রাক্কালে লুথার খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাননি। যেমন তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে সে সময়ের বাস্তব চিত্র তৎকালীন সময়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২২ মিলিয়ন আফ্রিকান আমেরিকানদের (নিগ্রো) জাতিগত (Racial) নিগ্রহ, শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র্যতা আর সামাজিক শোষণের (Social exclusion) করুণ বৃত্তান্ত। তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে যখন বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব খুশিতে আত্মহারা, আবেগী, অতি-উৎসাহী, জাত্যাভিমানে মাতোয়ারা হয়ে সংবিধান প্রণয়ন করছিলেন তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একমাত্র ব্যক্তি যিনি আবেগের উর্ধে উঠে দেশের সকল শ্রেণি, পেশার মানুষের কথা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছিলেন। যিনি বাস্তবতাকে আবেগ দিয়ে বিচার করেননি। আবেগের কাছে বাস্তব সত্যকে পদদলিত করেননি।

যে মূল আর্দশ, লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল স্বাধীনতার ঠিক বছর কয়েক পর দেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় তার প্রতিফলন হয়নি বরং লজ্জিত হয়েছে। এম এন লারমা দেশের সকল শোষিত বঞ্চিত মানুষের কথা বলেছিলেন। তিনি স্বপ্ন বুনেছিলেন এদেশের প্রত্যেক মানুষ দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে সত্যিকারের মুক্তিলাভ করবে। তিনি জাতিগত, অঞ্চলগত সংকীর্ণতার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে এক মহানুভবতা ও মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সংবিধানে শুধু আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসন, অধিকার কিংবা মুক্তির কথা বলেননি বরং সমানতালে দেশের সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার নিম্নস্তরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুক্তির কথা বলেছেন। যেখানে শুধু তার সম্প্রদায় কিংবা অঞ্চলের মানুষ নয় সমগ্র দেশের সকল শ্রেণি, পেশার মানুষের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুক্তির শ্লোগান দিয়েছিলেন। সেই মুক্তির শ্লোগানে যেমন ছিল চাষা-ভূষা, কৃষক-শ্রমিক তেমনি নিম্নস্তরে পড়ে থাকা রাস্তার ভিখারী ও নিষিদ্ধ পল্লীতে বসবাসকারী নারী সমাজের মুক্তির কথা। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংসদে এক ভাষণে তাঁর বক্তব্য ছিল-

"আমি বলেছিলাম অধিকার হারা মানুষের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, যারা কলকারখানায় চাকুরী করে। সেই শ্রমিক ভাইদের কথা যারা দিনরাত রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শক্ত মাটি চাষে সোনার ফসল ফলায়.... যারা রাস্তার রিক্সা চালিয়ে কোন রকম জীবিকা নির্বাহ করে..... আমি বলেছিলাম সেই ভিখারীদের কথা যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে "আমায় একটা পয়সা দাও" বলে। .... আমি বলেছিলাম.... নির্যাতিতা উপেক্ষিতা যারা নিষিদ্ধ পল্লীতে অধিকার হারা দেহ উপজীবী হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে....."

তাঁর কথায় ফুটে ওঠে এদেশের সুন্দর সোনালী সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সীমাহীন স্বপ্ন। সমতা ভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় স্বপ্ন সারথী ছিলেন তিনি। স্বাধীনতা পরবর্তী মহান জাতীয় সংসদে শুধু পার্বত্যাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করেননি, তিনি যেন সে সময়কার ৭ কোটি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে সকলের মনের কথা বলেছেন। তাঁর এই উদারতা, সার্বজনীন চিন্তাশীলতা তাঁকে শুধু পার্বত্য আদিবাসীদের কাছে মহান করে তুলেনি, সমগ্র অধিকারহীন, শোষিত বঞ্চিত মানুষের কাছে উজ্জ্বল অনুসরণীয় নক্ষত্র হিসেবে আবির্ভূত করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্ধকারচ্ছন্ন ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন স্বীয় মেধা, মনন আর কর্মে আর একটি নতুন দেশের সমস্ত জনগণকে দেখিয়েছিলেন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা লালনের স্বপ্ন। সংসদে তাঁর দেওয়া ভাষণ প্রত্যেক্ষভাবে প্রমাণ করে তিনি কত অসাম্প্রদায়িক, দূরদর্শিতাসম্পন্ন উঁচু মাপের মানুষ। লারমা সত্য ও ন্যায়ের রাজপথে ছিলেন সদা অগ্রগামী পথিক। সত্য প্রতিষ্ঠায় নির্ভীক স্পষ্টভাষী বক্তব্যে তাঁর প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের বহি:প্রকাশ ঘটে। প্রথম জাতীয় সংসদে জাতিসত্তার পরিচয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে "বাঙালিত্ব" চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে তিনিই প্রথম বিরোধিতা করেছিলেন। শ্রী লারমা নৃতাত্ত্বিক ধ্রুব সত্যকে আবেগের বানে ভাসিয়ে দেননি। যদিও তৎকালীন সংসদে তিনিই ছিলেন একমাত্র নির্দলীয়, অ-আওয়ামীলীগ সাংসদ তবুও নির্ভীক চিত্তে বীরদর্পে সত্যকে সত্য বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। সংসদে তিনি নি:সংকোচে উচ্চারণ করেছিলেন -

"আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলে নাই আমি বাঙালি"।

৪২ বছর আগে এম এন লারমার এই বক্তব্য দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে হাস্যকর, ভিত্তিহীন থাকলেও আজ প্রমাণিত হয়েছে তিনিই প্রকৃত সত্যর প্রবক্তা। সংবিধানে যখন এই সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি প্রতিবাদ স্বরূপ গণপরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। তৎকালীন গণপরিষদ লারমার সত্যকে অস্বীকার করে জাত্যাভিমানের আবেগী হাওয়ায় ভেসে গিয়েছিল। "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবে" এই মর্মে গণপরিষদ সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ ধারা নির্বোধের মত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আবেগী হাওয়ার আড়ালে সত্য বেশি দিন লুকায়িত থাকেনি। আজ এম এন লারমার বক্তব্য, দর্শন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ বহু ভাষাভাষী, বহু জাতির, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির দেশ।

বেশ কয়েকদিন আগে বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের মানচিত্র ২০১৪ প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত দারিদ্র্যের চিত্র অনুযায়ী বর্তমানে দেশের গড় দারিদ্র্যের হার ৩০.৭% (এশীয় দারিদ্র সীমা অনুসারে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দারিদ্র্যের পরিমাপক হিসেবে দৈনিক ১ ডলার ৩৫ সেন্ট-কে সর্বনিম্ন আয় ধরে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়)। এ বছরের ৩০.৭% দারিদ্র্যের হার হিসেব কষলে বর্তমান বাংলাদেশের দরিদ্র লোকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। দেশ স্বাধীনতার ৪৩ বছর পরও কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্যের বৃত্তে অবস্থান দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় নিদারুণ ব্যর্থতার পরিণতি। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ ১১টি নির্ধারক হিসেব করে এ দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশত বছর পেরিয়েও একটি দেশের এত বিশাল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যে অবস্থানের পেছনে দেশের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অদূরদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ। লারমা এ ভবিষ্যৎ করুণ দৃশ্যের কথা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সংসদে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন-

"আমার দেশে যারা ঘুষখোর, যারা দুর্নীতি পরায়ণ তাদের যদি আমরা উচ্ছেদ করতে না পারি, তাহলে এ সংবিধানের কোন অর্থ হয় না।..... ভবিষ্যতের নাগরিক, যারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর তারা বলবে যে, যারা এই সংবিধান রচনা করে গেছেন তারা ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।"

সদ্য স্বাধীন দেশ হিসেবে এম এন লারমা ক্ষুধাহীন, দারিদ্র্যমুক্ত প্রীতিময় এক সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সাচ্ছন্দ্যে সাবলীল জীবন ধারণে কোন বাধা থাকবে না। সংবিধানের উপর তার প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি শোষণহীন, শ্রেণিহীন ও সমতাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাঁর দূরর্দশিতাপূর্ণ মর্মবাণীর সারাংশ তখন কেউ কর্ণপাত করেনি। বরং এই আমোঘ সত্যকে হাসি ঠাট্টায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ৪২ বছর আগে রেখে যাওয়া তাঁর দর্শন ও ভবিষ্যৎবাণী প্রতি পদে পদে আজ সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একজন মহান নেতা। তা তাঁর চিন্তার বিচরণের ক্ষেত্র ও কর্মের পরিধি প্রমাণ করে। ঘুমন্ত জুম্মদের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অধিকার আর অস্তিত্বের বিষয়ে সচেতন করার ক্ষেত্রে চিন্তা ও কর্মে তিনিই প্রথম প্রবাদ পুরুষ। জুম্মদের মুক্তির প্রশ্নে তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা। আজন্ম বিপ্লবী লারমা শুধু জুম্ম জাতির মুক্তির অগ্রদূত নয়, সমস্ত শোষিত-বঞ্চিত, অধিকারহীন, মুক্তিকামী জনতার স্বপ্নসারথী। তাঁর স্বপ্ন চিন্তা, দর্শন, কর্ম আর শেকল ভাঙ্গার স্বপ্নের মাত্রা বিচারে তিনিই প্রশ্নাতীতভাবে মহান, জুম্ম জাতির লাল সালাম পাওয়ার প্রকৃত যোগ্য।

জুম্ম জাতির অস্তিত্বের সংকট ও এম এন লারমার প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ধীর কুমার চাকমা

বিশ্বের সর্বত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদ্যমান। সমাজেও এই দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়। কখনো প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম, কখনো মানুষের সাথে মানুষের ঝগড়া-বিবাদ হিসেবে এই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এক সময় মানুষকে হিংস্র জন্তুর বিরুদ্ধে মরা-বাঁচার লড়াই করতে হতো। তাই সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানুষ আত্মরক্ষার্থে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। পৃথিবীর সব কিছুই পরিবর্তনশীল হওয়ায় সমাজেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। মানব সমাজ বিকাশের এক পর্যায়ে দেখা দেয় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও শ্রেণি বৈষম্য এবং শ্রেণি স্বার্থ-সংঘাত। ফলে যে মানুষ এক সময় হিংস্র বন্য জন্তুর বিরুদ্ধে এক সঙ্গে লড়াই করেছে সে মানুষ আজ নিজেদের মধ্যে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছে। সর্বত্র শ্রেণি স্বার্থ ও শাসন-শোষণ বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। দেখা দিয়েছে রাজা ও রাজার মধ্যে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ। তখন থেকেই মানব সমাজের ইতিহাস হয়েছে শাসন-শোষণের ইতিহাস।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) ছাত্র জীবন থেকেই এই ইতিহাস পরিবর্তনের মর্মকথা অনুধাবন করেছিলেন। তাই আমরণ ভেবেছিলেন শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা। শিক্ষক আর মহান বিপ্লবী নেতা হিসেবে এই কথাই তিনি বলে গেছেন। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে শহীদ হয়েছিলেন। তার সঙ্গে শহীদ হন অগ্রজ শুভেন্দু প্রবাস লারমা (বুলু) সহ আট বীর সহযোদ্ধা। এবারের ১০ নভেম্বর ২০১৪ এম এন লারমার ৩১তম শহীদ দিবস। এই দিনে তাঁর অবর্তমানে তাঁর কথা ও কাজের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের এক নিভৃত পল্লীতে পশ্চাৎপদ আদিবাসী জুম্ম সমাজে জন্ম নিয়ে তিনি কিভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে গেছেন; অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় আজকে অধিকতরভাবে তাঁর মাহাত্ম্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রতিনিয়ত তাঁর মহান আত্মত্যাগ প্রভাবিত করে চলেছে আদিবাসী নবীন প্রজন্মকে।

আদিবাসী প্রসঙ্গে সর্বত্র এম এন লারমার প্রগতিশীল চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। মানব ইতিহাসের নানা ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুক্তিকামী জনগণকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। দাস বিদ্রোহের নায়ক স্পার্টাকার্স, সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু ও কানুর মহান আত্মত্যাগ (১৮৫০), ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, রিয়াং বিদ্রোহ, হাজংদের টংক আন্দোলন, জুম্মদের তুলা বিদ্রোহ ইত্যাদি বিদ্রোহের কাহিনী উপমহাদেশের আদিবাসীদের উজ্জীবিত করেছে। সর্বোপরি ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের প্যারী কমিউন এবং ১৯১৭ সালে রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব আর পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারত উপমহাদেশে দেশ বিভাগ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এম এন লারমার জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ষাট দশক থেকে এম এন লারমার জীবন দর্শন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম ছাত্র-জনতাকে প্রভাবিত করে। তারই ফলশ্রুতিতে এম এন লারমার নেতৃত্বে ষাট দশকে শক্তিশালী করা হয় পাহাড়ী ছাত্র সমিতি ও '৭২ সালে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। যার নেতৃত্বের মধ্যে এম এন লারমার কালজয়ী দর্শন প্রতিফলিত হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এর নেতৃত্বে ২০০১ সালে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম। দেশের সমতল ও পাহাড়ে আদিবাসী অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের শাখা। আদিবাসী ফোরামের সহযোগী সংগঠন হিসেবে গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং বাংলাদেশ আদিবাসী কালচারাল ফোরাম ইত্যাদি। তাছাড়াও গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সমমনা জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠন। তাতে করে রচিত হয়েছে বিশ্বের ৯০টি দেশের ৪০ কোটির অধিক আদিবাসীদের সাথে এদেশের অর্ধশতাধিক জাতিগোষ্ঠীর ৩০ লক্ষ আদিবাসীদের সেতু বন্ধন। এদেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এসব অর্জন নিঃসন্দেহে এম এন লারমার গড়ে তোলা আন্দোলনের ফসল এবং প্রগতিশীল চিন্তার প্রতিফলন বলা যায়।

প্রয়াত এম এন লারমা, জীবিত এম এন লারমার চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে আজ আদিবাসীদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ আন্দোলনের নেতৃত্বকে প্রভাবিত করেছে। '৭২ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিপূর্ব পর্যন্ত আদিবাসী জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন আঞ্চলিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল বলা যায়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তখন আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চল ছিল এক অবরুদ্ধ জনপদ। ঘরে-

বাইরে আদিবাসী জুম্মদের দুর্বিসহ জীবনের খবর দেয়া-নেয়ার জন্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কিংবা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। বিশেষ করে বিদেশীদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল প্রবেশ নিষিদ্ধ অঞ্চল। আজো তাই। তবে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ আকাশ সংস্কৃতির এযুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহ আজ আর আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ১৯৯৩ সালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ এবং ৯ আগষ্টকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঘোষণার পর জাতিসংঘে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম গঠিত হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের মূল কর্মপরিকল্পনা বিশ্বের আদিবাসীদের সংগঠিত হবার জন্য সচেতনতা ও সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন এবং বিশ্বের আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন একাকার হয়েছে। আদিবাসী সংগঠন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রসারিত হয়েছে। নিকট প্রতিবেশী ভারত এবং বাংলাদেশের আদিবাসীদের মধ্যে যোগাসূত্র গড়ে উঠেছে। '৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে উদ্বাস্তু এবং বর্তমানে অরুনাচলবাসী চাকমা জনগণ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামকে অভিনন্দিত করেছে। যাদের উত্তরসূরীরা ৫৪ বছর আগে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকেই বৃদ্ধ বয়সে অরুনাচলের উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

দেশের আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহের জন্মভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। ভিন্ন ভাষাভাষী ১৪টি আদিবাসী জাতিসমূহ স্মরণাতীত কাল থেকে স্বকীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাতন্ত্র্যেতার মধ্যেই তাদের জীবনের বিকাশ ঘটেছে। এখান থেকেই আদিবাসী জুম্ম জনগণ আধুনিক সভ্য দুনিয়ার সাথে তাদের যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। পাঁচটি ঐতিহাসিক শাসনামল অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছেছে। প্রথমত ১৭৮৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন রাজার আমল, দ্বিতীয়ত ১৭৮৭ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামল, তৃতীয়ত ১৮৬০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনামল, চতুর্থত ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান শাসনামল এবং পঞ্চমত ১৯৭১ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসনামল। বাংলাদেশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে তিনটি পার্বত্য জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং ১৯৭৩ সালে রুমা, আলিকদম ও দীঘিনালায় তিনটি সেনানিবাস স্থাপনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে অব্যাহত সেনা শাসন।

১৯০০ সালের ৬ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ঘোষণার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত শাসন কাঠামো পাকাপোক্ত হয়। ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই দেশের রাজন্যবর্গ তাদের পদবী ও জীবনযাত্রার মান রক্ষা করে থাকেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর সাথে কোনরূপ রাজনৈতিক দেনদরবারে জড়িয়ে পড়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব এবং জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য কোনরূপ রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজনেতিক ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি। যেহেতু সমাজ ছিল সামন্তবাদী, যার ভিত্তি হচ্ছে গোষ্ঠীবাদ এবং স্বজন-তোষণ নীতি। সকল প্রকার চিন্তাভাবনা ছিল আপন গোষ্ঠীর স্বার্থের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বাধীন রাজার আমল থেকে আজাবধি একেক সময়ে একেক শাসকের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে কোন কালে কোন শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সম্পৃক্ত করেনি। দেয়নি সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। আদিবাসী জুম্ম জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে কোন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। আজো প্রথাগত আইনের দ্বারা আদিবাসী জুম্ম সমাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্র ও শাসকগোষ্ঠী সর্বত্র তাদের সাথে বিমাতাসূলভ আচরণ করে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতি এভাবে পাকিস্তান শাসনামলের শুরু থেকে বৃহত্তর বাঙালি শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়।

দীর্ঘ দু দশকাধিক কাল ধরে সশস্ত্র আন্দোলনের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জুম্ম জাতি নতুন আশা উদ্দীপনা নিয়ে সম্মুখযাত্রা শুরু করে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসন কাঠামো কার্যকর না হওয়ায় তাদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হচ্ছে।

জুম্ম জাতির বর্তমান অবস্থা বিলুপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের বিকশিত হবার সুযোগ না দেয়া হলে তারা দেশের বৃহত্তর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সাথে সমতালে এগুতে পারবে না। জুম্ম জনগণ এদেশেরই নাগরিক এবং এদেশেরই সন্তান। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির সাথে তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেমনি মায়ের সাথে শিশুর অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর টান থাকে। মূলত প্রকৃতির দত্ত খাদ্য-ভান্ডার (বনজ শাক-সবজি, ফল-মূল, মাছ-কাকরা ইত্যাদি) কিংবা ঐতিহ্যবাহী চাষবাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে তারা জীবন ধারণ করে থাকে। তখন তাদের উপর বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না। যেদিকে চোখ যায় সেদিকে দিগন্ত প্রসারিত বিশাল বনভূমি, সবুজ পাহাড়, নদ-নদী, ঝর্ণাধারা ইত্যাদি সবই জুম্ম জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভূমি ও আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হতো। যেখানে ছিল একমাত্র তাদেরই একাধিপত্য। এক কালে তাদের উপর বনবিভাগের কোন নজরদারি ছিল না।

প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা ও জুম চাষ ছিল জীবিকার্জনে জুম্ম জনগণের মূল পেশা। তাদের এই পেশা আজ বিপন্ন প্রায়। সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে অর্থনীতি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন যাত্রায়ও পরিবর্তন এসেছে ঠিকই। কিন্তু আদিবাসীদের বংশ পরম্পরায় বসবাসরত ভূমি বেদখল হয়ে যাবার ফলে তাদের অর্থনীতি ও জীবন-জীবিকা ভেঙ্গে পড়ছে। ভূমির উপর ভিত্তি করেই

আদিবাসীদের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা ও বাসস্থানের মতো সব মৌলিক চাহিদা পরিপূরণ করতে হয়। তাই ভূমি ছাড়া আদিবাসীদের জীবন জীবিকা অচল। আদিবাসী জুম্মদের জীবন বনাঞ্চল ও গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক সংগঠনও গড়ে উঠেছে গ্রামাঞ্চলকে ভিত্তি করে। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন তার একটা দৃষ্টান্ত। পার্বত্যাঞ্চলে আদিবাসী জাতিসমূহের জীবনধারা অনুশীলন করেই পার্টি গঠন করেছেন এম এন লারমা। পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশকাধিক কালের সশস্ত্র আন্দোলন চলাকালীন সময়েও জুম্ম সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধ তাদের প্রথাগত আইন দ্বারা নিষ্পত্তি করা হতো। আদিবাসী জুম্ম জনগণের নিজেদের আত্মপরিচয়ের অধিকার এবং ভূমি অধিকার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে হলে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করতে হবে-এই মর্মে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক জুম্মদের উচ্ছেদ নীতি প্রণীত হয়। জুম্ম জনগণ অনুপ্রবেশকারী সেটেলার বাঙালিদের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রতিবেশী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে (১৯৮৬) শরণার্থী জীবন-যাপনে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় ১৯৯০-৯১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবিরসহ তার পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর প্রতিবেদন, "Life Is Not Ours" বা "জীবন আমাদের নয়" এই শিরোনামে প্রকাশ করেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের ফলে জুম্ম জনগণের জীবন আজ চরম হুমকীর সম্মুখীন।

বহু সরকার গঠিত হয়েছে, কিন্তু আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার দেয়নি কোন সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালেও শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের প্রতি এই বঞ্চনার ধারা থেকে উঠে আসতে পারেনি। যেমন-পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধনের প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও আজো তা ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের জ্বলন্ত সমস্যা ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য এই আইন সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ পাশ করে উন্নয়ন বোর্ডটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে। যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়াতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ বাতিল করার জন্য আদিবাসীরা যথারীতি দাবি জানিয়েছিল। ২০১০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করে সংসদে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়েছে। সেটা আজো আদিবাসীদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। সরকার তথা সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত সংসদীয় বিশেষ কমিটির সাথে যোগাযোগ করেও ২০১১ সালে ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আদিবাসী জাতিসমূহ "আদিবাসী" হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়নি। বরঞ্চ দেশের সকল আদিবাসীদের দ্বিতীয়বারের মতো বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ স্বাধীনোত্তর কাল থেকে দেশের আদিবাসীরা নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী কিন্তু জাতি হিসেবে তারা আদিবাসীরা স্ব স্ব জাতিগোষ্ঠীভুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ থেকে ১১ সদস্য বিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে।

আদিবাসীরাও এদেশের নাগরিক; তারা আর উচ্ছেদ ও প্রতারণার শিকার হতে চায় না। অদ্যাবধি দেশের সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসীদের বংশপরম্পরায় বসবাসরত ভূমি থেকে উচ্ছেদ আতঙ্কে দিন কাটাতে হয়। অবিলম্বে এই উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ না হলে অচিরেই আদিবাসীদের আজন্ম লালিত সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণী রক্ষা আইন করা হয়। আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ বিধান করা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং দেশের আদিবাসীদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ এর উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন কোন আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পক্ষ কিংবা সরকার আন্তরিক নয়। এসব কারণে শুধুমাত্র দেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক সংকট তৈরী হয়নি। তার সাথে গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রেও সরকার গভীর সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হয়েছে।

পাকিস্তান সরকার যাট সালে কাপ্তাই বাঁধ দ্বারা জুম্মদের চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালে চুক্তির প্রধান পক্ষ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না করে জুম্ম জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। '৭১ সালে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জুম্মদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের দূরে সরিয়ে রাখে। তারপর '৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের দিকে ঠেলে দেয়। এক দশক (১৯৮৬ -৯৬) কাল ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৭২ হাজার পাহাড়িকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থীর জীবন কাটাতে হয়েছে। ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তির মাধ্যমে শরণার্থী শিবির থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও নিজেদের জমি, ভিটে-মাটি ফেরত পায়নি জুম্ম শরণার্থীরা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা ১৯৬৬ জন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অবস্থাও তাই। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নুতনভাবে বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর আগ্রাসনের শিকার হয়ে আদিবাসীরা বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হতে চলেছে। বস্তুত দেশের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে নিজের জন্মভূমিতে ভূমিহীন এবং পরবাসী জীবন আর চায় না।

বাংলাদেশের সংবিধানে বিশেষভাবে সুরক্ষিত ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইনে সমতল জেলাসমূহের আদিবাসীদের ভূমি অআদিবাসীদের কাছে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও এই আইনকে লঙ্ঘন করে গারো, খাসিয়া, রাখাইন, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, কোচ প্রভৃতি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জায়গাজমি অ-আদিবাসীদের কাছে হস্তান্তর হয়ে চলেছে। আওয়ামীলীগ সরকারের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইসতেহারে আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনী অধিকার

সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করা হলেও সরকার এবিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পাহাড় আর সমতল সব জায়গা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আদিবাসীরা যাবে কোথায়? আদিবাসীদের সমতল ভূমি ও পাহাড় প্রতিনিয়ত সরকারি-বেসরকারিভাবে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। নিজ ভূমি থেকে আদিবাসীদের উৎখাতের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে-(১) সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সেটেলার বাঙালি পুনর্বাসন, (২) সামরিক বাহিনী দিয়ে ক্যাম্প সম্প্রসারণ, (৩) বনবিভাগের মাধ্যমে বনায়ন ও রক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা, (৪) পর্যটন শিল্পের বিলাসবহুল রিসোর্ট স্থাপন, (৫) তথাকথিত ইকো-পার্ক, জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি ঘোষণা এবং (৬) বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুখ্যত এইসব উপায়ে সুপরিকল্পিতভাবে দেশের আদিবাসীদের জায়গা অধিগ্রহণের জন্য শাসকগোষ্ঠী সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালি পুনর্বাসনের নতুন সংস্করণ হিসেবে অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে; ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন সাজেক এলাকায়, অর্থের টোপ ফেলে আদিবাসী পাঙখো জাতিগোষ্ঠীর লোকজনদের সুকৌশলে অন্যত্র সরিয়ে সেখানে ইতিমধ্যে পর্যটন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে। পর্যটন কেন্দ্রকে ঘিরে সেটেলার বাঙালি পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

ঔপনিবেশিক শাসননীতি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়। '৪৭ সালের শুরু থেকেই পাকিস্তান সরকার ঔপনিবেশিক কায়দায় "ভাগ করা শাসন করা" নীতির ভিত্তিতে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ শাসনামলেও একই নীতি কার্যকর রয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই ঔপনিবেশিক শাসননীতি বড় অন্তরায়। যা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল আদিবাসী এবং শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে চলেছে। দেশের আদিবাসী জাতিসমূহকে আত্মপরিচয়ের অধিকারের মতো মৌলিক অধিকারহীন অবস্থায় রেখেছে। যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের এই দুর্বিষহ জীবন এম এন লারমাকে পীড়া দিয়েছে। তাই ষাট দশকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহকে একদিকে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, আরেকদিকে শিক্ষার্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। শিক্ষাই একটি জাতির বহুবিধ সমস্যার সমাধান দিতে পারে সেই মর্মকথা গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তারই ধারাবাকিতায় বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এম এন লারমার প্রদর্শিত পথে আদিবাসী জাতিসমূহের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পতাকাতলে আদিবাসীরা সমবেত হচ্ছে। সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসীরা ঔপনিবেশিক শাসননীতির অবসান কামনা করে।

১৯৪৮ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ভারতে প্রবর্তন হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। সদ্য স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা-মহারাজাদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে প্রাক ব্রিটিশ ভারতের ঐসব রাজ্যসমূহকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করে নতুন ভারত প্রজাতন্ত্রের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হয়। যেমন-প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরাম, ত্রিপুরা ও আসাম ইত্যাদি হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মিজোরামের কমলানগরে আদিবাসী চাকমা জাতিকে নিয়ে চাকমা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (সিএডিসি) নামে একটা বিশেষ শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে অনুরূপ (স্বশাসিত জেলা পরিষদ) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। ভারতের মতো একটা বিশাল ভূখন্ডের ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন ধর্মী ও ভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন আদিবাসীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য ভারতের সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফশিলের মাধ্যমে বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে। "নানা জাতির নানা বেশ নানা পরিধান" এই ঐতিহ্যকে অটুট রেখে ভারত একটি বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বহু জাতির দেশে পরিগণিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে কিছুটা সময় লাগে। ১৭ আগস্ট বঙ্গীয় সীমানা নির্ধারণ কমিশনের চেয়ারম্যান সিরিল র‍্যাড ক্লিপের রায় অনুসারে পাকিস্তান বেতার থেকে প্রচার করা হয় যে, চট্টগ্রামের আশে-পাশের পার্বত্যাঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ঘোষণার পর ৪৭ সালের ২০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) কার্যালয়ে ভারতের পতাকা উড্ডীন ছিল। আর বান্দরবানের মহকুমা প্রশাসকের (এসডিও) কার্যালয়ে উড্ডীন ছিল বার্মা পতাকা। তার অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের কোন মতামত তোয়াক্কা না করেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করানো হয়েছে।

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের ১ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল হতে এম এন লারমা আর দক্ষিণাঞ্চল হতে চাইথোয়াই রোয়াজা জয়লাভ করেন। চার দশক পর ৫ জানুয়ারি ২০১৪ বাংলাদেশে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এম এন লারমার পদাঙ্ক অনুসরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সমর্থিত প্রার্থী ঊষাতন তালুকদার ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বলা যায় এম এন লারমার প্রদর্শিত পথে ঊষাতন তালুকদার এর সংসদ যাত্রা সূচিত হয়েছে। তদনুযায়ী জাতীয় সংসদে দেশের মেহনতি মানুষ ও আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র নয়, আদিবাসীদের জন্য প্রয়োজন সুষম উন্নয়ন। পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে লঙ্ঘন করে পঞ্চাশ দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিবেশী জেলা নোয়াখালী, কুমিল্লা থেকে ভারতের উদ্বাস্তু ঘোষণা দিয়ে বাঙালি সেটেলারদের অবৈধভাবে পুনর্বাসন প্রদান করে থাকে। ১৯৭৯ সালে দেশের বিভিন্ন সমতল এলাকা থেকে চার লক্ষাধিক সেটেলার বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। সর্বোপরি ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েও

চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়াতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ স্বদেশে পরবাসী হতে চলেছে। চুক্তির ১৭ বছর পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তিপূর্ব পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। এমনকি পার্বত্য চুক্তি-উত্তর কালে বেআইনী অনুপ্রবেশ আরো ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে নিত্য নতুন কায়দায় বৃদ্ধি পেয়েছে জুম্মদের জায়গা সরকারিভাবে অধিগ্রহণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলা উচিৎ। দেশে আদিবাসী পরিপন্থী এই সব উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী মহল আধা জল খেয়ে লেগে রয়েছে। রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জনগণ সবসময় উন্নয়নের পক্ষে। দেশে যে কোন উন্নয়নে আদিবাসীদের আদৌ আপত্তি নেই। তবে আসল কথা হচ্ছে আদিবাসীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে পার্বত্যাঞ্চলে সুষম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন হওয়া উচিৎ। দেশের উন্নয়নের সাথে সমগ্র আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করে সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ে উঠুক পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের সকল আদিবাসীরা সেটাই চায়। কিন্তু যতই এই দাবী উচ্চারিত হচ্ছে ততই একতরফা ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। ষাট দশকে অনুপ্রবেশকারী সেটেলার বাঙালিরা তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আলী হায়দার খানের আমলে ইতিপূর্বেই পুনর্বাসিত হয়েছে। তারা এখন রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারক বাহক হয়েছে। ১৯৭৯ সালের জিয়া আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে যে চার লক্ষাধিক সেটেলার বাঙালির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তারাও ইতিমধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের সবখানে আধিপত্য বিস্তার করেছে। বর্তমানে সেটেলার পুনর্বাসন কার্যক্রম ৯৮% ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সে জায়গায় সরকার পক্ষ থেকে উল্টোভাবে বলা হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৯৮% বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বিভ্রান্তিকর। বাস্তবতার দাবি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আশু যথাযথ বাস্তবায়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নসহ দেশে সুষম উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা। কিন্তু তা না করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য জুম্ম জনগণকে অন্যত্র সরিয়ে তাদের জায়গায় বিলাস বহুল সুরম্য পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা গণমুখী উন্নয়ন বুঝায় না। পর্যটন কেন্দ্র হচ্ছে নিছক একটা চিত্ত বিনোদন ক্ষেত্র। যেখানে প্রধানত বিত্তবানরাই অবসর যাপন করতে যায়। নিজ ভূমি থেকে উদ্বাস্তু হওয়া কোন আদিবাসী জুম্ম সেখানে নিছক আনন্দ উপভোগ করার জন্য নিশ্চয় যাবে না। ষাট দশকে ৫৪ হাজার একর ধানী জমি কাপ্তাই বাঁধে তলিয়ে দিয়ে লক্ষাধিক আদিবাসীকে দেশের মায়া ছিন্ন করে উদ্বাস্তু ও দেশান্তর করে আজ সেখানে বহিরাগত পর্যটকদের জন্য নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু সেই কাপ্তাই লেকের বিশাল জলরাশিতে কত স্বজনহারা ও ভূমিহারা আদিবাসী জুম্মদের অশ্রু জল মিশে রয়েছে তাতে কোন দিন কোন পর্যটকের হৃদয় বিচলিত হয়নি!!

এদেশে আদিবাসী তথা মেহনতি মানুষের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এম এন লারমা। '৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে ৯৭.৫% ছিল আদিবাসী জুম্ম। বাদ-বাকীরা হচ্ছে ০১.৫% মুসলিম আর ০১.০০% ছিল হিন্দু, বড়ুয়া। আজ সেখানে আদিবাসী জুম্ম ও বাঙালির সংখ্যানুপাত হয়ে দাড়িয়েছে ৪৯ : ৫১। তদুপরি প্রায় লক্ষাধিক সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর নিয়মিত উপস্থিতি ধরলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা ইতিমধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। পার্বত্য চুক্তি-উত্তর কালেও এভাবে কেড়ে নেয়া হচ্ছে জুম্ম জাতির গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার। এখন জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার জন্য সেটেলার বাঙালিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কালেজ স্থাপন জরুরী হয়ে উঠেছে। যাতে করে একদিকে আবারো ষাট সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলাফল পুনরাবৃত্তি করা অতি সহজ হবে। অপরদিকে সংখ্যানুপাতের ভারসাম্য হারিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ কখনো সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে না। ফলে আদিবাসীরা বিজাতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোন কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘের সনদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে দেশের সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনেছে। অস্ট্রেলিয়া, কলম্বিয়া ও সোমালিয়া আদিবাসী সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক অবস্থান পরিবর্তন করেছে। ২০০৭ সালে জাতিসংঘের গৃহীত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার দেয়া শুভেচ্ছা বার্তায় এই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের জন্য এক সাথে কাজ করার কথা উল্লেখ থাকলেও সরকার এবিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে বলে নির্দ্বিধায় বলা যায়। বাংলাদেশকে নিয়ে এম এন লারমার স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের পাশাপাশি রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বাংলাদেশের মাঝি-মাল্লা, রিক্সাওয়ালা, ক্ষেত-খামারের শ্রমিক ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে কর্মরত কারখানার শ্রমিক ইত্যাদি খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষের কথা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এম এন লারমা সংসদে সুদীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে তদুদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন, পার্বত্য বাঙালি ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে দিয়ে দেশের গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।

রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর
প্রয়াত নেতা তোমার জন্য একটি খোলা চিঠি

বাচ্চু চাকমা

প্রিয়নেতা,

তোমাকে বাস্তবে দেখার সুযোগ হয়নি। যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে মহামনীষী ও দার্শনিকের জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে তুমিও একজন। একটি জনপদে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য যখন শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন-নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত ও বিলুপ্ত প্রায় ঠিক সেই সময়ে ছাত্র অবস্থায় তুমি হয়ে উঠেছিলে প্রতিবাদী এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে তোমার অবস্থান তুলে ধরেছিলে। মুহূর্তের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়িত জুম্ম জনগণকে নিজের করে নিয়েছিলে। যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে দুটি বিপরীত শ্রেণির অস্তিত্ব দেখা যায়। শাসক বনাম শাসিত- তার মধ্যে তুমি কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করবে সেটা ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছো। শ্রমিক আর কৃষকের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পথ সূচনা করেছিলে। ঠিক সেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠনের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪টি জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রগতিশীল আদর্শকে বুকে লালন করে লড়াই সংগ্রামের সূচনা করেছিলে। ১৯৬০ সালের কাপ্তাই বাঁধ জুম্ম জনগণের মরণফাঁদ। পাকিস্তান আমলের শাসকগোষ্ঠী কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে জুম্ম জনগণকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। সেই সময়ে তরুণ তুমি কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলে। রাষ্ট্রযন্ত্র মিথ্যা মামলায় আটক করে তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। তারপরও শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বার বার রুখে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলে অধিকার-বঞ্চিত মানুষকে দমিয়ে রাখা যায় না।

কর্মজীবনে বিরাট একটি অংশ জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা বিস্তারে কাটিয়ে দিয়েছো। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ এখনও শ্রদ্ধাভরে তা স্মরণ করে থাকে। তাইতো তুমি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মুক্তির দিশারী, জুম্ম জাতির পিতা। ৭০ দশকে জন্ম নেওয়া তোমার পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে দ্বিধাবিভক্ত করার ষড়যন্ত্র হয়েছে বার বার। কিছু সুবিধাবাদী, ক্ষমতালোভী ও প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসকে বিকৃত করে তোমার প্রতিষ্ঠিত জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে যারা তোমার হাতে গড়া ছিল তারা বিভেদপন্থীর ও সুবিধাবাদী ভূমিকা নিয়ে আজ পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বেড়ায়। সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত আদর্শ-বিচ্যুত বিভেদকামীরা তোমার নাম ভাঙিয়ে জুম্মদের মধ্যে তোমার গড়ে তোলা পার্টিকে বিভক্ত করেছে। সম্প্রসারণবাদী কায়দায় তোমার নামকে পণ্য বানিয়ে তারা পার্টি চালানোর অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তবে চিন্তা করো না, জুম্ম জনগণ বুঝে গেছে তাদের ভন্ডামী ও ধোঁকাবাজি।

তুমি জেনে আনন্দিত হবে যে, তোমার রেখে যাওয়া যোগ্য উত্তরসূরি সন্তু লারমা এখনও পার্বত্যবাসীর মুক্তির সংগ্রামে অটল রয়েছে। তোমাকে বদলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তোমার জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনাকে গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুব সমাজ শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে কঠিন এক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তার আশু নিরাময়ের সম্ভাবনা খুবই অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। সন্তান হয়েও তোমাকে এই খবরটি দিতে হচ্ছে বলে আমি অনুতপ্ত। আজ তোমার স্বপ্নের "জুম্মল্যান্ডের" সবুজ পাহাড়গুলো হয়ে উঠেছে সেনা ছাউনি ও সেটেলার বাঙালিদের আবাসভূমি। এই নির্মম বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ দিন অতিবাহিত করছে। তারপরও পার্বত্যবাসী থেমে নেই! যেখানে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা প্রয়োজন সেখানে জীবন দিয়ে হলেও লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বার বার রুখে দাঁড়িয়েছে, সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তোমার লালিত স্বপ্ন। এই আদর্শকে বুকে লালন করে তোমার রেখে যাওয়া উত্তরসূরিরা অনেক কন্টকাকীর্ণ পথে চলেছেন আজীবন ও আমৃত্যু পর্যন্ত। সাধারণের মাঝে তুমি অসাধারণ হিসেবে প্রতিটি মুহূর্তে যে ত্যাগ ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলে তার উদাহারণ তুমি নিজেই। আজ ৩১তম মৃত্যু দিবসে তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

প্রিয়নেতা,

তোমার সংগ্রামী জীবনে একটি মুহূর্ত পর্যন্ত থমকে দাঁড়াওনি। যেখানে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন, যেখানে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন সেখানে সাহসের সাথে তুমি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছো। তুমি নিজেকে জুম্ম জাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছো। জুম্ম জনগণের হাজারো বিপর্যয়ের মধ্যেও তুমি কখনো কোন দিন হতাশ হয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে হার মানোনি। সেজন্য সত্যিকার অর্থে তুমি

মহান বিপ্লবী ও জুম্ম জনগণের পরম বন্ধু। দুনিয়ার সকল নিপীড়িত মানুষ এক নামেই তোমাকে চেনে "মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা"। এখন প্রশ্ন হলো- কোন পরিস্থিতি তোমাকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল? বর্তমানে আমরা যারা ছাত্র ও যুব সমাজ দেখিনি কীভাবে পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে একটি জনপদ, একটি সমাজ ও সভ্যতা। কীভাবে পানির গভীরতায় হারিয়ে যেতে পারে মানুষের বেঁচে থাকার স্বপ্ন। আমরা শুধু ইতিহাসে পড়ি অথবা পূর্ব পুরুষের কাছে আর্তনাদে ভরা গল্প শুনি। কিন্তু তুমি তো কাপ্তাই বাঁধের প্রত্যক্ষদর্শী। অগণিত অসহায় মানুষের চোখে অশ্রু, হাজার হাজার জুম্ম জনগণের বাঁচার স্বপ্নভঙ্গের আহাজারি নিজের চোখের সামনে তা দেখতে পেয়েছো। এই হতাশা, বঞ্চনা ও গ্লানির মর্মবেদনার ঘটনাগুলো তুমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছো বলে সেই বঞ্চিত মানুষের মাঝেই তোমার জীবনকে বীরত্বের সাথে উৎসর্গ করেছিলে।

ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার দালালিপনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছো। রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে তুমি হয়ে উঠেছো প্রতিবাদী। তোমার স্বপ্নের আবাসভূমি আজ অসুন্দরে ভরে গেছে। খুব ভালবেসে যে নাম তুমি রেখেছিলে "জুম্মল্যান্ড" সেটাই আজ ভোগবাদী সমাজের দালালিপনার কারণে হুমকির মুখে। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য আজীবন পরিশ্রম করে হেঁটেছিলে, সেই স্বপ্ন এখনো অন্ধকারে বন্দিশালায় নিমজ্জিত। ১৯৮৩ সালে ১০ই নভেম্বর ছেড়ে যেতে হলো তোমার স্মৃতি বিজরিত স্বপ্নের "জুম্মল্যান্ড" পার্বত্য চট্টগ্রামকে। তুমি চলে গেলেও তোমার হয়ে ফিরে এসেছে অগণিত সংগ্রামী বন্ধু। সেই সংগ্রামী বন্ধুদের মাঝেই তোমার দর্শন, আদর্শ, তোমার চিন্তা চেতনা চির জাগরুক রবে। ১৯৭০ দশকে প্রতিষ্ঠা করা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তোমার পূর্ণ মর্যাদার প্রাপ্তি। সংগঠনটি আত্ম-প্রকাশ করার পর থেকেই পৃথিবীর অন্যসব মুক্তিকামী সংগঠনের মতই আজ প্রথম সারিতে। তাই আমাদের সবারই গর্ব "লারমা আমাদের লারমা"। আজ ছাত্র অবস্থায় মাঝে মধ্যে কলম ধরি, আজ যেমন তোমাকে এই চিঠিটি লিখতে বসেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো, তুমি এখন কেবলমাত্র আমার মাঝে নয়, সারা বিশ্বের নির্যাতিত মানুষেরই।

প্রিয়নেতা,

বেশ কয়েকবার তোমাকে লিখতে গিয়ে তোমার স্বপ্নকে ধ্বংস করার যে ষড়যন্ত্র তা লিখার চেষ্টা করেছি। আমি লিখতে থাকি তোমার কথা, নীরবে ঘুমহীন চোখে। ভাবতে বসি তোমাকে নিয়ে। হ্যাঁ প্রিয়নেতা, তোমাকে বড় বেশি করে মনে পড়ছে আজ! প্রতিরাতেই তোমাকে স্বপ্ন দেখি, কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয় না। তোমাকে স্বপ্ন দেখার প্রতিটি রাত একত্রিত হয়ে অনেক রাত হয়ে আমার হৃদয়ে ভরে গেছে। জানি, তুমি কখনো কোন দিন তা দেখতে আসবে না। কারণ আমাদের জুম্ম জাতির প্রতি তোমার যে অনেক অভিমান(!) হবারও কথা, জুম্ম জাতি যে বড়ই অভাগা। ৩০ বছর কেটে গেলো এখনো তোমার হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে পারেনি। তোমার হত্যাকারী প্রেতাত্মারা এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম করছে। জুম্ম জাতির নব্য বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক প্রসিত-রবিশংকর-এর নেতৃত্বে সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ পার্বত্যবাসীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলছে। রূপায়ণ-তাতিন্দ্র লাল সংস্কারপন্থীরা শাসকগোষ্ঠীর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে তোমার গড়া পার্টির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিভাজনের ঘৃণ্য রাজনীতিতে মেতে উঠেছে। তোমার নামকে ব্যবহার করে একটি ফ্যাকশন করে পার্টিকে দুর্বল করা এবং আন্দোলনকে ছুরিকাঘাত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এই ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীরা শাসকগোষ্ঠীর পঞ্চম বাহিনী হিসেবে দাবার গুটির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। চিন্তা করো না, আমরা তোমার প্রদর্শিত ন্যায়ের পথে রয়েছি। ন্যায়ের জয় অবশ্যই হবে। কেননা তোমার বিপ্লবী আদর্শে অনেক সংগ্রামী লারমা জন্ম হয়েছে আজ পাহাড়ের ঘরে ঘরে। জুম্ম জাতি এখন অধিকার আদায়ে অনেক সচেতন।

তারপরও যারা ধন-সম্পত্তির মালিক, যারা আজ রাজনৈতিক অধিকার কি তা জানে না তারাই আজও রাঙা শহরে বাড়িঘর বিল্ডিং করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছে। এই রাঙা শহরে আমরা যখন সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করি সেই শ্রেণির লোকেরা বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে দিব্বি আরামে চেয়ে থাকে। এই সুবিধাবাদী শ্রেণিরাই তোমার চিন্তা-চেতনার বিপরীতে অবস্থান করে। তোমার শ্রেণি বিশ্লেষণে এই শ্রেণিকে শুধুমাত্র আন্দোলনে পাওয়া যায় না সেখানে শেষ নয়, তারা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাও পালন করে। যেখানে একদল নিপীড়িত মানুষ লড়াই সংগ্রামে ব্যস্ত, সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী জুম্ম-লীগ, জুম্ম-দল ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়ার কাজেই নিমজ্জিত। যে লীগ-দলগুলো জুম্মদের অস্তিত্ব ও অধিকার মানে না, যে লীগ-দলগুলো জুম্ম জাতিগত পরিচিতিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, সেই লীগ-দলে যোগ দিয়ে কিছু সুবিধাবাদী জুম্ম শাসকগোষ্ঠীর লোক উচ্ছিষ্ট লাভে মরিয়া হয়ে পড়েছে। আজ জুম্ম-লীগ ও জুম্ম-দলের দালালিপনা প্রকট আকার ধারণ করছে। যা জুম্ম জাতীয় জীবনে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া ভাগ করো, শাসন করো নীতি প্রয়োগ করে শাসকগোষ্ঠী আমাদের উপর দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে। পৃথিবীর বুকে মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার যে স্বপ্ন তুমি দেখিয়েছিলে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ এখনো অনেক দূরে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ৮০% ছাত্র ও যুব সমাজ এখনো তোমার আদর্শ, চিন্তা-চেতনা সম্যকভাবে বুঝতে পারেনি। একদিকে পুঁজিবাদের রমরমার এই জগতে তরুণ ছাত্র সমাজ ডুবে আছে। এই সমাজব্যবস্থা তরুণ ছাত্র সমাজের চিন্তা-চেতনাকে প্রগতির পথে চলতে বাঁধা সৃষ্টি করছে। এই ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার দালালিপনার কারণে নিপীড়িত মানুষের আন্দোলন থেমে যাচ্ছে। আজ তোমার স্বপ্নগুলো অংকুরেই বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র হতে চলেছে। অপরদিকে তোমার স্বপ্নগুলো মানুষকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা দেয়, মানুষকে উজ্জীবিত

করে। আজ তোমার স্বপ্নগুলো তোমাকে জানাতে চাই এভাবে মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে শ্রমিক, কৃষক, রিক্সাওয়ালা, জেলে, তাঁতি ও সকল মেহনতি মানুষের কথা বলেছিলে, নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলে, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছিলে, মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলে এবং জুম্ম জনগণের সামগ্রিক মুক্তির কথা বলেছিলে। স্বপ্ন দেখেছিলে তোমার "জুম্মল্যান্ড" বিজাতীয় শাসন শোষণ থেকে একদিন মুক্ত হবে। জুম পাহাড়ে করুণ আর্তনাদ, কান্নার আহাজারি থেমে যাবে। এটাই তো তোমার স্বপ্ন! এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মহান স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের কাছে তুমি ফিরে গিয়েছিলে। "গ্রামে চলো" স্লোগান তুলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটির সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গ্রামাঞ্চলের অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে থাকা নিপীড়িত, বঞ্চিত, গরীব, দুঃখী মানুষের কাছে ফিরে গিয়ে তোমার চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে প্রচার করেছিলে। অপেক্ষাকৃত সুখী-সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তোলার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের কাছে সংগ্রামের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলে। কীভাবে সুন্দরতর পৃথিবী গড়ে তোলা যায় সেই পথে অক্লান্তভাবে আজীবন হেঁটেছিলে। তাই তো তুমি জুম্ম জাতির মুক্তির দূত।

প্রিয়নেতা,

তোমাকে আরও একটি খবর না জানিয়ে পারছি না। খবরটা তোমার কাছে পৌছলেই মন খারাপ করো না। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য একের পর এক নয়া-সাম্রাজ্যবাদের মতো করে শাসকগোষ্ঠী ডিজিটাল ষড়যন্ত্র শুরু করছে। রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার মধ্য দিয়ে কাপ্তাই বাঁধ এর মতো জুম্মদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। তুমি ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে জুম্মদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করার গভীর ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে তুমিই একমাত্র প্রতিবাদ করেছিলে। অনুরূপভাবে জুম্ম জনগণ তথা নিপীড়িত মানুষের পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর তোমারই ছোট ভাই যোগ্য উত্তরসূরি সন্তু লারমা জুম্মদের ভবিষ্যত মরণফাঁদ মেডিকেল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। বর্তমানে ছাত্র ও যুব সমাজ একই সাথে মহান পার্টির আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়েছে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে নেমে এসেছে। শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের কোন শেষ নেই! শেষ নেই নির্যাতন, নিপীড়নের। মানবতা যেখানে ভূলুণ্ঠিত, যেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে ভূমি বেদখল, উন্নয়নের নামে যেখানে প্রহসন, সেখানে ছাত্র ও যুব সমাজ অপ্রতিরোধ্য ভূমিকায় আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তোমার রেখে যাওয়া আদর্শ আর রাত জেগে লেখা এই কলমের শক্তি দিয়ে সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসী শক্তিকে আমরা পরাজিত করবোই। যেমনি পরাজিত হয়েছিল ৮৩ সালের জুম্ম জাতির বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্ররা।

তোমাকে আরও একটি বিষয় জানাতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ আগের মতো সেনাবাহিনী দেখে ভয়ে আতংকিত হয়ে আর বসে থাকে না। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, যেমনি করেছিলে তুমিও। তুমি যে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলে, সেই মশালের আলোতে আজ জুম্ম জাতি জেগে উঠেছে। তুমি আজ স্বশরীরে আমাদের পাশে নেই বটে, কিন্তু তুমি যে অনেক দায়িত্ব আমাদের উপর রেখে গেছো, সেই দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা ব্যানার হাতে রাজপথে নেমেছি। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন নির্যাতন নিপীড়নের প্রতিবাদে মানববন্ধন, মিছিল ও সমাবেশ করছি। যখনিই আমরা দাবি আদায়ের জন্য রাজপথে জনস্রোতে মিশে গিয়ে স্লোগান দিতে থাকি, তখনি মনে হয় তুমি যেন আমাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে স্লোগান দিচ্ছো। আর সেই প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এভাবে প্রতিরাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখি এবং তোমার উদ্দেশ্যে লিখতে বসি। লেখার কোন শেষ হয় না। কারণ তোমার আদর্শই যে জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র ঠিকানা।

পরিশেষে অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে জানাতে চাই যে, তোমার আদর্শকে চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্য তোমার গড়ে তোলা আন্দোলনের ফসল আঞ্চলিক পরিষদ এর অফিসের সামনে গ্রেনেড হামলা করে সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ কর্মীরা পালিয়ে যায়। সন্তু লারমার উপর গ্রেনেড হামলা করা মানেই জুম্ম জাতির উপর, মানবতার উপর তথা প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে আঘাত করার সামিল। তোমাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। আবারও প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, ক্ষমতালোভীরা বর্তমান প্রিয়নেতাকে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্রে মেঠে উঠেছে। তোমার চিন্তা করার কোন কারণ নেই, প্রগতিশীল শক্তি সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত করবেই। জুম্ম জনগণের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া আঞ্চলিক পরিষদের অফিসের সামনে বোমা হামলা করে প্রিয়নেতা সন্তু লারমার প্রাণ নাশের যে হুমকি দেওয়া হয়েছে সেই সব ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ছাত্র ও যুব সমাজ বসে নেই। ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে যে কালো অধ্যায়ের জন্ম দেওয়া হয়েছিল, সেখানে শুধুমাত্র তোমাকে হত্যা করা নয়, একটি স্বপ্ন, একটি আদর্শ, সর্বোপরি একটি সংগ্রামী জীবনকে থামিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য অপচেষ্টা করা হয়েছিল। নিপীড়িত জুম্ম জনগণের অধিকার আদায় করতে গিয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই সকল বীর শহীদদের প্রতি নিপীড়িত মানুষ ১০ই নভেম্বর এই দিনে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। জয় হোক তোমার আদর্শের, মুক্ত হোক বিশ্বের নিপীড়িত মানুষ, অধিকার ফিরে আসুক জুম্ম জনগণের, তোমার স্বপ্নগুলো ছড়িয়ে পড়ুক পাহাড়ের প্রতিটি ঘরে ঘরে।

জীবন দিয়ে এম এন লারমার যে শিক্ষা তা ভুলে যাবার নয়

রিপেশ চাকমা

আজ ১০ নভেম্বর জুম্ম জাতীয় শোক দিবস। ১৯৮৩ সালের আজকের এ দিনে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে (এম এন লারমা) ৮ জন সহযোদ্ধাসহ হত্যা করা হয়। ৩১তম জুম্ম জাতীয় শোক দিবসে মহান নেতা এম এন লারমাসহ সকল বীর শহীদদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি। শোকাহত পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। ১০ নভেম্বর '৮৩ সনে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হবার নয়। সমগ্র জুম্ম জাতি আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

এম এন লারমা ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণসহ বাংলাদেশের আপামর মেহনতি মানুষের কথা বলেছিলেন। পক্ষান্তরে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর এম এন লারমার তীব্র বিরোধিতা ও প্রতিবাদকে অগ্রাহ্য করে "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন" বলে প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগোষ্ঠীসহ দেশের অপরাপর আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে "বাঙালি" হিসেবে আখ্যায়িত করে সংবিধান চূড়ান্ত করা হয়। তিনি ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেন। জুম্ম জনগণের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশর প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর দেশের রাজনৈতিক পথ পরিবর্তন হওয়ায় আত্মগোপনে চলে যান। গণতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ হওয়ায় জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে আন্দোলন সশস্ত্র রূপ ধারণ করে। জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা "শান্তি বাহিনী"র মাধ্যমে শাষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে উঠে।

এক পর্যায়ে দেশি-বিদেশী ষড়যন্ত্রে পার্টির মধ্য থেকে কিছু সদস্য বিভেদপন্থা অবলম্বন করে। দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন ও দ্রুত নিষ্পত্তি আন্দোলন নামে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যারা দ্রুত নিষ্পত্তির পক্ষে তারা বাদী গ্রুপ, অন্যদিকে যারা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পক্ষে তারা লাম্বা গ্রুপ নামে পরিচিত লাভ করে। পার্টির কিছু সদস্যের এ বিভেদের কারণে জুম্ম জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। শাষকগোষ্ঠীর অব্যাহত নিষ্পেষণ থেকে যে কেউ দ্রুত মুক্তি পেতে চাইবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু বিভেদপন্থীদের দ্রুত নিষ্পত্তির শ্লোগান ছিল জনগণ ও কর্মীবাহিনীকে বিভ্রান্ত করার কৌশল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজের প্রেক্ষাপট অনুসারে দ্রুত নিষ্পত্তির তত্ত্ব যে অবাস্তব ধারণা, তা বুঝানো অনেক কঠিন ছিল। যারা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পক্ষে তারাইতো বুঝতে পেরেছিলেন জুম্ম সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দ্রুত নিষ্পত্তি অবাস্তব তত্ত্ব। অধিকার আদায় করা এত সহজ নয়। তাই এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সমাজকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। এহেন প্রেক্ষাপটে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এম এন লারমা সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে 'ক্ষমা করা, ভুলে যাওয়া' নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিনিময়ে চার কুচক্রী গিরি (ভবতোষ দেওয়ান) - প্রকাশ (প্রীতি কুমার চাকমা) - দেবেন (দেব জ্যোতি চাকমা) - পলাশ (ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান) এর নেতৃত্বে বিভেদপন্থীরা অর্তকিতভাবে হামলা করে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বরে মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করে।

এই ঘটনা প্রমাণ করলো বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রকারী শত্রুকে ক্ষমা করতে নেই। এম এন লারমা ঐক্যের স্বার্থে বিভেদপন্থীদের ক্ষমা করেছিলেন কিন্তু বিভেদপন্থীরা তাঁকে ক্ষমা করেনি। তারা এটাকে ঐক্যের স্বার্থে ঐক্য করেনি, তারা ঐক্যের ছলনা করে সুযোগের আশ্রয় নিয়েছিল। জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন, বিভেদকামীদেরকে ক্ষমা করলে এ পরিণতি হয়। মূলত দ্রুত নিষ্পত্তির নামে জুম্ম জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তা না হলে সমঝোতার পর এম এন লারমাকে তারা হত্যা করতো না। ১০ নভেম্বরের ঘটনার পর সরকারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করতো না। জুম্ম জনগণকে দ্রুত সময়ে অধিকার এনে দেয়ার শ্লোগান যে ধোঁকাবাজি ছিল তা জনগণ বুঝতে পেরেছিল বলেই তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। মূলত জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়ে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশরা ষড়যন্ত্রের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই তারা ঐক্যের অভিনয় করে এম এন লারমাকে হত্যা করেছিলো। মত পার্থক্য থাকলে তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেত। কিন্তু '৮৩ সালের ঘটনা মতপার্থক্য ছিল না, ছিল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শের ক্ষেত্রে পার্থক্য। তাদের মূল লক্ষ্যই ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

আন্দোলনকে ধ্বংস করা। তাই এর সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি। কেননা অবৈরী দ্বন্দ্ব মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে সমাধান করা যায়, কিন্তু বৈরী দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমাধান করতে হয়। তাই এর সমাধানও চরম সংঘাতের মধ্য দিয়ে করতে হয়েছে।

'৮৩ সালের বিভেদপন্থীরা বিজাতীয় ছিলো না, জাতিতে তারা ছিলো জুম্ম। দেখতে ভাইয়ের মতন ছিলো। সবচেয়ে বড় কথা তারাও পার্টিতে ছিলো। কিন্তু তারা পার্টির নীতি আদর্শ থেকে অনেক বিচ্যুত হয়ে যোজন যোজন দূরে চলে গিয়েছিল এবং উপদলীয় চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। তাই তাদের চিন্তা, আদর্শ, দর্শন জুম্ম জাতীয়তাবাদের পক্ষে ছিল না, ছিল না মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে। তাছাড়া মানুষের চিন্তা, আদর্শ, দর্শন নির্দিষ্ট কোন স্থান, জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই জুম্ম হলে জুম্মদের পক্ষে থাকবে, জুম্ম না হলে জুম্মদের বিপক্ষে থাকবে এমন কোন কথা না। তাই ১০ নভেম্বরে এম এন লারমাকে স্বজাতির বিভেদপন্থীরাই হত্যা করে। এ ঘটনার আগে অনেকেই বুঝতে পারেনি। তাই জীবন দিয়ে এম এন লারমাকে প্রমাণ করতে হলো ছলনাময়ী বিভেদকামী শত্রুকে ক্ষমা করা যায় না। স্বজাতির মধ্যেও শত্রু থাকতে পারে এবং তারা সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ হয়। যা আমরা এখনও দেখতে পাই। এ ঐতিহাসিক সত্যটি আজ সবার কাছে উপলব্ধি করা দরকার। কিন্তু কেন জানি আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না। এ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বার বার এ করুণ বাস্তবতার উদ্ভব ঘটেছে বা ঘটছে। যার ফলশ্রুতিতে নতুন করে আরও শুনতে হয় তথাকথিত ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত, তথাকথিত ঐক্য ইত্যাদি সস্তা শ্লোগান। যারা এ শ্লোগান উচ্চারন করেন এবং যারা শুনে বিভ্রান্ত হন আমি তাদেরকে বলবো ১০ নভেম্বরের ইতিহাস একটু স্মরণ করুন। আপনার সব বিভ্রান্তি চলে যাবে।

জুম্ম জনগণকে দ্রুত সময়ে অধিকার এনে দেয়ার শ্লোগান যে ধোঁকাবাজি ছিল তা জনগণ বুঝতে পেরেছিল বলেই তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। মূলত জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়ে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশরা ষড়যন্ত্রের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

দীর্ঘ ২৪ বছর সশস্ত্র সংগ্রামের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় পার্বত্যবাসীর বুকে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। পার্বত্যবাসী দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক ও সম্ভাবনাময় জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। ছাত্র সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ এ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিল। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও সমাদৃত হয় এ চুক্তি। তাই সে সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। যদিওবা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই পুরস্কারের মান রক্ষা করতে পারছেন না চুক্তি বাস্তবায়ন না করার কারণে।

শাসকগোষ্ঠীর মদদে তৎসময়ে জুম্ম ছাত্র সমাজের একটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী অবস্থান নেয়। চুক্তিকে বিরোধীতা করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় তারা ইউপিডিএফ নামে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন গড়ে তোলে এবং তা সশস্ত্র উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা, মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে যাতে করে এতদাঞ্চলে পূর্বের মতো সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের উপস্থিতির পক্ষে অজুহাত দাঁড় করাতে পারে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের প্রাক্কালে পানছড়ির লোগাঙে জনসংহতি সমিতির সদস্য সুনেন্দু বিকাশ চাকমাকে হত্যার উদ্দেশ্য আক্রমন করা এবং চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে ১৯৯৮ সালের ১৮ জানুয়ারী কুতুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির সমর্থক অশ্বিনী কুমার চাকমাকে নৃশংস লাঠিপেটা ও কুপিয়ে হত্যার মধ্য দিয়ে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। তারা একের পর এক আঘাত করতে থাকে জনসংহতি সমিতির কর্মীবাহিনীকে, বাধাগ্রস্ত করতে থাকে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে। আঘাত করতে থাকে চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনকারী সকল প্রগতিশীল শক্তিকে। আঘাত করতে থাকে পার্বত্যবাসীর দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল, চুক্তির ফলে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বহুবার হামলা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২০ মে ২০১২ সালের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে গ্রেনেড হামলা করে জুম্ম ছাত্রদের তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল এবং অনেক টগবকে তরুণের জীবনকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করেছিল এই ইউপিডিএফ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল রক্তেগড়া এ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জুম্ম জনগণের উপর সকল প্রকার শোষন-বঞ্চনা, নিপীড়ন-নির্যাতন, অন্যায়-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ রচনা করে আসছে। তাই জুম্ম জনগণের স্বপ্নভূমি এ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উপর হামলা- জুম্ম জনগণের উপর হামলার সামিল। ইউপিডিএফ সেই আত্মঘাতি জঘন্য কাজটি করেছে। দীর্ঘ ১৭ বছরে অনেক অপূরণীয় ক্ষতি করেছে, যা আমরা কোনদিন পূরণ করতে পারব না। এভাবে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কি দরকার ছিল ইউপিডিএফ এর? পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের শ্লোগান নিয়ে এ সংগঠনের

জন্ম হলেও দীর্ঘ ১৭ বছরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কোন রূপরেখা দিতে পারেনি। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন কি জিনিস তা নিয়ে স্বয়ং তাদের মধ্যে চরম অস্পষ্টতা রয়েছে। তাই আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক কর্মসূচিও দিতে পারেনি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের স্বপক্ষে। অধিকার আদায় করতে হবে সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী থেকে। কিন্তু তারা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে তারা করেছে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনের বিরুদ্ধে। এটাই প্রমাণ করে তারা মুখে জুম্ম জনগণের অধিকার কথা বললেও তাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো আন্দোলনরত জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে প্রতিহত করা। তার অর্থ হচ্ছে সরকার বা শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করে দেয়া।

পার্বত্যবাসীর দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফসল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। এ চুক্তির ফলে অর্জিত অধিকারগুলো পার্বত্যবাসী পেতে চাই। কিন্তু বাস্তবতার নির্মম পরিহাস ইউপিডিএফের বিরোধিতার কারণে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মূলত ৮২-৮৫ সালের সেই জাতিবিধ্বংসী ষড়যন্ত্রকারী, বিভেদপন্থী ও জিঘাংসায় মত্ত ঘাতকদের বর্তমানেও আমরা এখনও দেখতে পাই নানা রূপে, নানা ঢঙে। যার বর্তমান নাম এই ইউপিডিএফ। এরা মূলত বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চার কুচক্রীদেরই অশুভ প্রেতাত্মার নতুন সংস্করণ। তাদের মুখে জনগণকে ভোলানো নানা কল্পকাহিনী ও স্বপ্নের অবতাড়না করেছিল, কিন্তু কার্যত জাতিবিধ্বংসী বিভেদ, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, জিঘাংসা আর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই করেনি। তাদের এসব কর্মকান্ড জুম্ম জাতিকে ধ্বংস আর সংঘাত ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি।

বস্তুত যাদের জন্মই হচ্ছে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিভেদপন্থার মধ্য দিয়ে, তাদের সাথে কতটুকু পরিমাণে সমঝোতা হতে পারে বা সমঝোতার স্থায়ীত্ব কতটুকু হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবুও ইউপিডিএফ-এর সাথে যে একেবারেই সমঝোতার চেষ্টা হয়নি তা নয়। আন্দোলনের বৃহত্তর স্বার্থে জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে ইউপিডিএফের সাথে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করা হয়। তৎকালীন সময়ে উপেন্দ্র লাল চাকমাসহ অনেকের মধ্যস্থতায় জনসংহতি সমিতি সমঝোতা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ২০০০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ির নারানখিয়ায় অনন্ত বিহারী খীসার বাড়িতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৈঠকে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সমঝোতা চুক্তির কালি শুকাতে না শুকাতেই ১২ ঘন্টার মাথায় ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ির দাঁতকুপ্যা এলাকায় সুখেন্দু বিকাশ চাকমা নামে জনসংহতি সমিতির একজন নিরীহ প্রত্যাগত সদস্যকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

এমন তিক্ত ও মীরজাফরী অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সমঝোতার ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি বরাবরই জাতীয় স্বার্থে ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছে। তারই অংশ হিসেবে সর্বশেষ ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সমঝোতার উদ্যোগ চলে। জনসংহতি সমিতি খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ প্রার্থীকে সমর্থন দেবে আর রাঙামাটি ও বান্দরবানে ইউপিডিএফ জনসংহতি সমিতির প্রার্থীকে সমর্থন দেবে-এর ভিত্তিতে। ইউপিডিএফ এর নানা তালবাহানার এক পর্যায়ে নির্বাচনের একদম চূড়ান্ত দিনক্ষণে ইউপিডিএফ সমঝোতা প্রক্রিয়া থেকে সরে দাঁড়ায়। জনসংহতি সমিতির পক্ষে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য যে কেন্দ্রীয় সদস্যকে মনোনীত করা হয়েছে তাকে তারা গ্রহণ না করার অজুহাত দেখিয়ে ইউপিডিএফ সমঝোতায় স্বাক্ষর করেনি। পরিণতিতে ঠিক নির্বাচনের একদিন আগে সমঝোতা প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়। এ থেকে আরও একবার প্রমাণিত হলো, ষড়যন্ত্র আর বিভেদপন্থীদের সাথে সমঝোতার কোন সুযোগ নেই। এই বাস্তবতাকে পার্বত্যবাসীর ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে। কিন্তু কেন জানি দীর্ঘ ১৭ বছরেও জুম্মদের মধ্যে এখনো কতিপয় ব্যক্তি ইউপিডিএফের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে আছে। এজন্য এখনো শুনতে হয় ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত, তথাকথিত ঐক্য-সমঝোতা ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর কথা।

'৮৩ সালে এম এন লারমা, ১৯৯৮ সালে অশোক কুমার চাকমা, ২০০০ সালে সুখেন্দু বিকাশ চাকমা জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন, বিভেদকামীদের ক্ষমা করলে, বিশ্বাস করলে ক্ষতি করে। বিভেদপন্থী বিশ্বাসঘাতকরা কখনো আপন হয় না। মানুষের জীবন দিয়ে দেয়া শিক্ষা কেউ যদি তাতে বুঝতে না পারে তবে তার সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করতে হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে মানুষের আদর্শ, চিন্তা নির্দিষ্ট কোন জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কাজেই জুম্ম হলে প্রতিক্রিয়াশীল ও জুম্ম জাতীয় স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করবে না, জুম্ম না হলে সবসময় আন্দোলনের পক্ষে থাকবে এমনটা ভাবা সঠিক নয়। '৮০ দশকের গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশরাও জুম্ম ছিল। যারা জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে গলা টিপে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্য বিভেদপন্থী কার্যকলাপের অবতাড়না করেছিল। আজ একইভাবে বিভেদকামিতার আশ্রয় নিয়ে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীরা জুম্ম জনগণের উপর নৃশংস সংঘাত, হত্যা, সন্ত্রাস চাপিয়ে দিয়েছে। নিজের জীবন দিয়ে যে শিক্ষা এম এন লারমা গিয়ে গেছেন সেই চাক্ষুস বাস্তবতা থেকে শিক্ষা থেকে এসব চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী বিভেদকামী ও সংস্কারপন্থীদের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে প্রশ্নে জুম্ম জনগণকে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হবে। '৮৩ সালের গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদের যেরূপে কঠোরভাবে দমন করতে হয়েছে এবং এতে সমগ্র জুম্ম জনগণ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে, তদ্রুপভাবে চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের প্রশ্নেও সমগ্র জুম্ম জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। নীরব দর্শক হয়ে থাকলে চলবে না, সমস্যা আপনা আপনি সমাধান হবে না, নিজেকে সমাধান করতে হবে। সমস্যা কেবল জনসংহতি সমিতির নয়, এ সমস্যা সমগ্র জুম্ম

আজ একইভাবে বিভেদকামিতার আশ্রয় নিয়ে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীরা জুম্ম জনগণের উপর নৃশংস সংঘাত, হত্যা, সন্ত্রাস চাপিয়ে দিয়েছে। নিজের জীবন দিয়ে যে শিক্ষা এম এন লারমা গিয়ে গেছেন সেই চাক্ষুস বাস্তবতা থেকে শিক্ষা থেকে এসব চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী বিভেদকামী ও সংস্কারপন্থীদের প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

জনগণের। বুঝতে হবে বিভেদপন্থীদের সাথে মুক্তিকামী জুম্ম জনগণের লড়াই চলছে। এ ধরনের সমস্যা শুধু জুম্ম জনগণের মধ্যে দেখা দিয়েছে তাই নয়, শ্রেণি বিভক্ত সমাজে যেখানে শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল, সেখানে প্রত্যেক জাতীয় জীবনের ইতিহাসেও এ ধরনের ষড়যন্ত্র ও বিভেদকামিতা আমরা দেখতে পাই। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন ঘটেছিল মীর জাফরের বেঈমানীর কারণে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের মধ্যে থেকে অনেকেই বিরোধীতা করেছিল এবং রাজাকার-আলবদর-আলশামস-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এটাই ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা। তারপরও ভারতীয় উপমহাদেশ বৃটিশদের শাসন-শোষন স্থায়ী করা যায়নি, উপমহাদেশের জনগণ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানীদের শাসন-শোষণ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে। তবে এ অর্জন আপনা আপনি হয়ে ওঠেনি, রক্ত-পিচ্ছিল প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়েছিল। সকল বিভেদ, ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতা প্রতিহত করে মুক্তিকামী জনগণকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। তা না হলে সম্ভব হতো না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নেও সকল বিভেদ, ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মুক্তিকামী জুম্ম জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে অন্য কেউ এগিয়ে এসে অধিকার এনে দেবে না বা স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ষড়য়ন্ত্রকে প্রতিহত করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে দিয়ে যাবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য শুধু '৮৩ সালের ঘটনা নয়, পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মুখোশ বাহিনী, আঙ্গুল বাহিনী, গপ্রক বাহিনী, ট্রাইবেল কনভেনশন ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছিল। জুম্ম বিনাশী এ কার্যক্রমে যারা সামিল হয়েছিল তারাও জুম্ম ছিলেন। এখনও পর্যন্ত জুম্মদের মধ্য থেকে অনেকে নানান সুবিধাবাদিতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, দালালীপনার আশ্রয় নিয়ে চলেছে। তারা প্রতিনিয়ত জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে আঘাত করে চলছে। ষড়যন্ত্রকারী ও বিভেদকামীদের এ ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্যই হলো শাসকগোষ্ঠীর জুম্ম জনগণকে জাতিগত নির্মূল করার হীন কার্যক্রম সহজতর করা। তাই তাদের সাথে ঐক্য করে নয়, পূর্বে যেমনটি ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিহত করতে হয়েছে, এখনও তাই করতে হবে। বিভেদপন্থীদের সাথে সমঝোতা করলে কি হয় ১০ নভেম্বর তার জ্বলন্ত উদাহরণ। মহান নেতা এম এন লারমা জীবন দিয়ে শিখিয়ে গেছেন যা আমরা ভুলতে পারি না। জুম্ম জনগণকে তা সম্যকভাবে বুঝতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তার কোন বিকল্প নেই।

দশই নভেম্বর নিয়ে

কিছু স্মৃতি, অতঃপর কিছু কথা

হেলি চাকমা

আমাদের স্বপ্নদ্রষ্টা শ্রদ্ধেয় নেতা এম এন লারমাকে নিয়ে ব্যাপকভাবে না হলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞ জ্ঞানী-গুণীর হাত ধরে রচিত হয়েছে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গান, গল্প, কবিতা কিংবা প্রবন্ধ। অনুষ্ঠিত হয়েছে সভা, সেমিনার, মিটিং, মিছিল। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো রচিত হবে আরও অনেক কালজয়ী গান, গল্প, কবিতা কিংবা প্রবন্ধ। কিন্তু তাঁকে নিয়ে কিছু লেখার দুঃসাহসিক অভিযানে বারবার নামলেও সেটা আমার পক্ষে বরাবরই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। তাই আমি আর ঐ পথে এগোচ্ছি না। কেননা বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাঁর এত বিশাল পদচারণা, তাঁর সব বিষয়কে এক জায়গায় জড়ো করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা কঠিন একটা কাজ। বিশেষ করে আমার মত খুদে এক লেখকের কাছে সেটা প্রায় অসম্ভবও বটে।

আজ থেকে ঠিক কয়েক বছর আগেও প্রয়াত নেতার সাথে আমার কোন যোগসূত্র ছিল না। ঠিক জানতাম না, তিনি কে? কীই বা তাঁর পরিচয়, কৃতিত্ব বা আদর্শ? শুধু এটুকু মনে পড়ে, যখন আমার বয়স সাত কি আট বছর, তখন সচেতন জুম্ম সমাজ আড়ম্বরপূর্ণভাবে না হলেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে ১০ই নভেম্বর দিনটি পালন করতো এম এন লারমার প্রয়াণ দিবস হিসেবে। এর বাইরে দিনটার গুরুত্ব বা তাৎপর্য কোনটাই আমার জানা ছিল না।

সেসময় ১০ই নভেম্বর মানে ভয়াবহ ঠান্ডা আর কনকনে শীত। চারপাশ ঘন কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে আমার প্রিয় কাকাদের হাত ধরে আমিও যেতাম খালি পায়ে হেঁটে, বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করে। সাথে হরেক রকমের ফুল নিয়ে ১০ই নভেম্বরে সামিল হতে। যদিও দিনটির যথার্থতা উপলব্ধি করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা আমার ছিল না সেই বয়সে। যেটি আমি আগেও বলেছি। তবুও কেন যেন একটা উৎসবের মত অজানা আগ্রহ কাজ করতো আমার নিজের মধ্যে।

উল্লেখ্য, শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তখন কোন নির্দিষ্ট বা স্থায়ী প্রতিকৃতি ছিল না। কেবলমাত্র এই দিনটির জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থানে কয়েকদিন আগে বেড়া দিয়ে চারকোণা করে একটা অস্থায়ী ঘর বা বেদী তৈরি করা হতো। ঘরটাকে বিভিন্ন রঙিন কাগজ দিয়ে সাজিয়ে একদম মাঝখানে রাখা হতো ফ্রেমে বাঁধা নেতার সাদা-কালো ছবি। মূলত সেখানেই শ্রদ্ধার সাথে শোক দিবস পালন করা হতো। প্রায় প্রতিটি গ্রামে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ই নভেম্বর পালন করা হতো। আমাদের গ্রামগুলো ছিল কাছাকাছি। ৫/১০ মিনিট হাঁটলে অন্য একটা গ্রামে যাওয়া যেত। যার কারণে আমরা সমবয়সীরা একটার পর একটা গ্রামে যেতাম, ফুল দিতাম আর চকোলেট সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতাম (বয়োজ্যেষ্ঠরা চকোলেট বিতরণ করতো)। সবচেয়ে বেশি উপভোগ করতাম বিকেলের ফানুস উড়ানোর মুহূর্তটা। এই মুহূর্তটার জন্য সারাদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকতাম।

অবশ্য সেসব এখন শুধু স্মৃতি। এর মাঝে পেরিয়ে গেছে দীর্ঘ কয়েক বছর। এই কয়েক বছরে সকল ক্ষেত্রে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। হয়েছে সংযোজন-বিয়োজন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন। তখনকার ও এখনকার সামাজিক অবস্থা, বাস্তবতা, পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা–সবকিছুর মাঝে বিশাল ফারাক ও পরিবর্তন। তখনকার সমাজের একতা, সমঝোতা, দায়বদ্ধতার যথার্থ ও পর্যাপ্ত প্রতিফলন আজ আর লক্ষ্য করি না। বরং অসামাজিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, যান্ত্রিকতা ও সুযোগসন্ধানীর স্পষ্ট চিত্র সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে দৃশ্যমান।

গুরুজনদের কথা– 'যায় দিন নাকি ভালো, আসে দিন খারাপ'। হয়তো তাই। আগেকার সমাজব্যবস্থা রক্ষণশীল হলেও যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী ছিল। যার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব তেমন একটা ছিল না। কিন্তু বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে যতই নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে ততই যেন বিশৃঙ্খলার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। সামাজিক মূল্যবোধ মুখ থুবড়ে পড়ছে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মিথ্যার মলিনতা বুঝি আচ্ছন্ন করেছে পুরো সমাজকে। জাতীয়তাবোধের চেতনা আজ প্রশ্নবিদ্ধ। দানবীয় মানুষের অত্যাচারে বিবেক ও মনুষ্যত্ব আজ লাঞ্ছিত ও অপমানিত। সমাজের প্রতিটি স্তরে বিভেদপন্থীদের দালালীপনা ও লেজুড়বৃত্তির উগ্র আওয়াজ এবং সর্বত্র প্রতারণার ফাঁদ পাতা। তারই নামে সংযোজন হয়েছে চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যকার সংঘাত নামে আরেক নতুন মাত্রা। যার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আক্রমণে আজ উচ্চ শ্রেণি হতে নিম্ন শ্রেণি সকলেই আক্রান্ত। অর্থাৎ সবকিছু মিলে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব আজ অত্যন্ত সংকটাপন্ন।

এখানেই শেষ নয় কিন্তু। মিথ্যা অপহরণের নাটক সাজিয়ে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র ভিটেমাটি থেকে নয়, দেশ থেকে কীভাবে বিতাড়িত করা হয়–সেসব আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই রাষ্ট্রযন্ত্রে একটা সংকোচন-প্রসারণে মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি জিনিসকে কেন্দ্র করে অনবরত আমাদেরকে ইন্দ্রজালের মত ঘিরে আছে। কিন্তু ব্যক্তি, সমাজ, রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতা এবং দেশের বর্বর হিংস্র শাসকগোষ্ঠীর মর্মান্তিক আঘাত। কোথাও কোন নাটকীয়তার শেষ নেই। একটা নাটকের মহড়া শেষ হতে না হতে অন্য একটা নাটকের মহড়া প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। তাই জাতীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানতার সাথে আমাদের মোকাবেলা করা দরকার।

দিন গড়িয়ে যাচ্ছে আর সাধারণ মানুষের মনে উৎকণ্ঠা জমা হচ্ছে। সময়ের সাথে বিভিন্ন কিছুর পট পরিবর্তন হচ্ছে এবং মুক্তির পথ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমার মনে হয়, অতীতে জাতীয় সমস্যায় তরুণরা যে অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছিল, বর্তমান সময়েও তাদেরকে সেভাবে এগিয়ে আসার উপযুক্ত সময় এসেছে। কারণ তরুণরাই হচ্ছে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, ভালো কিছু পরিবর্তনের মূল হাতিয়ার আর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি।

আসুন দিন বদলের তুমুল আওয়াজ নিয়ে, সঠিক আদর্শকে অনুসরণ করে মিথ্যা অগ্রহ থেকে বেরিয়ে পড়ি। ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিই, আত্মকেন্দ্রিকতাকে পরাজিত করি, ভীরুতাকে পদদলিত করি, ভয়কে অবদমন করি, সুবিধাবাদিতাকে উপেক্ষা করি। যে কোন ক্ষেত্রে শিক্ষিত জনসাধারণের মনমানসিকতা দ্বারা সমাজ প্রভাবিত হয়। তাই শিক্ষিত তরুণ সমাজ হিসেবে আমাদেরকে এগিয়ে এসে বাস্তবতা অনুসারী কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম হাতে নিয়ে বাস্তবায়নের জন্য নেতৃত্বের ভার কাঁধে তুলে নিতে হবে।

নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। কারণ তারাও সমাজের অর্ধেক অংশ।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

এম এন লারমা : জুম্ম জাতীয় চেতনার স্ফুলিঙ্গ

তেজদীপ্ত চাকমা অজিত

মানব সমাজের অগ্রযাত্রায় কিছু মানুষ আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা তাঁদের সুযোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমাজের বিকাশকে একধাপ এগিয়ে নিয়েছেন। বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের ইতিহাসে এরকম অসংখ্য অগ্রনায়কের জন্ম হয়েছে, যাদের আত্মত্যাগ ও মহীমায় নিপীড়িত মানুষ পেয়েছে বিদ্রোহের সুর, পরাধীন জাতি পেয়েছে মুক্তি সংগ্রামের মশাল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী চৌদ্দটি আদিবাসী জুম্ম জাতির ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এককালে স্বাধীন, অদম্য ও বিদ্রোহী জুম্ম জাতি দীর্ঘ উপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন-শোষণ, নিপীড়ন-বঞ্চনার ফলে তার অস্তিত্ব প্রায় হারিয়ে যেতে বসে। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন এক শাসনব্যবস্থা কায়েম করে যেখানে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন-শোষণের পাশাপাশি স্বজাতীয় সামন্তবাদী শাসন-শোষণকে গভীরভাবে পাকাপোক্ত করে। একদিকে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন-শোষণ আর অন্যদিকে চরম প্রতিক্রিয়াশিল সামন্ততান্ত্রিক শাসন-বঞ্চনা জুম্ম জাতিকে একটি বিকাশহীন অন্ধকার গোলকধাধায় নিক্ষেপ করে। স্রোতহীন নদীর মতো জুম্ম জাতি হয়ে পড়ে নিচ্ছল ও নিষ্প্রাণ। ফলে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। তৎকালীন সামন্ত নেতৃত্ব এততাই প্রতিক্রিয়াশীল যে, সামন্ত প্রভূর অনুমতি ব্যতিরেকে একজন জুম্ম ছাত্রের স্কুলে যাওয়া ছিল পুরোপুরি অসম্ভব। এমনকি মানসম্মত (দ্বোধারা বেড়া) ঘর-বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে সামন্তপ্রভূর অনুমতি নেওয়া ছিল অবধারিত। মানব সভ্যতা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনায় প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন জুম্ম জাতি ছিল অনেকটা গভীর সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত। তৎকালীন সামন্ত নেতৃত্ব জুম্ম জাতীয় বিকাশ কখনো এগোতে দেয় নি। তারা ছিল রক্ষণশীল, আপোসমুখী ও পরনির্ভরশীল।

দীর্ঘদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় জুম্ম জাতি তাদের অতীত লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস ভুলে গিয়ে অধীনতার মনস্তত্ত্ব সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে যায়। ফলে জাতীয় জীবন হয়ে পড়ে আন্দোলন বিমুখ ও স্থবির। রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল ও অগণতান্ত্রিক সামন্ত ব্যবস্থা জুম্ম জাতীয় জীবনকে করে অবরুদ্ধ। পার্বত্যাঞ্চল শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সামগ্রিক ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চল থেকে পিছিয়ে পড়ে যায়। ফলে এখানে জুম্মদের স্বার্থ রক্ষা করার মতো প্রতিনিধিত্বশীল কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে নি। যেটুকু ছিল তা ছিল সামন্ত নেতৃত্বের প্রতিনিধিত্বশীল, আপোসী ও শাসকগোষ্ঠীর লেজুড়। তৎকালীন সামন্ত নেতৃত্বের ব্যক্তি স্বার্থের কাছে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের কোন মূল্য ছিল না। এমনি এক বাস্তবতায় জুম্ম জাতীয় জীবন তখন গভীর থেকে গভীরতর সংকটে ধাবিত হতে থাকে।

মানব সমাজ পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন কখনো তাৎক্ষণিক আর কখনো ধীর গতির। ধীর গতির পরিবর্তন হয় শতসহস্রাব্দী বছর ধরে বা তারও বেশি সময় ধরে। আর তাৎক্ষণিক বা দ্রুত পরিবর্তন হয় তাৎক্ষণিক বা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যা সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুন এক ব্যবস্থার রূপান্তর। পরিবর্তন মানে নতুন, এই পরিবর্তন কখনো সামগ্রিক বা কখনো আংশিক হতে পারে। অর্থাৎ সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন বা সমাজের প্রচলিত চিন্তা-ধারার পরিবর্তন হতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি তার দর্শন ও চিন্তা-চেতনা দিয়ে সমাজের পরিবর্তন সূচনা করে এবং প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় তখনই সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক বা আংশিক পরিবর্তন হতে শুরু করে। তার প্রভাবে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ প্রভাবিত হয় এবং সমাজের ঘুমন্ত মানুষ জাগ্রত হয়, খুঁজে পায় তার আপন জাতীয়সত্তাকে। এভাবে সমাজ এগিয়ে যায় প্রগতিশীলতার পথে। তার অগ্রচেতনায় পথহারা জাতি খুঁজে পায় পথ নির্দেশনা। এ জন্য সেই ব্যক্তি সমাজের মানুষের কাছে পরিচিতি পায় অগ্রপথিক, অগ্রদূত, অগ্রনায়ক ইত্যাদি নামে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতির ইতিহাসে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা হলো সেই অগ্রপথিক, তিনি মানব সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল দর্শন নিয়ে জুম্ম সমাজে আবির্ভূত হয়েছেন যে দর্শনের অগ্নিস্পর্শে সমগ্র জুম্ম জাতি জাগরিত হয় এবং খুঁজে পায় সঠিক পথ নির্দেশ। দীর্ঘ উপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক নির্মম শাসন-শোষণ, বঞ্চনার ফলে জুম্ম জাতীয় জীবন যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ধাবিত হচ্ছিল তখন এম এন লারমা জাগরনির অগ্নিমন্ত্র শুনিয়ে ঘুমন্ত জুম্ম জাতির ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। দাবানলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে পার্বত্য জনপদ। তিনি জাগরনির অগ্নি মশাল হাতে পরিভ্রমণ করেছিলেন জুম্ম জাতির প্রতিটি লোকালয়ে। তাঁর আগমনে সমগ্র জুম্ম জাতি পায় এক নতুন দিনের আশার বাণী ও লড়াই-সংগ্রামের প্রেরণা। তিনিই প্রথম জুম্ম জাতির প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারক-বাহক।

জুম্ম সমাজের অগ্রযাত্রায় অন্যতম অন্তরায় হল তৎকালীন ঘুণেধরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। চরম প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এম এন লারমা ছিল সদা সোচ্চার ও প্রতিবাদী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সামন্ত ব্যবস্থা কখনো জুম্ম জাতীয় বিকাশকে

এগোতে দেবে না। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘুঁণেধরা সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর এই আন্দোলনের ফলে জুম্ম সমাজের মধ্যে সামন্ত ব্যবস্থার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং সমাজের মধ্যে জুম্ম জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। তৎকালীন সামন্ত ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা বিকাশে তাঁর অবদান ছিল অদ্বিতীয়।

শিক্ষা হলো কোন জাতির এগিয়ে যাওয়া বা বিকাশের প্রধান মানদন্ড ও মেরুদন্ড। বিশ্বে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি বিকাশমান ও প্রগতিশীল। মানব সভ্যতা আধুনিক শিক্ষা তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজ ছিল তখন শিক্ষাহীন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। চরম রক্ষণশীল সামন্ত ব্যবস্থা শিক্ষার বিস্তারকে রেখেছিল পুরোপুরি অবরুদ্ধ। ফলে জুম্ম জাতীয় জীবন হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ ও স্থবির। জুম্ম সমাজের মধ্যে এম এন লারমা প্রথম অনুধাবন করেছিলেন শিক্ষা বিস্তার ছাড়া ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে অধিকার সচেতন করা যাবে না। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নতুন মাত্রায় শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি তৎকালীন ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করেন এবং তাদের জুম্ম সমাজের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা ও শিক্ষা প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিক্ষার প্রচারাভিযানে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শিক্ষকতার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকতার আড়ালে অধিকারহারা জুম্ম জনগণকে অধিকার সচেতন করা ও তাদের সুসংগঠিত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন, একজন শিক্ষিত মানুষ অতি সহজে তার অধিকারগুলো চিনতে পারে এবং নির্যাতন-নিপীড়ন, শোষণ-শাসনের ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সঠিক পথ ও মত খুঁজে নিতে পারে। তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে জাগ্রত করতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প হতে পারে না। পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে অগ্রগামী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিন্ন ভাষাভাষী জুম চাষী জুম্ম জাতির জনপদ। তারা স্মরণাতীত কাল থেকে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে বসবাস করে আসছে। কিন্তু কালের পথ পরিক্রমায় দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন-শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন ও বঞ্চনায় তাদের জীবন বিধ্বস্ত ও প্রায় অবলুপ্ত। তাই ভিন্ন ভাষাভাষী জুম চাষী জাতিদের একটি জাতীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করা ছিল একটি ঐতিহাসিক দাবি। এম এন লারমা প্রথম জাতীয় চেতনার এই ঐতিহাসিক দাবিটির বাস্তব রূপায়ণ করেন। তিনিই প্রথম জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও ধারক-বাহক। পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসিত-শোষিত, অবহেলিত-বঞ্চিত ও নির্যাতিত-নিপীড়িত ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিকে জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জুম্ম জাতীয়তাবাদ জুম্ম জাতীয় ঐক্য-সংহতি ও লড়াই-সংগ্রামের প্রতীক। উগ্র-ধর্মান্ধ, জাত্যাভিমানী, আগ্রাসী, অগণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী ও চরম প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামে জন্য জুম্ম জাতীয়তাবাদই জুম্ম জাতির প্রধান হাতিয়ার। জুম্ম জাতীয়তাবাদ হলো জুম্ম জাতির ঐক্যবদ্ধ শক্তি।

মহান বিপ্লবী, জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও জুম্ম জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অগ্রপথিক হলো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, আদর্শবান, নির্ভীক ও আপোসহীন। তিনি জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকার আন্দোলনের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা। ছাত্রাবস্থায় থেকে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। ১৯৫৭ সালে ছাত্র সম্মেলনে তার বলিষ্ট নেতৃত্ব ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ছিল ইতিহাসের এক অনন্য সাক্ষী। জুম্ম জাতির উপর দীর্ঘ দিনের বিজাতীয় শাসন-শোষণ, নিপীড়ন ও আগ্রাসনের চিত্র তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং তা উত্তরণ ও প্রতিকারের মানসে তাঁর জীবন উৎসর্গ করে যান। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরবর্তী উগ্র বাঙালি জাত্যাভিমান কর্তৃক জুম্মদের অধিকার-স্বাধিকার উপেক্ষিত হলে তাঁর নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ সাংগঠনিক ও রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)। এই সংগঠন জুম্ম জনগণের একমাত্র ও প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি অতিদ্রুত একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। তিনি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার হারা জুম্ম জনগণের কথা বলেন নি, বলেছেন সমগ্র বাংলাদেশের অধিকার হারা মানুষের কথা, খেটেখাওয়া শ্রমিক, মাঝি-মাল্লা, তাঁতি, নিষিদ্ধ পল্লীর দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহকারী মা-বোনদের কথা। তিনি ছিলেন সকল প্রকার শোষণ-বঞ্চনার বিরোধী। অধিকার আন্দোলনের সকল নিয়মতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ হয়ে তাঁরই নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এম এন লারমার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জুম্ম জনগণ ইস্পাত কঠিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর আদর্শে বলিয়ান শান্তিবাহিনী গেরিলারা একের পর এক যুদ্ধে পর্যদুস্ত করে সেনাবাহিনীকে। এম এন লারমার কথা, শান্তিবাহিনীর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে শাসকগোষ্ঠীও ষড়যন্ত্রের বীজ বুনতে থাকে। সেই ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-পলাশ-দেবেন চক্র ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামকে ধ্বংস করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। সেদিন ঘাতক-দালাল-মীরজাফরেরা আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করতে পারলেও তাঁর আদর্শ ও চিন্তা-চেতনাকে তারা হত্যা করতে পারে নি। তাঁর আদর্শ ও চেতনা দাবানলের মতো আরও বলিয়ান হয়ে অতিদ্রুত ধ্বংস করে দেয় বিভেদপন্থাকে।

তরুণ প্রজন্মই যেকোন লড়াই-সংগ্রামের নির্ণায়ক শক্তি। তারাই সমাজকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তরুণ মানে নবীন, নতুনত্বের পূজারী, তারা অতি সহজে সমাজের প্রগতিশীলতাকে গ্রহণ করতে পারে। তাদের রক্ত তাজা-টগবগে, তারা চির বিদ্রোহী, কখনো অন্যায়ে কাছে মাথা নত করে না। শাসকগোষ্ঠীর দমন-নিপীড়ন ও ঘুনেধরা রক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম তরুণ সমাজ ছিল নিস্তেজ, নির্বিকার ও অবদমিত। জুম্ম জাতির সেই ক্রান্তিলগ্নে এম এন লারমা প্রথম তরুণ প্রজন্মকে প্রগতিশীল

দর্শনে দীক্ষিত করেন। তাঁরই আদর্শে জুম্ম তরুণ প্রজন্ম জেগে উঠে এবং খুঁজে পায় তার আপন শক্তির মহিমা। তারা হয়ে উঠে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী। এম এন লারমার নেতৃত্বে তারা জুম্ম জাতির ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। তারা গ্রামের পর গ্রাম, পাহাড়-পর্বতসহ প্রতিটি জুম্ম জনপদে ছড়িয়ে দেয় এম এন লারমার চেতনা। তরুণেরাই হয়ে উঠে সমগ্র জুম্ম জাতির চালিকাশক্তি। শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তারা এগিয়ে যায় ইস্পাত কঠিন সংগ্রামে। তরুণেরা অস্ত্র কাঁধে তুলে নিয়ে শাসকগোষ্ঠীকে জানান দেয় জুম্ম জাতি অধিকার চিনেছে, শিখেছে অধিকার ছিনিয়ে নিতে। স্ফুলিঙ্গ যেমন দাবানলে পরিণত হয় তেমনি এম এন লারমার আদর্শ ও চিন্তা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দাউদাউ জ্বলে উঠেছে।

দীর্ঘ চব্বিশ বছরের অধিক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন না হওয়া জুম্ম জনগণের অধিকার এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী আদিবাসী জুম্মদের জাতিগত নির্মূলীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার করার জন্য নিত্যনতুন পলিসি ও ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। শাসকগোষ্ঠী ইউপিডিএফ ও তথাকথিত সংস্কারপন্থীসহ কয়েকটি বি-টিম সৃষ্টি করে চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৩ বছরের ইতিহাসে বরাবরই একটি বিষয় লক্ষণীয়, গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক কোন সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নি এবং তাদের ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। তাই জুম্ম জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকবে কি থাকবে না- এই প্রশ্নের উত্তর তরুণ সমাজকে খুঁজে পাওয়া অতীব জরুরী। মহান নেতা এম এন লারমা বলে গিয়েছেন, 'যে জাতি সংগ্রামী সে জাতিকে কখনো ধ্বংস করা যায় না'। ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষ স্বদেশ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রবল-পরাক্রমশালী আগ্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিতাড়িত করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বশাসন। জুম্ম জাতিও এম এন লারমার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ২৪ বছর সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে বাধ্য করেছে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে। অধিকার ছাড়া কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। তাই জুম্ম জাতির অধিকারের প্রশ্নে তরুণ প্রজন্ম নতুন করে ভাবতে হবে। অর্থাৎ লড়াই-সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই। "যৌবন যার যুদ্ধে যাবার সময় তার-" তরুণেরাই শোনাতে পারে জুম্ম জাতিকে সত্যিকারের আশার বাণী। মহান নেতা এম এন লারমার চেতনাকে ধারণ করে তরুণ প্রজন্মকে চুক্তি বিরোধী সকল অপশক্তিকে প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে প্রগতিশীল চেতনায় জুম্ম জাতীয় ঐক্য। এম এন লারমার আদর্শ ও চেতনাই একমাত্র দেখাতে পারে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সঠিক পথ।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগ যুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

জুম্ম নারী আন্দোলনে এম এন লারমার অবদান ও আদিবাসী নারীদের বর্তমান অবস্থা

জড়িতা চাকমা

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা একটি সুপরিচিত নাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে তিনি ছাত্রনেতা, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংসদ ও একজন অবিসংবাদিত বিপ্লবী নেতা হিসেবে আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট, শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর এম এন লারমা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন ত্যাগ করে আত্মগোপন করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনের হাল ধরেন। আত্মগোপনের পর পার্টি কর্মীদের কাছে তিনি 'প্রবাহন' নামেই পরিচিত হন। ব্রিটিশ-ভারতে তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার নান্যাচর থানাধীন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম মহাপুরম (বর্তমানে কাপ্তাই হ্রদে জলমগ্ন)। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে এই মহাপুরম-এর এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও সংস্কৃতিবান শিক্ষক পরিবারে এম এন লারমার জন্ম। বাবা চিত্তকিশোর চাকমা মহাপুরম জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সমাজ সংস্কারক। যিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি অকণ্ঠ সামন্তবাদে নিমজ্জিত ও পশ্চাৎপদ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে সংস্কারের কাজে হাত দেন। মাতা শুভাষিনী দেওয়ান ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিনী। যার তত্ত্বাবধানে খেয়ে-পরে সারাটি বছর তাদের বাড়িতে থাকতো অধ্যায়নরত একাধিক ছাত্র। মা-বাবার চার সন্তানের মধ্যে এম এন লারমা (মঞ্জু) ছিলেন তৃতীয়। তার বড় দিদি জ্যোতিপ্রভা (মিনু) বলতেন, শৈশবকাল থেকেই মঞ্জু ছিলেন নিরিবিলিপ্রিয় ও বইপোকা। ছাত্র জীবন থেকেই সত্যবাদী, মিতব্যয়ী, স্বল্পভাষী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। বাড়িতে বাবার তত্ত্বাবধানেই তিনি প্রাইমারী শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন। রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরতাবস্থায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। মানবতাবাদ ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাই তাঁর জীবন দর্শন। তাঁর এই গুণাবলীই রাজনৈতিক জীবনে তাঁকে মহান নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। তিনি ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর, চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে নিহত হন। ১০ নভেম্বর ২০১৪ খ্রী:। মহান নেতা এম এন লারমার ৩১তম মৃত্যু দিবস। এ দিবসে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও মহান নেতার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি বিশেষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ৪ দফা ভিত্তিক আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের নিকট পেশ করেছিলেন। যা তৎকালীন শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। বাঁধ দিয়ে নদীর গতি পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু গতিরোধ করে রাখা যায় না। তেমনি একটি জাতিকে নিপীড়ন-নির্যাতন করা যায় কিন্তু চিরদিন দমিয়ে রাখা যায়না। তাই যুগ যুগ ধরে শাসিত-শোষিত হবার গ্লানি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতিকে দৃঢ় করেছিল। ফলশ্রুতিতে এম এন লারমার নেতৃত্বে এক বিশেষ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছিল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন। '৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে এই আন্দোলনকে এক করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আর পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করা। এখানেই এম এন লারমার নেতৃত্বের বিচক্ষণতার গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। তিনি আদিবাসী জুম্মদের রাজনৈতিক সমস্যাকে আদিবাসী নারীদের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখেননি। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম সমাজের বিরাট অংশ হচ্ছে নারী। নারী সমাজ অধিকার সচেতন না হলে কোন জাতির পক্ষে অধিকার উপভোগ করা সম্ভব হয়না। এমনকি কোনদিনই কোন বড় আন্দোলনে নারীরা অংশগ্রহণ না করলে তা সফল হয়নি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীদেরও অধিকার সচেতন হয়ে সামনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এম এন লারমা। আদিবাসী জুম্ম নারী সমাজের সচেতন অংশ তাতে সাড়া দেয়। ১৯৭৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি আত্মপ্রকাশ করে এবং '৭৫ সালের ১০ আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির পূর্ণাঙ্গ কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম নারী জাগরণের সূচনা হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৮৯ সালে ৮ মার্চ গঠিত হয় হিল উইমেন্স ফেডারেশন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালে ২০১১ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক। বর্তমানে আদিবাসী নারীদের এই তিনটি সংগঠন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আদিবাসী জুম্ম নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা, নিপীড়ন নির্যাতনের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত করে। গৃহস্থালীর কাজে ব্যয়িত নারীর

মেধা ও শ্রমকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। এইসব সুকৌশলে মোকাবেলা করে শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির পথ চলা। তখন বিশ্বের সর্বত্র নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা অনুভূত হওয়ায় জাতিসংঘ নারীর জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে "নারী বর্ষ" এবং সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে 'নারী দশক' হিসেবে ঘোষণা করে। রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বরে ১৯৭৯ সালের জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয়। তখন নারীর জন্য আন্তর্জাতিক 'বিল অব রাইটস্' বলে চিহ্নিত এই দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদন্ড বলে বিবেচিত। ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত হয়। কতিপয় উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ হচ্ছে- ৩৮.১ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিৎ করা; ধারা ৩৮.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ধারা ৩৮.৩ অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা। এসব নীতি বাস্তবায়নে সরকারের কোন সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়নি। যেমন-পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহের প্রতি সরকারের নেতিবাচক মনোভাব; ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি এবং দেশের সমতল ও পাহড়ের আদিবাসী প্রসঙ্গে সরকারের স্ববিরোধী অবস্থান থেকে তা প্রমাণ করে।

বাংলাদেশ ১৩৬ নং জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র। '৭২ সাল থেকে জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদে অনুস্বাক্ষর ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে আসছে। ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। সেখানে নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। যেমন-(১) নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, (২) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ, (৩) স্বাস্থ্য সেবার অসম সুযোগ, (৪) নারী নির্যাতন, (৫) সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী, (৬) অর্থনৈতিক সম্পর্কে নারীর সীমিত অধিকার, (৭) সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা, (৮) নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, (৯) নারী ধর্ষণের কারণে মানবাধিকার লংঘন, (১০) গণমাধ্যমে নারী নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ, (১১) পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার এবং (১২) কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কার্যকর পদক্ষেপ এখনো বহুদূর। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিশাল অংশ হচ্ছে নারী। নারী উন্নয়ন নীতিই জাতীয় উন্নতির অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। তাই ১৯৯৬ সালের ১৫ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথম বারের মতো নারী উন্নয়ন নীতি, ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত অবহেলিত এদশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। কিন্তু উক্ত নারী উন্নয়ন নীতিতে আদিবাসী নারীদের বিষয়ে কোন কিছুই উল্লেখ ছিল না। দেশের নারী উন্নয়নের সাথে নারীদের নিরাপত্তার কথা জড়িত রয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা অরক্ষিত। দেশের আদিবাসী নারীরা বাঙালি ভূমি বেদখলকারীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীদের অবস্থা হচ্ছে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা হতাশাব্যঞ্জক ও উদ্বেগজনক।

বাংলাদেশের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রাক্কালে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমা নিজ বাড়ী থেকে অপহরণ ও নিখোঁজ হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে দেশে অনেক সরকার রদবদল হয়েছে। কিন্তু অপহরণের ১৭ বছর পরও কল্পনা অপহরণ মামলার কোন কূলকিনারা হয়নি। বরঞ্চ উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণের অভাবের দোহাই দিয়ে মামলা খারিজ করার অপচেষ্টা চলছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত হত-দরিদ্র আদিবাসী নারীরাও সবসময় হুমকির সম্মুখীন। সমতল অঞ্চলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন কোম্পানী এবং রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত অঞ্চলের (ইপিজেড) বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে কর্মরত আদিবাসী নারীরা নানা বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। বিশেষতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারী সেটেলার বাঙালি এলাকায় আদিবাসী জুম্ম নারীরা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়। কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যরতাবস্থায় তাদেরকে অপহরণ, ধর্ষণ এবং খুন করা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এসব মানবিক বিপর্যয়ের হাত থেকে আদিবাসী নারীদের রক্ষার নিরাপত্তা বিধান করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন হচ্ছে দেশে নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের পূর্ব শর্ত। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের সম্মানজনক পুনর্বাসন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালে ৯০ টি দেশের ৪০ কোটি আদিবাসীদের মধ্যে ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ৩০ লক্ষ আদিবাসী বাংলাদেশে রয়েছে। আদিবাসী নারীদের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীদের অবস্থা হচ্ছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশকারী সেটেলার বাঙালি বসতি প্রদান আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা সংকটকে আরো তীব্র করে তুলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী অনুপ্রবেশ আর ভূমি বেদখলের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তার কথা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ভূমি বিরোধ সমস্যা। আর এই ভূমি বিরোধের বলি হয় আদিবাসী জুম্ম নারীরা। শুধু তাই নয়। নারী শিক্ষার হার কম হওয়ায় এবং যথাযথ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় আদিবাসী নারীদের জন্য যে কোন চাকরীর সুযোগ লাভ করা হচ্ছে সোনার হরিণ হাতে পাওয়ার মতো। কৃষি কাজের মধ্যেই অধিকাংশ আদিবাসী জুম্ম নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন সীমাবদ্ধ। তাই ভূমি আর আদিবাসী নারী জীবন এক সঙ্গে গাঁথা। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারী সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ সামন্ততান্ত্রিক ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হওয়ায় আদিবাসী নারীরা একদিকে সামন্তবাদ এবং পুরুষতান্ত্রিক শাসন-শোষণে জর্জরিত; অন্যদিকে বৃহত্তর বাঙালি শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসনের শিকার। এই আগ্রাসন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যেমনি আদিবাসী জুম্ম সমাজকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তেমনি আদিবাসী নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে চরম অনিশ্চিৎ করে তুলছে। এমতাবস্থায় আদিবাসী নারীদের ক্ষমতায়নের কথা চিন্তা করাও কঠিন। সামন্ত ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আদিবাসী নারীদের জীবন গৃহকোণে বন্দী। দিনের অধিকাংশ সময় পুরুষের অনুপস্থিতিতে পরিবারে সবাইয়ের জন্য খাবার প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে কোলে-পিঠে করে সন্তান লালন-পালন করা, সমাজ রক্ষা করা এবং গোবাদি পশু দেখাশুনাসহ বাড়ির সব দায়িত্ব নারীদের উপর বেশি বর্তায়। এমতাবস্থায় জুম্ম নারীরা ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। এভাবে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সেটেলার বাঙালি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আদিবাসী নারীদের জীবনাশঙ্কাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদিবাসী জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে গমনাগমনের নিরাপদ পরিবেশও ক্ষুন্ন হয়েছে। এখন মাঠে-ঘাটে, স্কুল-কলেজে, হাট-বাজারে এবং অফিস-আদালতে কোথাও আদিবাসী নারীরা নিজেদের নিরাপদ বোধ করে না। অপহরণ, ধর্ষণ এবং খুনের আতঙ্কে কাটছে আদিবাসী নারীদের জীবন।

'৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালে এই পরিস্থিতি উন্নয়নের আশা করা হয়েছিল। কিন্তু চুক্তির ১৭ বছরেও চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পরিস্থিতির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। চুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির যা যা করণীয় তার সবকিছুই সম্পন্ন করেছে। কিন্তু চুক্তির অন্য পক্ষ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন করেনি। আজ পর্যন্ত পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হয়না। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম মূল সমস্যা হচ্ছে ভূমি সমস্যা। এই ভূমি সমস্যা থেকে জুম্ম নারী ধর্ষণ, অপহরণ ও খুনের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের যতো সব অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। যা পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আদিবাসী জুম্ম নারীদের নিরাপদ জীবন সুদূর পরাহত।

দেশের সর্বত্র এখনো আদিবাসী নারীদের অনুকূল কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠতে পারেনি। তার কারণ হচ্ছে প্রথমত আদিবাসী নারীরা কঠোর প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারে না। দ্বিতীয়ত আদিবাসী হওয়ায় বৈষম্য ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তাদের মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হয়না। তৃতীয়ত রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী অধিকার স্বীকৃত হলেও জাতীয় এবং সামাজিক পর্যায়ে তা এখনো কার্যকর হয়নি। সমাজে এখনো লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান। পরিবারে একটা পুত্র শিশুর জন্ম যে পরিমাণ আনন্দ দিতে পারে একটা কন্যা শিশুর জন্ম তা পারেনা। এটা হচ্ছে নারীর প্রতি সামাজিক মূল্যবোধের নেতিবাচক প্রতিফলন। এই প্রতিফলন আদিবাসী সমাজ অগ্রগতির পিছুটান স্বরূপ। শুধুমাত্র স্ত্রী থেকেই কাঙ্খিত সন্তান দাবি করা হয়। নারী অধিকারকে যে সব মহান ব্যক্তিরা স্বীকৃতি দিয়েছেন তারা বলেছেন যে- "পৃথিবীর যা কিছু মহা কল্যাণকর অর্ধেক তার করেছে নারী, অর্ধেক তার নর।" তাহলে কাঙ্খিত সন্তান জন্মদানের দায়ভার একাই স্ত্রীকে বহন করতে হবে কেন? এই অমানবিক নির্যাতন থেকে নারীমুক্তি ব্যতিরেকে কোনদিন সমাজে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। উপরন্তু আদিবাসী সমাজ যেমনি বিজাতীয় শাসন-শোষন ও নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীরা আরো বেশি নিপীড়নের শিকার। তবুও আদিবাসী জুম্মদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে আদিবাসী নারীদের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং প্রশংসনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিদশকাধিক কালের আন্দোলনের ইতিহাসে তা প্রতীয়মান।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দেশের খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের কথা, নিষিদ্ধ পল্লীতে বসবাসকারী দেহপসারিনীদের কথা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির জন্য দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের বিষয়টা এখনো খুবই হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা সর্বমোট ৩৪৫ টি। ৩০০ টি আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবশিষ্ট ৪৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। যেগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নিয়মানুযায়ী ভাগাভাগি হয়ে থাকে। কিন্তু দশম জাতীয় সংসদের ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের মধ্যে কোন আদিবাসী নারী সাংসদ দেয়া হয়নি। নারী সাংসদের আসনও সংরক্ষিত রাখা হয়নি। সবকটি আসনে বাঙালি বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠী থেকে সংরক্ষিত নারী সাংসদ নেয়া হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদে ৩০০ টি আসনে সরাসরি নির্বাচনে ১৯ জন মহিলা সাংসদ এবং সংরক্ষিত আসনে ৪৫ জন মহিলা সাংসদ ছিল। তাদের মধ্যে পার্বত্যাঞ্চলে তিন পার্বত্য জেলায় কোন সংরক্ষিত মহিলা আসন কিংবা সংরক্ষিত আদিবাসী মহিলা সাংসদ ছিলনা। ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা থেকে একজন বাঙালি নারীকে সংরক্ষিত মহিলা আসনে মনোনীত করা হয়েছে। সে আসনে আদিবাসী নারী থেকে নির্বাচনের জন্য অনেক তদবির করেও আদিবাসী নারী প্রার্থী দেয়া হয়নি। অথচ একাধিক আদিবাসী নারী প্রার্থী (আওয়ামী লীগ) ছিল। কিন্তু আদিবাসী নারী হওয়াতে আওয়ামী লীগ দলভুক্ত সদস্য হলেও তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যা শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীরই নামান্তর। এম এন লারমা সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে দেশের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে আহ্বান রেখেছিলেন। সংসদে দাঁড়িয়ে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে নারীকেও সে অধিকার দেবার আহ্বান রেখেছিলেন। নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপ সাধনে এম এন লারমার চিন্তা আদিবাসী নারী মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

বন্দুকভাঙ্গার কৃতি সন্তান শহীদ বনমালী চাকমা (মানস)

সত্যবীর দেওয়ান

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার অন্তর্গত ৫৯ নং বন্দুকভাঙ্গা মৌজার মাচ্যাপাড়া গ্রামে বনমালী চাকমার জন্ম ১৯৫০ সনে। চারিহং ভ্যালীর মধ্যভাগে এই গ্রাম অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, পাহাড় পরিবেষ্টিত। বনমালী চাকমা পিতামাতার ২য় সন্তান। তার বাবা দীর্বমুনি চাকমা প্রেসিডেন্ট আয়ুব আমলের ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হিসেবে জনসেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। মাতা ইন্দ্রভানু চাকমা গৃহিনী হিসেবে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এবং অমায়িক ছিলেন। তাঁর বড়ভাই পদ্মজয় চাকমা নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে অনেক আগে থেকেই আলাদা জীবন-যাপন করেন। ছোটভাই চন্দ্র বিকাশ চাকমা (প্রকাশ ভাগ্যচন্দ্র) ১৯৭৪ সনে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ছিলেন। একবোন পদ্মানন্দী চাকমা স্বামী-সংসার নিয়ে এই গ্রামে বসবাস করছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারেরই সন্তান বনমালী চাকমা এসএসসি পাশ করেন রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৬৮ সনে। এইচএসসি (বিজ্ঞান বিভাগে) ১৯৭০ সনে রাঙ্গুনিয়ার কানুংগোপাড়া কলেজ থেকে ২য় বিভাগে পাশ করেন।

অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী এই মানুষটি আরও উচ্চ শিক্ষায় না গিয়ে গ্রামের যুবসমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালানোর অদম্য মানসিকতা নিয়ে ক্ষারিক্ষ্যং বেসরকারি জুনিয়র স্কুল স্থাপনের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে ঐ এলাকার একটিমাত্র জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষক সংগ্রহ করা হয়। তাঁর অকান্ত প্রচেষ্টায় ঐ জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন বাবু বিচিত্র বিজয় চাকমা, সহকারী শিক্ষক হিসেবে শশী রঞ্জন চাকমা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। আমি ১৯৭২ ইংরেজীতে এইচএসসি পাশের পর ঐ ক্ষারিক্ষ্যং জুনিয়র হাই স্কুলে অনারেরি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। সমগ্র বন্দুকভাঙ্গার প্রতিটি পাড়ায় ছাত্র সংগ্রহ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে সভা-সমাবেশ করি। বলাবাহুল্য এসব উদ্যোগের ক্ষেত্রে বনমালী বাবুই হচ্ছেন অগ্রণী ভূমিকায়। সকল শিক্ষকই অবশ্য অনারেরি। প্রধান শিক্ষককে সম্মানী বাবদ ২৫০ টাকা, আর অন্যদের দেয়া হতো ১৫০ টাকা করে। প্রত্যেকের জন্য লজিং-এ খাওয়া-দাওয়া ছিল ফ্রি। বিশেষত ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম সে সময়ের তরুণ সমাজকে জুম্ম জাতির জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনায় নাড়া দেয়। সেই কারণেই মূলত শিক্ষার আলো প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। অবশেষে ক্ষারিক্ষ্যং জুনিয়ার হাই স্কুল ১৯৭৫ সালে সরকারি ভাতাভুক্ত হয়। পরবর্তীতে সেই জুনিয়র স্কুল ক্ষারিক্ষ্যং হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়।

শুধু একটি স্কুলে এলাকার জনগণ সন্তুষ্টি না হয়ে অতিরিক্ত দুইটি হাই স্কুল গড়ে তোলেন। আর মাচ্যাপাড়া গ্রামের জনগণকে সংগঠিত করে বনমালীবাবু সামাজিক বনায়ন করেন। আর ঐ বনায়নের জন্য ফান্ড গড়ে তোলেন। ঐ ফান্ড দিয়েই পরবর্তী প্রজন্ম মাইচ্যাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে তুলে। এ দৃষ্টান্ত থেকেই বর্তমানে মূল বন্দুকভাঙ্গা গ্রামে আরও একটি উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে উঠে এবং সরকারী এমপিওভুক্ত হয়। যার নাম বন্দুকভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়। তাই শুধু ঐ বন্দুকভাঙ্গা মৌজায় বর্তমানে তিনটি হাইস্কুল পরিচালিত হচ্ছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্য কোথাও নেই। বলতে গেলে আমাদের ছাত্ররাই ঐ স্কুলগুলিতে শিক্ষকতা করছে।

বনমালী চাকমা শুধু স্কুল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি। তিনি জাতীয় বৃহত্তর আন্দোলনে ১৯৭৬ সালে যোগ দেন। প্রথমে সুবলং-বরকল নিয়ে এসবি জোনের কম্যান্ডার হিসেবে যোগদান করেন তিনি। পরবর্তীতে আমার সাথে তাঁর কর্মস্থল পৃথক হয়ে যায়। অবশ্য তার আগে আমি ১৯৭৫ সনে জাতীয় আন্দোলনে সরাসরি যোগদান করি। কম্যান্ড পোষ্ট-বি এলাকার বিভিন্ন জোনে ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে মাইনী মিশনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ সনে জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়। ঐ সম্মেলনে বনমালীকে বিভেদপন্থীরা যোগদান করতে দেয়নি, কৌশলে সরিয়ে রাখে। পরবর্তী ১৯৮২ সালে সম্মেলনে যখন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে এম এন লারমার জয় হয়, তখন বিভেদপন্থীরা আর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দলীয় নেতৃত্ব দখলের সাহস করেনি। ঐ সময়ে সম্মেলন শেষে প্রত্যেকে আমরা তৎকালীন ১ নং ও ২ নং সেক্টরের প্রতিনিধিদলটি কর্মস্থলে চলে আসি। এরপর থেকেই বনমালীবাবুর সাথে আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি।

পরবর্তীতে ১৯৮৩ সনে ১০ নভেম্বর তারিখে বিভেদপন্থীরা জাতীয় জীবনের কালো অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। সেদিন বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীরা এক অতর্কিত সশস্ত্র হামলায় ৮ জন সহযোদ্ধাসহ এম এন লারমাকে হত্যা করে। শুরু হয় ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ। সেদিন হারালাম মহান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মহামতি এম এন লারমাকে এবং অনেক বীর যোদ্ধাকে।

এম এন লারমারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ বনমালী চাকমা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের প্রতি তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু গৃহযুদ্ধের প্রারম্ভে বিভেদপন্থীদের ষড়যন্ত্রের ফলে অসুস্থ অবস্থায় ও পানছড়ি এলাকায় আমাদেরই এক কর্মী পরিবারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯৮৩ সালে খুব সম্ভব সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক অভিযানে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে বন্দী করা হলেও নির্যাতনের মাধ্যমে কোন প্রকার দলীয় গোপন তথ্য সরকারী বাহিনী সংগ্রহ করতে পারেনি। তাঁকে সরাসরি রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার হয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার, পরে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারগারে স্থানান্তর করা হয়। ঐ কুমিল্লা কারাগারেই ১৯৮৫ সনের ২৭ আগস্ট আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কারাগারে মৃত্যু সত্যিই হৃদয় বিদারক। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাঁর এই অকাল মৃত্যু আমাদের আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। যদি তিনি এখনও জীবিত থাকতেন আমার বিশ্বাস তিনি অনেক উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। শহীদ বনমালী চাকমা (মানস)র স্ত্রী নিহারিকা চাকমা অতীব কঠিন বাস্তবতার সাথে মোকাবিলা করে তাঁর একপুত্র নবদিগন্ত চাকমা (প্রকাশ সুপন) ও কন্যা খুচিক্যা চাকমার লেখাপড়ার ব্যয় বহন করে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি থানা পরিবার কল্যাণ বিভাগে স্বাস্থ্য সহকারী চাকরীতে রয়েছেন। থাকেন কল্যাণপুরে পুত্র-কন্যাকে নিয়ে। পুত্র নবদিগন্ত চাকমা এমএ পাশ করে কোন এক এনজিও-তে চাকরীতে রয়েছেন। মেয়ে খুচিক্যা চাকমা গত ২০১৩ সনে এসএসসি পাশ করে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত রয়েছেন।

আজ বনমালী চাকমা আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর অমর কীর্তি বন্দুকভাঙ্গার জুম্ম জনগণের শিক্ষার বিস্তারের অবদান সকলকে অনুপ্রাণিত করে। যেখানে মাত্র ৫টি প্রাইমারী স্কুল ছিল পাকিস্তান আমলে, সেই একটি মৌজায় আজ তিনটি হাই স্কুল গড়ে উঠেছে। এতে শহীদ বনমালী চাকমার অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে বন্দুকভাঙ্গা এলাকার জনগণের মাঝে তিনি কাজের মাধ্যমে অমর হয়ে রয়েছেন। আর জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে তাঁর বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন এবং থাকবেন। তাঁর মত এরূপ ত্যাগী শিক্ষানুরাগী এমন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মী অত্যন্ত বিরল। বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলন জোরদার করতে গেলে তাঁর মত ত্যাগী, নিবেদিত প্রাণ, আদর্শে বলিয়ান এমন শিক্ষিত তরুণদের এগিয়ে আসা একান্ত জরুরী। কথায় বলে "এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার সময় তার"। তাই আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এরূপ অকুতোভয়, কঠোর পরিশ্রমী এবং রাজনৈতিক সচেতন তরুণদের এগিয়ে আসা অতীব জরুরী। শুধু ১০ই নভেম্বর আনুষ্ঠানিক পালন করা এম এন লারমার আদর্শ নয়, তাঁর আদর্শিত পথ অনুসরণ করে, কঠোর বিপ্লবী জীবন গ্রহণ করে, দলীয় নেতৃত্বকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নিজেকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শে সুসজ্জিত করে, চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামকে আরও জোরদার করার জন্য এগিয়ে যাওয়া বর্তমান তরুণ সমাজের করণীয় কর্তব্য।

প্রীতিষ বাবুর আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি

ধীর কুমার চাকমা ও ঝর্ণা চাকমা

আসল নাম শশাঙ্ক মিত্র চাকমা। পার্টিতে প্রীতিষ বাবু নামে পরিচিত। জন্ম ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ সালে। পুরোন রাঙ্গামাটির নিকটস্থ জর্নাল নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা মদন মোহন চাকমা মধ্যবিত্ত কৃষক আর মাতা লালপুদি চাকমা ছিলেন সাধারণ গৃহিনী। তিনি বাবা-মা'র অষ্টম সন্তান। আট ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ বলে বাড়িতে তাঁকে সবাই আদর করে 'চিত্তিবো' ডাকতো। শৈশবে পড়ালেখা করেছিলেন বাঘাইছড়ি উপজেলার খেদারমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাইমারী শেষ করে তিনটিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় এম এন লারমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রীতিষ বাবু সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাঁর এই সরল প্রকৃতি তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। রূপায়ণ দেওয়ান-সুধাসিন্দু খীসা-তাতিন্দ্র লাল চাকমা সংস্কারপন্থী কুচক্রীদের লেলিয়ে দেয়া ঘাতকের আক্রমণের শিকার হয়ে ২০১৩ সালের ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ভোরে নিহত হন। সঙ্গে তাঁর দুই সহযোদ্ধা নন্দ কুমার চাকমা এবং যুধিষ্ঠির চাকমাও নিহত হয়েছিলেন। সকালে সূর্যোদয়ের প্রথম আভা ফোটার মূহুর্তে তিনি যখন নিহত হলেন তখন সমস্ত বাঘাইছড়ি শোকে মুহ্যমান হয়েছিলো। সেদিন ভোর রাতে জরুরী কাজ আছে-এই মর্মে পরিচিত কণ্ঠে কে একজন তাঁকে ফোন করেছিল। তাই সেদিন অতি প্রত্যুষে উঠে সরল বিশ্বাসে তিনি সিজক কলেজ সংলগ্ন দোকানের পথ ঘেষে আসছিলেন। দোকানের কাছে পৌছলে আগে থেকে ওৎপেতে থাকা রূপায়ণ-সুধাসিন্দু-তাতিন্দ্র-এর সন্ত্রাসীরা তাঁকে মাথায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলি করে। উপর্যুপরি গুলিতে নাক মুখ ঝাঝড়া হয়ে যায়। তিনি যে প্রীতিষ বাবু তাও চেনার কোন সুযোগ ছিলনা। তিনি ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। তাঁর সঙ্গে প্রাণ হারান চুক্তির আওতাধীনে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির সদস্য নন্দ কুমার চাকমা এবং পার্টির সক্রিয় সমর্থক যুতিষ্ঠির চাকমা। তাদের মরদেহ ঐ দিনই রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐদিন রাতের মধ্যে পোষ্টমর্টেমের কাজ সম্পন্ন করা হয়। পরদিন ২২ নভেম্বর ২০১৩ শুক্রবার তাদের মরদেহ বাঘাইছড়ির নিজ গ্রামে ফেরৎ পাঠানোর উদ্দেশ্যে হাসপাতাল হতে ট্রাকযোগে শিল্পকলা একাডেমী ঘাটে বোটে তোলার জন্য নিয়ে আসা হয়। সূর্যোদয়ের আগে সেখানে পার্টি এবং অঙ্গ সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ তাদের শেষ বিদায় জানানোর জন্য উপস্থিত হয়।

হাসপাতাল থেকে মরদেহ শিল্পকলা একাডেমীতে পৌছানোর পর তিনটা মৃতদেহকে দলীয় পতাকা দিয়ে মোড়ানো হয়। তার আগে ঘাতকের বুলেটে ঝাঝড়া মুখমন্ডল শেষ বারের মতো আরেকবার সবাই এক পলক দেখে নেয়। তারপর পার্টির ও অঙ্গ সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। শহীদদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর পার্টির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার শহীদদের শেষ বিদায় জানাতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এর পর পরই নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে তাদেরকে কাস্ট্রি বোটে তুলে দেয়া হয়।

সংস্কারপন্থীদের নাশকতামূলক হামলায় প্রীতিষ বাবু সহ মোট তিনজন বীর দেশপ্রেমিককে আমরা হারিয়েছিলাম। যাদের অভাব আর কোনদিন পূরণ হবার নয়। বাঘাইছড়িবাসী ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাতন তালুকদারকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছে। বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাচনেও জনসংহতি সমিতির সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বড় ঋষি চাকমাকেও বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছিল। বলা যায়, জাতীয় সংসদ ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থীদের জয় এবং পক্ষান্তরে সংস্কারপন্থী প্রার্থীদের ভরাডুবি (প্রত্যাখ্যানের) মধ্য দিয়ে বাঘাইছড়িবাসী প্রীতিষ বাবুকে নৃশংসভাবে হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। ভোটের মাধ্যমে এই প্রতিশোধ নেয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, জনগণই শক্তির মূল উৎস। জনগণ যখন যা চায় তখন তা শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। স্বয়ংক্রিয় গুলির আঘাতে প্রীতিষ বাবুকে খুনীরা নৃশংসভাবে খুন করতে পারলেও প্রীতিষ বাবুর গড়া ইস্পাতকঠিন ঐক্য ও সংগঠন ভেঙ্গে দিতে পারেনি। পারেনি জনমন থেকে তার জনপ্রিয়তাকে মুছে দিতে। সন্ত্রাস জনমনে ভীতির সঞ্চার করতে পারে কিন্তু জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনা। ব্যালটের মাধ্যমে বাঘাইছড়ির জুম্ম জনগণ প্রীতিষের খুনীদের সেশিক্ষাই দিয়েছে। তাই কাসলং পাড়ের সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটিতে প্রীতিষ বাবুর রক্তের দাগ না শুকোতেই দেশের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে জনগণ ঘাতকের বুলেটের জবাব দিতে ভুল করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জণগণ আজো এম এন লারমার প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি

সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন চায়। চায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নেতৃত্বে দেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার। নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে জনগণ বুঝিয়ে দিলেন যে, চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ আর সংস্কারপন্থীরা জনধিকৃত। শহীদ প্রীতিষ বাবু এবং তাঁর সঙ্গে নন্দ কুমার চাকমা এবং সক্রিয় সমর্থক যুধিষ্ঠির-এর আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। ২১ নভেম্বর ২০১৩ সালে ভোরে আগে থেকে ওৎপেতে থাকা ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের গুলি প্রীতিষ এর প্রাণ কেরে নিতে পেরেছে। কিন্তু পার্টিতে আরো অনেক প্রীতিষের আগমনকে রোধ করতে পারেনি। নির্বাচনে বিজয়োত্তর সময়েও বাঘাইছড়ি জুম্ম জনতা এখনো সকল দুঃখজনক ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী অন্যতম প্রতিনিধি সন্তু লারমার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে।

তৎকালীন পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাধীন রামগড় মহকুমাস্থ (কাসলং) মারিস্যার নতুন আরেক গ্রামের নাম পাবলাখালী। যেখানে ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে পুরোন রাঙ্গামাটির আশপাশের বিশাল এলাকা জলমগ্ন হলে শিশু শশাঙ্কমিত্র ওরফে প্রীতিষদের নিয়ে (বাবা মদন মোহন চাকমা ও মাতা লালপুদি চাকমা)'র পরিবার নতুন বসতি স্থাপন করেন। আগে কর্ণফুলী নদীর তীরে তাদের পুরোনো গ্রাম ছিল জার্নাল। উদ্বাস্তু হবার আগ পর্যন্ত তাদের পূর্বসূরীরা যুগ যুগ ধরে সেখানে কাটিয়েছেন। উদ্বাস্তু হবার পর নতুন বসতি পাবলাখালী ছিল রামগড় মহকুমাধীন দীঘিনালা থানা নিয়ন্ত্রিত এলাকা। বাংলাদেশ আমলে আশির দশকে তিন পার্বত্য জেলা গঠিত হবার পর রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীনে বাঘাইছড়ি থানা স্থাপিত হয়। সমস্ত কাসালং নদীর এপাড় ওপাড় নিয়ে বাঘাইছড়ি থানা ঘোষণা করা হয়।

কাপ্তাই বাঁধের ফলে বংশ পরম্পরায় বসবাসরত ভিটেমাটির মায়া ছিন্ন করে ক্ষতিগ্রস্তরা বিভিন্ন দিকে চলে যায়। তখন ৯৯,৯০৭ জন আদিবাসী জুম্ম এবং আদি ও স্থায়ী বাঙালি উদ্বাস্তু হয়েছিল। প্রীতিষ বাবুর বাবার পরিবার ছিল তাদেরই অংশ। উদ্বাস্তুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকজন কাসালং, মাইনী, চেঙ্গী, শংখ ও ফেনীর বিভিন্ন এলাকায় চাষাবাদযোগ্য জমির সহজলভ্যতা অনুসারে বসতি স্থাপন করে। কাপ্তাই বাঁধে জলমগ্ন পুরোনবস্তীর নামে ডিপি'রা (ডিসপ্লেসড্ পারসন) নিজেদের গ্রামের নাম রেখেছিলেন। তাই বাঘাইছড়ি বা মারিস্যা এলাকায় কতেক ক্ষেত্রে রূপকারী, বঙ্গলতলী, মগবান, ঝগড়াবিল, জীবতলী ইত্যাদি নামের সাথে তাদের ফেলে যাওয়া পুরোন গ্রামের নামের হুবহু মিল দেখা যায়। যে জায়গার আলো বাতাসের সাথে মিলেমিশে তাদের দেহ মন পরিপুষ্ট হয়েছে সেই জায়গাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের ছেড়ে যেতে হয়েছিল। তাই স্মৃতি হিসেবে উদ্বাস্তুরা তাদের পুরোনো জায়গার নামকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। সেই জায়গার নামের সথে তাদের পিছনে ফেলে যাওয়া শতবর্ষী বটবৃক্ষ বা বহু ফলজ বাগান বাগিচাকে তারা কল্পনার চোখে দেখে।

আজকের দিনে সেসব আজ অথৈ জলের নীচে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পানি কমলে (বৃষ্টি না হলে) কোন কোন সময় কর্ণফুলী নদীর পাড়ে বর্তমান রাঙ্গামাটি ডিসি বাংলোর অদূরে পুরোনো চাকমা রাজবাড়ী ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠে। তখন অনেক মানুষ নৌকা যোগে ক্ষয়িষ্ণু চাকমা রাজবাড়ির ছাদে বেড়াতে যায়। পানিতে আধা ডুবন্ত পুরোনো ইটের দেয়াল মনে হয় যেন একেকটা কালো প্রস্তর খন্ড। সেই রাজবাড়ির গৌরবময় ঐতিহ্য আজ অতীতের গর্ভে বিলিন হয়ে যাওয়া স্মৃতি মাত্র। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার যে ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রের প্রথম শিকার হয়েছিল এই উদ্বাস্তুরা। আদিবাসী জুম্ম এবং আদি ও স্থায়ী বাঙালিরা। যারা পাকিস্তান সরকার থেকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ নিয়ে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ছেড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আনাচে-কানাচে নতুন বসতি গেড়েছিল। সুবিধামতো বসতি না পেয়ে ভারতের অরুনাচলে ৪০ হাজার আদিবাসী চাকমা পাড়ি দিয়ে আজো নাগরিকত্বহীন জীবন কাটাচ্ছে।

শত্রু-মিত্র চিহ্নিত না করে আন্দোলন করা যায় না। যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও বীর যোদ্ধাদের সম্মান দিতে জানে না তারা কোনদিন নিজেকে দেশপ্রেমিক ও বীর বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা রাখে না। '৮৩-র বিভেদপন্থীরাও পারেনি এম এন লারমার মতো একজন মহান নেতাকে সম্মান দিতে। তাই আজ তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আজকের নব্য বিভেদপন্থীদেরও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। যে এম এন লারমা শোষণহীন ও সুখী সমৃদ্ধশালী আদিবাসী জুম্ম সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেখেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন। বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক দেশ হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করতে পারবে। সাংবিধানিক অধিকার এবং প্রথাগত ভূমি অধিকার ফিরে পাবে। তখন আদিবাসী তথা মেহনতী মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হবে।

'৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর দেশের প্রেক্ষাপট পাল্টালে এম এন লারমা সশস্ত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। আমরণ তিনি বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের বন্ধু হিসেবে কাজ করে গেছেন। নেতার এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মবাহিনীর মধ্যে শহীদ প্রীতিষ চাকমাও একজন। শহীদ প্রীতিষ যে দলের পক্ষ হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই জনসংহতি সমিতি ত্যাগ করে সংস্কারপন্থীরা আজ জুম্ম জাতির ইতিহাসে যে কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করেছে তা '৮৩-র বিভেদপন্থীদেরও হার মানিয়েছে। এম এন লারমা আত্মঘাতি কাজকে কোনদিন সমর্থন করেন না। তাই বিভেদপন্থীদের আত্মঘাতি কর্মকান্ড থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য "ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া" নীতির ভিত্তিতে এম এন লারমা পার্টি ও বিভেদপন্থীদের মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

পার্টিকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে জুম্ম জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য আমরণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিভেদপন্থীরা কথা রাখেনি। শেষে মহান নেতার প্রাণ কেরে নিতে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের লেলিয়ে দেয়া খুনীদের হাত কাঁপেনি। আজকে সংস্কারপন্থীদের লেলিয়ে দেয়া ঘাতকদেরও হাত কাঁপেনি প্রীতিষ বাবুদের খুন করার সময়। প্রীতিষ বাবু শান্তিবাহিনীতে যোগ দানের পর সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে তিনি দক্ষিণাঞ্চলে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ই-কোম্পানীর (সেঃলেঃ) প্লাটুন কম্যান্ডার হিসেবে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি ই-কোম্পানীতে কর্মরত ছিলেন। '৮২ সালে আন্তারমানিক যুদ্ধে শহীদ জুলোর সাথে তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি শ্রবণ শক্তি হারিয়েছিলেন। দুই কানেই তিনি ভালভাবে শুনতে পাননা। অসুস্থাবস্থায় দীর্ঘ ৬ মাস চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি আর ফিরে পাননি। তাই সামরিক বিভাগ ছেড়ে বেসামরিক বিভাগে সাংগঠনিক দায়িত্ব নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুবসমিতির আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নান্যাচর এলাকায় কাজে যোগদান করেন। '৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর তিনি জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ২০১০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৮৩ সালে তিনি বিভেদপন্থীদের উৎখাত করার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অনাকাঙ্ক্ষি গৃহযুদ্ধোত্তরকালে ১৯৮৫ সালে তিনি সার্বোয়াতলী শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে হরিণায় পরিবার স্থানান্তর করতে বাধ্য হন। সে বছরই পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি পার্টির অনুগত একজন নীরব এবং আদর্শ অনুসারী কর্মী হিসেবে পার্টিতে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৮৫ সালে পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের পর পার্টি নতুনভাবে গোছালো হবার সময় পার্টি কর্মী পরিবারসমূহের আবাসিক সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়। তখনই তাঁর বিপ্লবী পারিবারিক জীবনের মধ্যে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তাঁর নিজস্ব কোন অর্থনৈতিক জীবন ছিলনা। পার্টিই তার কাছে সবকিছু। পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে পার্টির তত্ত্বাবধানে পরিবার এক জায়গায় রেখে বিভিন্ন অঞ্চলে নীরবে পার্টি অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরিবারের আর্থিক সমস্যা সমাধানে পার্টির উপর আশ্বস্থ ছিলেন। তিনি বাস্তব জীবনে একজন দৃষ্টান্ত স্থানীয় নিরহঙ্কার দেশপ্রেমিক হিসেবে আমরণ কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ একজন কর্মী। নীরবে তিনি কাজ করে যেতেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর তিনি স্বাভাবিক জীবনযাপনের মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীরা তার স্বাভাবিক জীবন যাপনে ব্যাঘাত ঘটায়। বিনা উস্কানীতে তাকে একমাস যাবৎ গ্রামবন্দী করে রাখে। তখন দেশে জরুরী অবস্থা চলছিল। এমতাবস্থায় পার্টির (জেএসএস) অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় কর্মীকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। সে অবস্থায় বাঘাইছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রীতিষ বাবু।

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার মহান নেতা এম এন লারমা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এবারের ২০১৩ সালের ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবারে আমরা প্রীতিষ বাবুকে তার দুই সহযোদ্ধাসহ হারালাম। নভেম্বর মাস পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে একটি শোকের এবং কালো দিবসও বটে। এই মাসেই ১৯৭২ সালের ৩১ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান পাস হয়। যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য পেশকৃত চার দফা দাবি তৎকালীন শেখ মুজিবর রহমান সরকার কর্তৃক ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হয়। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতর পতাকাতলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ সমবেত হয়। প্রীতিষ বাবুও ছিলেন সেই যুব সমাজের একজন সহযোদ্ধা।

সশস্ত্র সংগ্রামে যে মানুষটি শত্রুর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ থেকেও অক্ষত দেহে ফেরৎ এসেছিল নিজ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনদের কাছে। সে মানুষটি নিজের এককালের সহযোদ্ধাদের বুলেটে ঝাঝড়া হয়ে আজকে পার্টি এবং জুম্ম জাতির কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন। জুম্ম জাতির জন্য এর চেয়ে বেশি শোকের আর দুঃখের কী আর থাকতে পারে। যে শাসকগোষ্ঠী আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের বিলুপ্তির জন্য বুভুক্ষু হিংস্র বাঘের মতো করাল থাবা মারতে এগিয়ে আসছে তার দিকে ঘাতকদের দৃষ্টি নেই। অথচ আজকে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যারা নিবেদিত প্রাণ হয়ে আত্মোৎসর্গের মহিমায় মহিমান্বিত সেই সব দেশপ্রেমিকদের প্রতি সংস্কারপন্থী কুচক্রীদের এই হিংস্র হায়েনার দৃষ্টি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকারকামী জুম্ম জনগণ কখনো এই করুণ মৃত্যুকে মেনে নেবেনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে এম এন লারমার পাশে নাম জানা না জানা অন্যান্য শহীদসহ প্রীতিষ বাবু এবং তাঁর দুই সহযোদ্ধা নন্দকুমার চাকমা ও যুতিষ্ঠির চাকমার মহান আত্মত্যাগ চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

সাক্ষাৎকার:

সহপাঠী-সমসাময়িক পরিচিতজনদের স্মৃতিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন- সজীব চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণকারী ক্ষণজন্মা মানুষ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বা এম এন লারমা (১৯৩৯-১৯৮৩) আজ এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ছিলেন একদিকে একাধারে জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রথম রাজনৈতিক পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নেতা, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রগতিশীল আদর্শের ধারকবাহক এবং বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত জুম্মসমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা। অপরদিকে তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের পথিকৃৎ ও অনুসরণীয় এক জনদরদী সাংসদ এবং অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশেরও অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা। সাধারণ এক গ্রামে জন্ম নেয়া সহজ-সরল এক শিশু থেকে ধীরে ধীরে শহরতলীতে এসে অত্যন্ত ভদ্র, মিতভাষি, ভাবুক ও ভীষণ বইপড়ুয়া হিসেবে পরিচিত সেই হাইস্কুল ও কলেজ জীবন পেরিয়ে কীভাবে অধিকারবঞ্চিত মানুষের অত্যন্ত প্রিয় এক দূরদর্শি জাতীয় নেতায় ও বরণীয় এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন সেই জীবনের আলোর ঝলকানি আজ কিছু কিছু আমরা অনেকেই উপলব্ধি করলেও অনেক কিছুই আমরা এখনও জানি না বা অনেকেই এখনও জানেন না। কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে ও প্রগতির প্রয়োজনে তাঁকে জানা, তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর পথ ধরে এগিয়ে চলা আজ বোধ হয় অনেক বেশি প্রয়োজন।

তারই এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা হিসেবে এবারের '১০ই নভেম্বর স্মরণে' প্রকাশনার জন্য সীমিত সময়ের ব্যবধানে আমি এম এন লারমার দুজন সহপাঠী ও দুজন সমসাময়িক পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। এঁদের মধ্যে ভূপেন্দ্র নাথ চাকমা ও অমিয়াংশু চাকমা ওরফে ছবিবাবু হচ্ছেন এম এন লারমার হাইস্কুল ও কলেজজীবনের সহপাঠী। ভূপেন্দ্র নাথ চাকমা ১৯৯৯ সালে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং পশ্চিম ট্রাইবেল আদামে নিজ বাসায় বসবাস করছেন। আর অমিয়াংশু চাকমা ওরফে ছবিবাবুর জন্ম রাঙ্গামাটি শহরেই ১৯৪১ সালে। তিনিও দীর্ঘ চাকুরীজীবন শেষে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার এর দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে রাঙ্গামাটি শহরের চম্পকনগরে নিজ বাড়িতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করছেন।

অপরদিকে সহপাঠী না হলেও ছাত্রজীবনে অন্যতম পরিচিতজন তৎকালীন সময়ে মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত প্রমোদ বিকাশ কার্বারী (পি বি কার্বারী)র জন্ম এম এন লারমার সাথে একই বছর ১৯৩৯ সালে হলেও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এক বছর পর ১৯৫৯ সালে। তিনি রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি হন ১৯৫১ সালে। তৃতীয় হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বরাবর ক্লাশে প্রথম হন। তিনি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজী বিভাগে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর কুমিল্লার মতলবপুর ডিগ্রি কলেজ, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করে সর্বশেষ ২০০২ সালে ঢাকার কদমতলা পূর্ব বাসাবো হাইস্কুল এন্ড কলেজ থকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে রাঙ্গামাটির ইস্টার্ণ মডেল স্কুলের (ইংলিশ মিডিয়াম) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ফেলাযেয়্যা চাকমা নামে কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। আর জয় নারায়ণ চাকমা হাইস্কুল ও কলেজ জীবনে এম এন লারমার এক বছরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং চট্টগ্রামে একই হোস্টেলে ও একই কলেজে পড়েছেন। তিনি এম এন লারমার পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা প্রতিষ্ঠিত ছোট মহাপুরম জুনিয়র হাই স্কুলেরও ছাত্র ছিলেন। সে সময় তিনি এম এন লারমার বাড়ির পাশের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছেন। কলেজ জীবনে এম এন লারমাসহ অনেকেই তখন তাঁকে মাহ্জন (মহাজন) বলে ডাকত। তিনি ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম থেকে 'এক্সট্রা এসিসট্যান্ট কমিশনার অব ট্যাক্সেস (অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার)' এর দায়িত্ব হতে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে রাঙ্গামাটির পূর্ব ট্রাইবেল আদামে বসবাস করছেন।

আমি কিছু প্রশ্ন রেখে তাঁদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছি এম এন লারমার হাইস্কুল ও কলেজ জীবন এবং তার বিকশিত হওয়ার কিছু গল্প, এমনকি পরবর্তী কর্মজীবন সম্পর্কেও। আমার প্রশ্ন ছিল– এম এন লারমার সাথে তাঁদের পরিচয়, সম্পর্ক, ছাত্রজীবন সম্পর্কে; তিনি কী ধরনের বই পড়তেন, সামাজিক কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতেন কিনা, ভালো-মন্দ মিলিয়ে তিনি কেমন মানুষ ছিলেন, তাঁর সাথে উল্লেখযোগ্য কোন কথাবার্তা, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাপন, তাঁর সহপাঠী বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু কারা ছিলেন;

এমনকি কাপ্তাই বাঁধ, মুক্তিযুদ্ধ, সংসদীয় জীবন এর সাথে তাঁর সম্পর্ক–ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। তাঁদের ব্যক্ত তথ্যাবলী থেকে আমি যা পেয়েছি সেগুলোই কিছুটা সাজিয়ে এখানে উপস্থাপন করছি। তবে পি বি কার্বারীর অংশটি দেয়া হয় তাঁর নিজেরই বয়ানে।

প্রায়ই বই হাতে বা বই পড়া অবস্থায় থাকতেন

ভূপেন্দ্র নাথ চাকমা

'আমরা এক সঙ্গে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হই ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে। তবে এর আগে তাঁর সাথে দেখা হয় নবম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার সময়। দেখাদেখিটাই বেশি, কথাবার্তা ছিল সামান্য। পরিচয় পর্ব আর কি। তিনি এসেছিলেন মহাপুরম জুনিয়র হাই স্কুল থেকে। আর আমি আসি মগবান জুনিয়র হাই স্কুল থেকে।'

'আজকের দিনের মত তখন বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য-এমন কোন বিভাগ ছিল না। শুধু এ-সেকশন ও বি-সেকশন নামে দুটি গ্রুপ ছিল। তবে এ-সেকশনের পাঠ্যভুক্ত ছিল মূলত কলা ও বাণিজ্য বিষয়েরই বই। আর বি-সেকশনকে বিজ্ঞান বিভাগই বলা যেতে পারে। লারমা এ-সেকশনে পড়তেন। তৎকালীন সময়ে বি-সেকশনে কোন ছাত্রী পড়ত না। ছাত্রও ছিল প্রায় ত্রিশ হতে চল্লিশ জন। আর এ-সেকশনে ছাত্র-ছাত্রী মিলে প্রায় ষাট জন। তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হত ঢাকা বোর্ডের অধীনে। আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয় ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে।'

'এ সময় তিনি থাকতেন তবলছড়িতে আনন্দ বিহারের নিকটবর্তী তাঁর আপন মামা তৎকালীন সরকারি আমিন অমৃত লাল দেওয়ানের বাসায়। তিনি আমাদেরকে প্রায়ই সেখানে বেড়াতে যেতে আমন্ত্রণ জানাতেন। আমরাও মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। সেখানে গেলে দেখা যেত–তিনি প্রায়ই বই হাতে বা বই পড়া অবস্থায় থাকতেন। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় খুব ভালো ফলাফল না করলেও মোটামুটি ভালোভাবে পাশ করতেন। তবে পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য বই প্রচুর পড়তেন। সেই সময়কার পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাগুলোর নিয়মিত পাঠক ছিলেন তিনি।'

'অন্যদের মত তিনি বেশি ঘোরাঘুরি করতেন না। কোন সময় আজেবাজে কথাও বলতেন না বা ঠাট্টা-তামাশাও করতেন না। আর কোন আড্ডা বা গল্পগুজবেও কখনো অংশ নিতেন না। আমরা তো বিকেলে ভলিবল খেলতাম। তিনি এই খেলাতেও অংশগ্রহণ করতেন না। তবে সেই সময় যে একটা ড্রীল ক্লাশ ছিল–তাতে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। আবার আনন্দ বিহারে ব্যূহচক্র আয়োজন করা হলে অন্য সহপাঠীদের সাথে সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করতেন।'

'পোশাক ছিল সাধাসিধে। কথাবার্তাও কমই বলতেন। কখনো অট্টহাসি হাসতে দেখিনি। হাসলেও মৃদুভাবে হাসতেন। আর কারও সাথে কোন ঝগড়া হতেও দেখিনি।'

'মাঝে মাঝে তিনি শুক্রবার বন্ধের দিন বা বৃহস্পতিবার বিকেলে পার্শ্ববর্তী বনবাঁদাড়ে বেড়ানোর প্রস্তাব দিতেন। পাকা সড়ক ধরে হেঁটে যেতাম। আমরা যেতাম মূলত যারা গ্রাম থেকে এসেছিলাম। বেড়াতে গেলে একসময় একটা জায়গায় সবাই বসে পড়তাম। এ সময় তিনি মৃদু হাসি দিয়ে, সহপাঠীদের সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাইতেন–আমরা বড় হয়ে কে কী করব। কেন কোন সময় কানুনগোপাড়া কলেজে যে পাহাড়ি ছাত্রদের একটি সংগঠন আছে সে কথা জানাতেন। তবে রাঙ্গামাটিতে এধরনের কোন সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল না তখন।'

'১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর আমি ভর্তি হই চট্টগ্রামের কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে, আর তিনি ভর্তি হন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে, থাকতেন চট্টগ্রামের বান্ডেল রোডের ট্রাইবেল হোস্টেলে।'

'কোন কোন সময় শহরে গেলে আমি তাঁর সাথে থাকতাম। একবার তিনি আমাকে বললেন যে, আজকে আপনাকে শহরটা ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাবো। আমি বললাম, সেটা তো খুব ভালো কথা। তারপর দেখা গেল যে, সারা শহরটা তিনি পায়ে হেঁটেই আমাকে ঘোরালেন। বস্তি এলাকাও ঘুরে দেখালেন। বস্তির মানুষ আর পথে যেতে যেতে ফুটপাতে থাকা মানুষদের দেখিয়ে বললেন, দেখ, সবাই একই মানুষ, তারা কীভাবে আছে আর অন্যরা কীভাবে আছে!'

'তারপর বাঁধ হলো, পানি আসলো। আমরা মারিশ্যা গেলাম। তারপর আর যোগাযোগ হয়নি দীর্ঘদিন।'

'পরে তিনি এমপি নির্বাচিত হলেন। আমি সে সময়ের তাঁর আরও একটি ঘটনার কথা জানি। একদিন নাকি কয়েকজন ছাত্রকে সাথে করে তিনি ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরিতে যান। সেখানে প্রবেশের পর একটার পর একটা বই উল্টাতে থাকেন আর নোট লিখতে থাকেন। এদিকে দুপুর গড়িয়ে যায় যায় অবস্থা। ততক্ষণে তাঁর সঙ্গীদের পেটে যেন ক্ষুধা ধরে গেছে। তিনি সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করতেন, ক্ষুধা পাচ্ছে নাকি? সঙ্গীরা ক্ষুধার ভাব প্রকাশ না করেই জানতে চায়, আরও কতক্ষণ! তিনি বলেন, আর বেশি না, কিছুক্ষণ। এদিকে দুইটা বেজে গেলো। বই দেখতে দেখতে উল্টো একটু সহানুভূতির সুরে জিজ্ঞেস করলেন, আজকে এক বেলা ভাত না খেয়ে থাকতে পারবো না? আর বলেন, একটু অপেক্ষা কর, কাজটি শেষ করি। এভাবে বিকাল প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। তারপর সেখান

থেকে ফেরার পথে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, তোমাদের একটু পরীক্ষা করে দেখালাম। দেখ, ভাত না খেয়ে থাকলে কেমন কষ্ট লাগে! আমার তো অভ্যাস আছে। তোমাদের অভ্যাস নেই। আমি তো মাঝে মাঝে উপোস থেকে ভাত না খেয়ে থাকার কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে নিজেকে পরীক্ষা করি, এক বেলা না খেয়ে থাকতে পারি কিনা।'

'জানা আছে তো সংসদে তিনিই প্রথম কোরান, গীতা পাঠের পাশাপাশি ত্রিপিটক, বাইবেল পাঠের অধিকার আদায় করেন? সে সময় অন্য কোন সাংসদ এ বিষয়টি সেভাবে গণ্য করেননি।'

'সহপাঠীদের মধ্যে মনে পড়ছে–অমিয়াংশু চাকমা ছবিবাবু, বর্তমানে চম্পকনগরে বসবাস করছেন; জয়ন্ত বিকাশ চাকমা, তিনি মহাপুরম স্কুলে লারমার সাথে পড়াশোনা করেছিলেন, একসময় জনসংহতি সমিতিতে কাজ করতেন, পরে রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, বর্তমানে পশ্চিম ট্রাইবেল আদামে থাকেন; অমলেশ চাকমা, তিনি এখন কে কে রায় সড়কে রাণী দয়াময়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে নিজের বাসায় থাকেন; অমলেন্দু চাকমা, তিনিও মহাপুরম স্কুলের ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে আনন্দ বিহার এলাকায় থাকেন; আর রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শান্তিময় চাকমার বড় ভাই (নাম মনে পড়ছে না), প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করে অবসর নিয়ে বর্তমানে দেবাশীষনগরে থাকেন; আর বনরূপা-বলপিয়্যা আদামে থাকেন কমলেন্দু চাকমা, তিনি নাকি একটু অচল হয়ে পড়েছেন; আর মনে পড়ছে না। অন্যরাতো থাকেন রাঙ্গামাটির বাইরে। আর বিপ্রদাশ বড়ুয়া দশম শ্রেণিতে আমাদের সাথে ভর্তি হন, যিনি বর্তমানে স্বনামখ্যাত এক কথাসাহিত্যিক।'

তিনি যে এত বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়বেন তা ভাবতেও পারিনি

অমিয়াংশু চাকমা

'লারমা রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন নবম শ্রেণিতে ১৯৫৬ সালে। আমি তো আগে থেকেই এখানে ছিলাম। বাবা এই উচ্চ বিদ্যালয়েরই কৃষি বিষয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। পরে আমার ছোট বোনের জামাই হয়-অমলেন্দু বিকাশ চাকমা আর এম এন লারমা তাঁরা উভয়েই আসেন ছোট মহাপুরম জুনিয়র হাই স্কুল থেকে।'

'অবশ্য এর আগেও তাঁর সাথে পরিচয় ছিল। যেহেতু আমার দাদুর অর্থাৎ আমাদের পুরানো বাড়ি ছিল মাহলছড়িতে (মহালছড়ি)। বাবার সাথে সেখানে আমরা প্রায়ই হেঁটে বা সাইকেলে চরে আসা-যাওয়া করতাম। দাদুর বাড়িতে যাতায়াত করার সময় আমরা প্রায়ই মাওরুমে লারমাদের বাড়িতে উঠতাম, বিশ্রাম নিতাম, খাওয়া-দাওয়া করতাম, এমনকি কোন কোন সময় রাতযাপন করতাম।'

'তিনি রাঙ্গামাটিতে পড়াশোনা করার সময়ও আমরা প্রতিবেশী ছিলাম। অর্থাৎ যে মামার বাড়িতে থেকে তিনি হাই স্কুলে যাতায়াত করতেন সেই বাড়ির পাশেই ছিল আমাদেরও বাড়ি। এসময় তিনি একটু রিজার্ভড্ (চাপা স্বভাবের) থাকতেন, প্রায় চুপচাপ থাকতেন। আমরা তো ভলিবল, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন খেলতাম। তিনি কোন খেলাধুলা করতেন না। দুষ্টুমিতেও তিনি ছিলেন না। একেবারে নিরিবিলি। কেবলই বই পড়তেন। খুবই পড়ুয়া ছিলেন তিনি। আর স্কুলেও ছিলেন নীরব, স্কুলের বাইরেও নীরব। নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে থাকার চেষ্টা করতেন।'

'রাঙ্গামাটি সরকারি স্কুলে থাকার সময়ও তিনি খুবই পড়ুয়া ছিলেন। রাত্রে তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে গেলে কেবল পড়ার গুনগুন আওয়াজ শোনা যেত। আমি দেখিনি, তবে শুনেছি, পড়ার সময় তিনি নাকি টেবিলে একটি পিতলের বাসন এমনভাবে রাখতেন, পড়তে পড়তে ঝিমিয়ে পড়লে ঐ বাসনে ধাক্কা লাগত আর তাতে আবার তিনি জেগে উঠে পড়া শুরু করতেন। যাঁকে একেবারে বইপোকা বলা যায়।'

'সে সময় আমরা কেউ কেউ শহরে থাকা চাকমা ছেলেরাও প্রায়ই চাটগাঁইয়া বলতাম। তখন একবার ব্যাপারটি লক্ষ্য করে তিনি সহজভাবে বললেন, আপনারা কি চাকমা ভাষা জানেন না নাকি? নিজের ভাষায় কথা না বলে অন্য ভাষায় কথা বলছেন কেন? এ থেকে বোঝা যায় সেই সময়েও তাঁর মধ্যে একটা গভীর জাতীয় চেতনা ছিল এবং জাতিকে নিয়ে বিরাট চিন্তাভাবনা ছিল।'

'সে সময় তিনি যে এত পড়াশোনা করতেন, মনে হয় তা তিনি তাঁর মামা রামেন্দু শেখর দেওয়ানের কাছ থেকেও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আসলে পড়াশোনা করতে গেলে বোধ হয় অনুপ্রেরণাদাতা কিছু মানুষেরও দরকার হয়। আমার জানামতে, পরে চট্টগ্রাম যাওয়ার পর তাঁর পড়াশোনা আরও বেড়ে যায়। রিডার্স ডাইজেস্ট, টাইম ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, জার্নাল ও রাশিয়ান বই পড়তেন।'

'তিনি যে এত বিপ্লবী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়বেন তা আমরা তখন তত ভাবতেও পারিনি। তখন হয়ত তাঁর জাতীয় বিপ্লবী চেতনা সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তখন সেটা তিনি সেভাবে প্রকাশ করেননি। যেহেতু তখন এখানে আজকের দিনের মত কোন রাজনৈতিক-সাংগঠনিক বাস্তবতা ছিল না। রাঙ্গামাটিতে কোন ছাত্র-রাজনীতি ছিল না। আর তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ। আসলে তিনি সমচেতনার কাউকে তখন পাননি।'

'সেসময় মানুষ হিসেবে ভালো-মন্দের বিচারে তিনি ছিলেন পুরোদুস্তর এক ভালো মানুষ। যখন থেকে তাঁকে দেখেছি, তাঁর কোন

এদিক-ওদিক ছিল না। মানুষের সাথে অমায়িকভাবে কথা বলতেন এবং বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতেন। কাউকে জোর না করে তাঁর জ্ঞানে যতটুকু থাকত বোঝানোর চেষ্টা করতেন।

'১৯৭৫ সালে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার কিছু দিন পূর্বে তাঁর সাথে আমার একবার দেখা হয়। তিনি তখন থাকতেন রাঙ্গামাটির কন্ট্রাকটর পাড়ায়। সে সময় তাঁর সাথে একজন দেহরক্ষী বা সঙ্গীও ছিল। সে সময় আমরা আনন্দ বিহারের কিছু কাজে সহায়তা করতাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমি তাঁর কাছে যাই। বিহারের জন্য কোন আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আলাপ করতে। তিনি তখন আমাকে একটি কথা বলেন–ভাই, এই অবস্থায় থেকে তো লাভ নেই। কিছু স্থায়ী চিন্তাভাবনা করা দরকার। প্রথমে আমি সে কথা বুঝতে পারিনি। পরে উপলব্ধি করলাম তাঁর আরও কথায় তিনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। বললেন, এই কিয়ং, বিহার এগুলোতো অস্থায়ী। নিজেরা নিজেরা যতটুকু করা যায়! দশ জনের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ তো এখানে খুব বেশি নেই। সাধারণ মানুষের জন্য স্থায়ী কিছু করার চিন্তাভাবনা করা দরকার।'

'আমাদের দুর্ভাগ্য, এই মানুষটি যদি এখনও থাকত তাহলে আমাদের জন্য আরও ভালো হত।'

'সে সময় আমাদের আরও সহপাঠী ছিলেন অমলেশ চাকমা (সে সময়ের ফার্স্টবয়), তিনি ১৯৯৮ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন, বর্তমানে কে কে রায় সড়কে থাকেন; অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল ডা: দীবাকর খীসা, তিনি বর্তমানে ঢাকায় থাকেন; সুনীল কান্তি চাকমা, যিনি সহকারী থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন, বর্তমানে রাঙ্গামাটির পাথরঘাটায় থাকেন; অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট অনিরুদ্ধ চাকমা, তিনি থাকেন খাগড়াছড়ি সদরে; প্রমোদ বিকাশ চাকমা, তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন, বর্তমানে খাগড়াছড়ি থাকেন; বর্তমানে স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিক বিপ্রদাশ বড়ুয়া; আবদুর রহমান (ক্লাশের থার্ডবয়), স্কুল শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে সিলেটে থাকেন; সেই সময়ের আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছেলে রফিকুল ইসলাম; বেতারশিল্পী তৃপ্তিরাণী চাকমা, বর্তমানে রাঙ্গামাটির উত্তর কালিন্দীপুরে থাকেন; দুই বোন সুনন্দা দেওয়ান ও নন্দিতা দেওয়ান, বর্তমানে থাকেন রাঙ্গামাটির চম্পকনগরে; আর ননী গোপাল ত্রিপুরা, তিনি থাকেন খাগড়াছড়িতে–এদের নাম মনে পড়ছে।'

একজন দক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক এবং মহান দেশপ্রেমিক সংগ্রামী নেতা এম এন লারমা

পি বি কার্বারী

এম এন লারমার সাথে আমার ছাত্রজীবন থেকে পরিচয় থাকলেও, যোগাযোগ এবং আলাপ হয়েছে মাত্র কয়েকবার। ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রামের পাথরঘাটার বান্ডেল রোডের 'ট্রাইভাল মেস'-এ তাঁর সাথে দেখা হয়। সেখানে ২/৩ দিন ছিলাম। তাঁর সাথে ফরম্যাল আলাপ ছাড়া তেমন কোন আলাপ হয়নি আমার। এরপর ১৯৭৩ কি ১৯৭৪ সালে আমার রাঙ্গামাটি কলেজে অধ্যাপনার সময়ে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। একবার তিনি আমার বাসায় যান, আর দুইবার আমি তাঁর কাছে (তাঁর মামার বাসায়) গিয়েছিলাম। তখন আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রথমবারে প্রফেসর মংসানু চৌধুরী, দ্বিতীয়বারে প্রফেসর যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা।

তখন আলাপের এক পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, তাঁকে গলায় ব্লেড্ দিয়ে ঘষলেও (কাটলেও) তিনি আপোস করবেন না। এটা হয়ত আমাকে একান্ত আপন ভেবে বলেছিলেন। কারণ কথাটা কারো কারো কাছে (আত্ম) প্রচারের মত শোনাতে পারে। তিনি আরও বলেছিলেন, দুটি পাথর ঘষাঘষি করলে শুধু ছোট পাথর ক্ষয়ে যায় না, বড় পাথরও ক্ষয় হয়। তবে তিনি এই কথাগুলো কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন।

এম এন লারমাকে দেখেছি–কথাবার্তা বলেন ধীরে-সুস্থে, বাগ-বাহুল্য বা অতি-উচ্ছলতা নেই। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, ইন-দোর/আউট-দোর গেম-এর মধ্যেও দেখিনি। বরং বই-পুস্তকে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। ধবধবে ইস্ত্রি-করা, পরিচ্ছন্ন সাদা সার্ট-সাদা প্যান্ট পোশাকে, মার্জিত, পরিমিত জীবনাচরণে তাঁকে দেখেছি। তিনি অমায়িক, ধীরস্থির, শান্ত, তবে গম্ভীর নন, বরং সহজ-সচ্ছন্দ আন্তরিক আলাপী বলা যায়। তিনি ছিলেন নির্মল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সকল জ্ঞানী-গুনি ও সাধারণ জনগণের কাছে প্রিয়-প্রশংসিত ব্যক্তি।

শুনেছি–তিনি যা বুঝেন, সঠিক মনে করেন, তা করার ক্ষেত্রে কঠোর, কট্টর বা আপোসহীন। তবে অন্যান্য মানবিক/সংস্কারবাদী কাজের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নমনীয়/উদার। বামপন্থী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে পাকিস্তান আমলে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছিল। তবে তিনি আপোস করেননি, সসম্মানে জেল-মুক্ত হয়ে আসেন।

পাহাড়ের এতগুলি জাতিসত্তাকে একাবদ্ধ করে ইতোপূর্বে আমাদের কোন নেতাই এতবড় সংগঠন, এতবড় আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। বা এত বড় সংগ্রাম করেননি। তিনি যে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তারা তাঁকে একবিন্দু ক্ষতি করতে পারেনি। তিনি তাদের সাথে আপোসও করেননি। এদিক দিয়ে তিনি একজন মহান দেশপ্রেমিক, দক্ষ সংগঠক, বড় মাপের সংগ্রামী নেতা।

মানুষের ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে; তাঁরও থাকতে পারে। কিন্তু তিনি তো জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় অধিকার এবং জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে কোন বিশ্বাসঘাতকতা, আপোস বা আত্মসমর্পণ করেননি। অথবা কোন মিত্রের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডাদেশও জারি করেননি। তিনি তো এমন কোন রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত অপরাধ করেননি যার জন্য তাঁকে এমনভাবে স্ব-জাতির হাতে তাঁর প্রাণ দিতে হবে? এতে আমাদের স্ব-জাতির কারোর লাভ হয়নি। লাভ হয়েছে বিজাতীয় শত্রুর–যারা আমাদের অধিকার-অস্তিত্ব হরণ করছে।

তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত হৃদয়বিদারক, মর্মান্তিক, দু:খজনক। তাঁর মৃত্যু শুধু পাহাড়িদের জন্য নয়, সমগ্র বাংলাদেশীদের জন্যও অপূরণীয় ক্ষতি। কারণ তিনিই একমাত্র গণপ্রতিনিধি যিনি সংসদে বারবার মুক্তকণ্ঠে সমগ্র বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক, নারী-শিশু, সকল জাতিসত্তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ বা গণতন্ত্রের দাবি জানিয়েছিলেন উগ্রজাতীয়তাবাদী, সামন্ত-মুৎসুদ্ধি বুর্জোয়া সরকারের কাছে–যে অধিকার, যে গণতন্ত্র ছাড়া দেশে কোনদিন জনগণের কোন শান্তি, স্বস্তি এবং নিরাপত্তা আসতে পারে না, আসবে না।

জাতির ভবিষ্যতের কথা উঠলে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন

জয় নারায়ণ চাকমা

'এম এন লারমা (মঞ্জু)র সাথে আমার প্রথম দেখা হয় সম্ভবত ১৯৫৩ সালে। আমি যখন পানছড়ির এম ই স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পাশ করার পর ছোট মহাপুরম জুনিয়র হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হই। এম এন লারমা আমার চেয়ে এক বছর জুনিয়র ছিলেন। তাঁর বড় ভাই বুলু আর আমি একই শ্রেণিতে পড়তাম। সে সময় আমি তাঁদের বাড়িরই কাছাকাছি উপেন্দ্র লাল চাকমার (পরবর্তীতে এমপি হন) শ্বশুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থেকে ঐ স্কুলে লেখাপড়া শুরু করি। সম্পর্কে গৃহকর্ত্রী আমার পিসি ছিলেন।'

'সেখানে আমরা বুলু, মঞ্জু, সন্তু (বর্তমান লিডার) সহ একসাথে গোসল করতে যেতাম। গোসল করার সময় শান্তিবাবু (রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক) আর সন্তুবাবু বালুর চরে খুব কুষ্টি খেলতেন। কিছুক্ষণ পর পর সন্তুবাবু শান্তিবাবুকে ধরতেন। আমরা বসে বসে দেখতাম। তবে মঞ্জু এরকম কিছু করতেন না।'

'মঞ্জু তখনো মূলত ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন।'

'অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর আমি রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হই। তারপর আর তেমন যোগাযোগ হয়নি। বিশেষ করে আমরা স্কুলের হোস্টেলে কড়া নিয়মের মধ্যে থাকতাম বলে কমই ঘোরাফেরা করার সুযোগ ছিল। তবে আমার এক বছর পর তিনিও একই স্কুলে ভর্তি হন। আর তিনি আনন্দ বিহার এলাকায় তাঁর মামার বাসায় থাকতেন।'

'১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর আমি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আই এ-তে ভর্তি হই। এসময় জগতজ্যোতি বাবু আমার সাথে ভর্তি হন, যিনি পরে বিসিকে চাকরী করেন। এম এন লারমা ভর্তি হন তার পরের বছর ১৯৫৮ সালে। আমরা একসঙ্গেই থাকতাম চট্টগ্রামের পাহাড়ি ছাত্রাবাস 'বিন্দু নিলয়'-এ। ছাত্রাবাসটি ছিল তখন দোতলা 'গুদোম' অর্থাৎ মাটির নির্মিত। যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা যতীনবাবুও সেখানে থাকতেন যিনি একসময় যুগ্ম সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এই ছাত্রাবাসের জায়গাটি তখন ৫৫ হাজার টাকা দিয়ে কেনার ব্যবস্থা করেন তৎকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুই এমএলএ কামিনী মোহন দেওয়ান ও বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা। সে সময় আমাদের সাথে আরও থাকতেন সুধাকরবাবু, অমরেন্দ্রবাবু।'

'সেখানে থাকার সময় একদিন একটি ঘটনা ঘটে। আমরা ছাত্রাবাস থেকে কলেজে যেতাম দুই আনা বাস ভাড়া দিয়ে। আমরা একবার স্টেশনে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সবার হাতে অন্তত একটি করে খাতা থাকত। সেবার হলো কি, আমিসহ এম এন লারমা ও আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় কোত্থেকে এক বাঙালি এসে হুট করে তাঁকে 'মামা' বলে ডাকে এবং 'কিল্ল্যাই এডে থিয়াইও' (কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছ) বলে প্রশ্ন করে। এটা শুনে আমরা কিছু বোঝার আগেই তিনি খাতাসহ দুই হাত দিয়ে লোকটিতে চাপড়াতে থাকেন। এক পর্যায়ে আমরা সবাই মিলে তাঁকে থামায়। এম এন লারমা তখন থেমে লোকটিকে বলেন, কেন তুমি আমাকে 'মামা' ডাকলে? আসলে এটা ছিল তাঁর একধরনের প্রতিবাদ। তখন আসলে আমাদেরকে 'মামা' ডাকলে আমরা এক ধরনের অপমানবোধ করতাম। আর শহরে-বন্দরে তখন অনেক বাঙালিও এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী খাটো কাপড় পড়া চাকমা বা অন্যান্য জুম্মদের দেখলে হয় তাচ্ছিল্যমূলকভাবে হাতে তালি দিয়ে 'মামা' ডাকত অথবা 'জুম্ম/হাপ্পো লাম্যে' বলে জোরে জোরে ডাকত।'

'আর একবার, খুব সম্ভবত তিনি তখন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর ঢাকা যাচ্ছিলেন। আমি থাকতাম চট্টগ্রামের মোগলতুলিতে। যাওয়ার পথে তিনি আমার আবাসস্থলে উঠলেন। আমরা একসঙ্গে খাবার খেলাম। সেদিন সবজি ছিল ঝিঙে। তিনি মাছ-মাংস কমই খেতেন। সবজি খেতেন বেশি। তিনি বললেন, আমাকে আরও একটু ঝিঙে তরকারির ঝোল দেন। বললেন, কবি কাজী নজরুল ইসলামও প্রচুর সবজি আর ঝোল খেতেন। আমি হেসে বললাম, আপনি সবজি খেতে চাইছেন, কাজী নজরুল ইসলামকে আনছেন কেন? কে দেখেছে, কাজী নজরুল ইসলাম বেশি সবজি খেতেন কিনা!'

'তিনি যে একজন সৎ ও সজ্জন ব্যক্তি, সে সময়ের একটি ঘটনায় আমি প্রমাণ পেলাম। তিনি আমাকে একটু মস্করা করে বললেন যে, বড়দা, আমাকে একটি মোটর সাইকেল কিনে দেন। তখন বোধ হয় একটু আধটু সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে। হয়ত ঘোরাঘুরির জন্য মোটর সাইকেলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তখন ৫০ সিসি একটি হোন্ডার দাম ছিল একুশ শ কি বাইশ শ। তখন আমি বললাম, আমি কোথায় পাবো, আমি বেতন পাই চার শ/পাঁচ শ টাকা! কোথায় পাবো বাইশ শ টাকা! সেই সময়ে এটা অনেক বড় অংক। আমি বললাম, একটা কাজ করুন–আমি একটা না, দুই/তিনটা কিনে দিতে পারবো, প্লিজ, বরং আপনি আমাকে কয়েকটা ইমপোর্ট লাইসেন্স করে দেন। অর্থাৎ আপনি আমাকে একটা কামধেনু হিসেবে তৈরী করবেন, যখনি আপনার কোন দুধের প্রয়োজন হবে, আমি দুধের ব্যবস্থা করবো। যখনি দশ হাজার/পাঁচ হাজার প্রয়োজন হবে, আমি ব্যবস্থা করতে পারব। এটা শুনে তিনি বেশ সিরিয়াস হয়ে গেলেন। বললেন, আমি কেন তেমন বোগাস কাজ করবো! আমি সে কাজ করি না। সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি। আর আমি বললাম, আমিও কীভাবে কী করবো। চার শ টাকা বেতন পাই, ঘরভাড়া দেয়া, সংসার চালানো আর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানো কী সম্ভব? তারপর সে বিষয়ে আর কথা এগুইনি।'

'আর একটি মজার ব্যাপার হল। আমরা বিন্দু নিলয়ে থাকতে আমি তাঁকে একটি নাম রেখে দিই–মৌলভী সাহেব বলে। হোস্টেলে থাকলে তিনি সবসময় একটি হাফ-হাটা সাদা গেঞ্জি পরে থাকতেন আর বই পড়তেন কম্যুনিস্ট ধাঁচের বই বেশি। সে কালে বন্ধু বা পরিচিত মহলে মজা করে কোন না কোন নাম বসিয়ে দেয়া হত। তবে আমাকে তিনি কোন দিন রাগ করতেন না।'

'সে সময় তিনি প্রচুর বই পড়তেন। মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন, মাওসেতুঙের বই পড়তেন বেশি। তবে বিভিন্ন উপন্যাসও পড়তেন। এই পাঠাভ্যাস বোধ হয় তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকেও পেয়েছিলেন। কারণ তাঁর বাবাও প্রচুর পড়াশোনা করতেন।'

'চট্টগ্রামে পড়ার সময়ে তাঁর রাজনৈতিক বা কোন সাংগঠনিক তৎপরতা সম্পর্কে আমার তেমন জানা ছিল না। কারণ রাজনৈতিক কোন কাজকর্ম তখন গোপনেই চলত। হোস্টেলেও তাঁর কোন রাজনৈতিক সহকর্মী আসতে দেখিনি। তবে বোধ হয় তিনি নিজে থেকে গিয়ে সেসব কাজে যোগদান করতেন। একবার মাত্র আমি তাঁর সাথে সাতকানিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির এক কার্যালয়ে যাই।'

'তখন তো রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ। রাজনীতি করাও খুব কঠিন কাজ ছিল। এখন তো অনেকটাই স্বাধীন। তখন রাজনীতি করা মানে এক প্রকার বিপদ ডেকে আনা। তখন সে সময় কেমনে জানি বুলগেরিয়া থেকে আমাকে কিছু ম্যাগাজিন পাঠানো হয়। তখন বোধ হয় মার্শাল টিটো ছিলেন। সেই ম্যাগাজিনের খবরটা কীভাবে পুলিশের কাছে যায়! তখন তা তদন্ত করার জন্য আসেন বান্দরবানের এক মারমা পুলিশ কর্মকর্তা। সেই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, আমি তো তোমার জ্যেঠা কান্তমুনি বাবুকে চিনি। বলেন, তুমি আর এই সমস্ত বই পড়ো না, কমিউনিস্ট-টমিউনিস্ট বাদ দাও, বরবাদ যাবে। আমিও একটু ভয় পেয়ে বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে, পড়বো না।'

'আমার মনে পড়ে, আমরা তো সুযোগ পেলে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দুষ্টুমি বা মস্করা করতাম। তিনি কখনো বাজে কথা বলতেন না। সবসময় বই পড়ে থাকতেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে, জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন কথা উঠলে, তিনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন আর শব্দ করতেন 'হায়!' কী হবে আমাদের অবস্থা, কী হবে আমাদের ভবিষ্যত! এভাবে তাঁকে আমি একাধিকবার দেখেছি।'

'চট্টগ্রামে তিনি বাঙালিদের সাথে, বিশেষ করে হিন্দু বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আনাগোনা করতেন বেশি।'

'যাহোক পরে আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার পর লারমার সাথে আর দেখা হয়নি। তবে সে সময় আমি লারমাদের নেতৃত্ব ও আন্দোলন নিয়ে গভীরভাবে আশাবাদী হয়েছিলাম। যদিও আমি চাকুরীতে ছিলাম। মাঝে মাঝে ভাবতাম পরিস্থিতি অচিরেই পরিবর্তন হবে, চাকরী ছেড়ে হয়ত পার্বত্য চট্টগ্রামে যাবো। তাই সে সময় প্রথমদিকে ব্যাংকে আমি কোন টাকাকড়ি জমাতাম না। একসময় আমার ছেলেদের বাংলা নাম না রেখে অর্থহীন হলেও নিজের মত করে নাম রাখলাম।'

'লারমার আসলে অনেক ভালো গুণ ছিল। তাঁর আসলে বাতিক্রমী গুণাবলী ছিল। কিন্তু আমরা তো অকৃতজ্ঞ জাতি। কাউকে বড় করে তুলে ধরলে আমরা লজ্জাবোধ করি, কুণ্ঠিত হই। কাউকে যত ছোট করে তুলে ধরতে পারি ততই আমাদের ভালো লাগে। একজন মানুষ কষ্ট করছে, ভালো কিছু করছে, আমরা প্রশংসা করতে চাই না। আমরা কেবল তাঁর খারাপ দিকগুলোই তুলে ধরতে আগ্রহী হই। প্রশংসা করতে পারি না, কিন্তু নিন্দা কেন করবো? মানুষের ভালো দিক থাকে মন্দ দিক থাকে। কিন্তু খারাপ দিকটা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে ক্ষতি না করছে আমরা সেটা তুলে ধরবো কেন, তার ভালো দিকটাই তুলে ধরা উচিত।'

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাংলাদেশের আদিবাসীদের অবস্থা

গৌতম কুমার চাকমা

ক। ভূমিকা

২০১৪ খ্রিস্টাব্দ জাতিসংঘ কর্তৃক বিশ্বের আদিবাসীদের জন্য ঘোষিত দ্বিতীয়বারের 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক' (২০০৪ – ২০১৪)-এর সর্বশেষ বর্ষ। অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করবার জন্য যথারীতি ঘোষণা দেওয়া হয়। এ বছরের আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের জন্য জাতিসংঘের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয় হল– Bridging the Gap: Implementing the Rights of Indigenous Peoples (আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবার সঙ্গে সেতুবন্ধন)। অর্থাৎ বিশ্বের আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধানাবলী ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে কতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বা ফাঁক রয়েছে– তা বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সাথে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্রে আদিবাসীদের মধ্যেকার নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ, সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফকাস বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তবতায় এটি একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ– তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ পদক্ষেপ দেশের আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা তথা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অনুকূল প্রভাব ফেলবে। এতে দেশের আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে।

খ। পটভূমি

বিগত শতাব্দীতে ১৯১৪-১৯১৮ এবং ১৯৩৯–১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে দু'টি মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ দু'টি মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশেষ করে শক্তিধর দেশের শাসকগণ প্রত্যক্ষ করেন ও তা উপলব্ধি করতে পারেন। এ ধরনের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্র বা ক্ষমতাসীন জাতিসমূহ কর্তৃক 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের যখন তখন যুদ্ধ করবার পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনেকাংশে কমে যায়। কিন্তু অধিকার বঞ্চিত জাতিসমূহের সংগ্রাম-বিদ্রোহ বা বিপ্লব করবার পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব শান্তি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং ১০৭) নামে একটি কনভেনশন প্রণীত হয়। তখন থেকে আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘ বা এর অঙ্গ সংগঠনসমূহ বিভিন্ন কনভেনশন, ঘোষণা ইত্যাদি প্রণয়ন ও তা কার্যকর করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৯৯৩ সালকে বিশ্বের আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ' হিসেবে পালন করা হবে। তদনুযায়ী ১৯৯৩ সালকে জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ পালিত হয়। অতঃপর ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ঘোষণা দেয় যে, প্রতিবছর ৯ আগস্ট তারিখে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হবে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৯ আগস্ট তারিখে। উক্ত সভার তারিখের স্মরণে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের দিন নির্ধারিত হয়।

বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭২৫ (সাত শো পঁচিশ) কোটি। তন্মধ্যে ৭২ টি দেশে জনসংখ্যা কম এমন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জাতির বা আদিবাসীদের জনসংখ্যা প্রায় ৩৭ কোটির অধিক অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ শতাংশ। এ সব জাতিসমূহের বা আদিবাসীদের এককালে স্ব স্ব জাতির স্ব স্ব রাজ্য ছিল। অথচ কালের গতিতে তাঁরা জনসংখ্যায় কম, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা জাতিতে পরিণত হয়েছেন। শাসন, ভূমি, অর্থনীতি, ভাষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত অধিকার হারিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেকে জাতিগত অস্তিত্ব হারিয়েছেন বা প্রায় হারিয়েছেন বা হারাতে চলেছেন। এ পরিস্থিতি অবসানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন

অঙ্গসংগঠন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগত জাতির সাথে আদিবাসীদের মধ্যে অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র বের করবার প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের আদিবাসীগণও দীর্ঘ কালের প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভূমি ও পূর্ব পুরুষের আবাসস্থলের অধিকার হারিয়ে ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ও ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বীয় জাতিগত অস্তিত্ব বিলুপ্তির চরম ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়েছেন। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য আদিবাসীদের বা তাদের সংগঠনের নিজস্ব প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ভূমিকা রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আদিবাসী ফোরাম এ বছরও আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

গ। আদিবাসী অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধানাবলী

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রগত জাতিসমূহের অধিকার ও আচরণ এবং অধিকার বঞ্চিত বা রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বহীন জাতিসমূহের জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত সার্বজনীন ঘোষণা পর্যাপ্ত না হওয়ায় রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বহীন জাতিসমূহের জন্য অর্থাৎ কেবলমাত্র আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রচেষ্টায় দু'টি কনভেনশন ও মানবাধিকার পরিষদের অধীনে একটি ঘোষণাপত্র প্রণীত হয়।

২৬ জুন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রচেষ্টায় আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং ১০৭) প্রণীত হয়। এ কনভেনশনে মূলত জাতিসংঘ কর্তৃক আখ্যায়িত জাতীয় জনসমষ্টি-এর সাথে ট্রাইব্যাল, সেমি-ট্রাইব্যাল বা আদিবাসী নামে আখ্যায়িত বিভিন্ন জাতির মানুষকে 'আত্মীকরণ' বা 'মিশিয়ে নেবার' (Assimilation) বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি এদেরকে স্বীয় জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে জাতীয় জীবন ধারায় একীভূত (Integration) করবার কিছু বিধানও উক্ত কনভেনশনে রাখা হয়। এ লক্ষ্যে উক্ত কনভেনশনে এ সব জাতিসমূহের বা জনগোষ্ঠীর সমান অধিকারের নিশ্চয়তার সাথে বিশেষ অধিকারের বা ন্যায্যতামূলক অধিকারের বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরে দেখা যায় যে, আইএলও কনভেনশন ১০৭-এর আলোকে ট্রাইব্যাল, সেমি-ট্রাইব্যাল বা আদিবাসী নামে আখ্যায়িত দরিদ্র ও প্রান্তিক বিভিন্ন জাতির মানুষকে রাষ্ট্রের জাতীয় জনসমষ্টির সাথে 'আত্মীকরণ করা' বা 'মিশিয়ে নেওয়া' সম্ভব নয়। বরং তাতে সংগ্রাম-সংঘাতের আশংকা সৃষ্টি হয়।

অতঃপর ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং ১০৭)-কে সংশোধন করে আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৮৯ (নং ১৬৯) নামে অন্য একটি কনভেনশন প্রণয়ন করে। এ কনভেনশনের লক্ষ্য হল দরিদ্র ও প্রান্তিক বিভিন্ন জাতির মানুষকে তাঁদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে 'একীভূত করার নীতি' গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। স্বাভাবিকভাবে এ কনভেনশনে Populations শব্দের পরিবর্তে Peoples শব্দ ব্যবহার করা হয়। আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও অন্যান্য অধিকার অধিকতরভাবে স্পষ্টীকরণ করা হয়।

অপরদিকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের আওতাধীনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১তম অধিবেশনে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র (ইউএনড্রিপ) অনুমোদিত হয়।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, যা সাধারণ পরিষদের ১৫ মার্চ ২০০৬ তারিখের রেজুলেশন ৬০/২৫১ মোতাবেক মানবাধিকার পরিষদে রূপান্তর করা হয় এবং তৎকালীন মানবাধিকার কমিশনের আওতাভুক্ত সংখ্যালঘুদের বৈষম্য প্রতিরোধ ও সুরক্ষা বিষয়ক সাব-কমিশন (পরবর্তীতে মানবাধিকার প্রসার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত সাব-কমিশন ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ)-এর দীর্ঘ বহু বছরের প্রচেষ্টায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইউএনড্রিপ অনুমোদিত হয়। এ কনভেনশনের পক্ষে ১৪৩ ভোট, বিপক্ষে ৪ ভোট ও অনুপস্থিত ১১ ভোটে তা অনুমোদন লাভ করে। পরে বিপক্ষে ভোট দেওয়া ৪ টি দেশ– অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পক্ষে ভোট দেয়। এ ছাড়া ভোট দানে বিরত সামোয়া ও অনুপস্থিত মন্টিনিগ্রো পরে পক্ষে ভোট প্রদান করে। অর্থাৎ তখনকার ১৯২ টি দেশের মধ্যে সর্বসাকুল্যে ১৪৯ টি দেশ উক্ত ঘোষণাপত্রের অনুকূলে ভোট দিয়েছে।

উল্লিখিত কনভেনশন ও ঘোষণাপত্র ছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন বিভিন্ন কনভেনশন, ঘোষণাপত্র ইত্যাদি প্রণয়ন বা ঘোষণা করে।

৫ জুন ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘ কর্তৃক জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন প্রণীত হয়। এ কনভেনশনের মূল লক্ষ্য ছিল তিনটি। সেগুলো হলঃ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের সুষম ও ন্যায্যতামূলক বন্টন।

২০০০ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ঘোষণা করা হয়। উক্ত ঘোষণায় ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ৮ (আট) টি বিষয়ে উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করবার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলোঃ চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ; সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন; লিঙ্গ সমতা উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন; শিশু মৃত্যু হ্রাসকরণ; মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নয়ন; এইচআইভি/ এইড্স ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ; পরিবেশের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশ্ব অংশীদারিত্ব উন্নয়ন সাধন।

২০০১ খ্রিস্টাব্দে মানবাধিকার কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশেষ কার্যপ্রণালী হিসেবে আদিবাসী অধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র নিয়োগ করা হবে। ২০০৪ ও ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইহার কার্যাবলী/ম্যান্ডেট যথাক্রমে কমিশন এবং মানবাধিকার পরিষদ নবায়ন করে। স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র-এর কার্যাবলী/ম্যান্ডেট নিম্নরূপঃ

● নতুন আইন, সরকারি কার্যক্রম, আদিবাসী জাতি ও সরকারের মধ্যেকার গঠনমূলক চুক্তিসহ উত্তম উদাহরণগুলোর উন্নতি বিধান করা, আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক মান বাস্তবায়ন করা;

● নির্দিষ্ট দেশসমূহের আদিবাসীদের সামগ্রিক মাবনাধিকার সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেওয়া;

● সরকার ও অন্যান্যদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে আদিবাসীদের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলী নিষ্পত্তি করা;

● আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়ভিত্তিক স্টাডি পরিচালনা করা।

১৫ মার্চ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ-এর অধীনে ৪৭-সদস্যক জাতিসংঘের সার্বজনিন মানবাধিকার পরিবীক্ষণ (ইউপিআর) স্থাপন করা হয়। প্রতি চার বছর অন্তর এ ইউপিআর কমিটি জাতিসংঘভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট সরকারের তাদের দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিগত ২০১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সব দেশের মানবাধিকার রেকর্ড পর্যালোচনা করেছে এ কমিটি। পর্যালোচনার পরে স্ব স্ব দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য কমিটি পরামর্শ বা মতামত প্রদান করেছে।

আইএলও কনভেনশন ১০৭-এর বিধানাবলী

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহের প্রণীত বা অনুমোদিত বিভিন্ন কনভেনশন, ঘোষণাপত্র ইত্যাদিতে অনুসমর্থন জ্ঞাপন বা অনুস্বাক্ষর করে। তন্মধ্যে আইএলও কনভেনশন ১০৭-এ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার অনুস্বাক্ষর করে। উক্ত কনভেনশনের উল্লেখযোগ্য বিধানাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ ১ (ক) ও (খ) -তে এ কনভেনশন-এর প্রযোজ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যাঁরা Indigenous and tribal or semi-tribal populations হিসেবে আখ্যায়িত এ কনভেনশন তাদের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

(খ) অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ ১-এ নিরাপত্তা ও একীভূত করা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান ও স্বীয় দেশের জীবন ধারায় তাদেরকে ক্রমান্বয়ে একীভূত করার (অর্থাৎ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের আওতাধীনে মানিয়ে নেবার) জন্য সমন্বিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব দেশের সরকারের উপর বর্তাবে।

(গ) অনুচ্ছেদ ৭-এ প্রথাগত আইন বিষয়ে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ ক্ষেত্রে তাদের প্রথাগত আইন বিবেচনায় রাখতে হবে।

(ঘ) অনুচ্ছেদ ১১-তে ভূমির অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে দখলাধীন ভূমির উপর সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে।

(ঙ) অনুচ্ছেদ ১৩-এর উপ-অনুচ্ছেদ ১ ও ২-এ যথাক্রমে ভূমির মালিকানা হস্তান্তর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, (১) সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রথাগতভাবে বিধিবদ্ধ ভূমির মালিকানা হস্তান্তর এবং ব্যবহার পদ্ধতি, এসব জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে যতটুকু দরকার দেশের আইন ও বিধির আওতায় ততটুক, মেনে চলতে হবে; (২) সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদেরকে এসব রীতি-প্রথার সুযোগ গ্রহণ অথবা এসব জনগোষ্ঠীর সদস্যদের আইন সম্পর্কিত অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভূমির মালিকানা লাভ কিংবা ব্যবহার করা থেকে নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(চ) অনুচ্ছেদ ২১-এ শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জাতীয় জনসমষ্টির অপরাপর অংশের সাথে সমতার ভিত্তিতে সকল স্তরে শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) অনুচ্ছেদ ২৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ ১-এ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর শিশুদেরকে তাদের মাতৃভাষায় পড়ার ও লিখার সুযোগ দিতে হবে।

(জ) ১৫ অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ ও শর্তাবলী, ১৬ অনুচ্ছেদে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প ও গ্রামীন শিল্পে সুযোগ-সুবিধা প্রদান, ১৯ ও ২০ অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ, ২৭ অনুচ্ছেদে সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধি তৈরি করার এবং অন্যান্য বিভিন্ন অনুচ্ছেদে অপরাপর সুবিধাদির কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশসহ ২৭ (সাতাশ) টি দেশ আইএলও কনভেনশন ১০৭-এ অনুস্বাক্ষর করে। কোন কোন দেশ স্ব স্ব দেশের আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করে চলেছে।

আইএলও কনভেনশন ১৬৯-এর বিধানাবলী

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ সংশোধন করে আইএলও কনভেনশন ১৬৯ প্রণীত হয়। বিশ্বের আদিবাসীদেরকে স্ব স্ব জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে স্ব স্ব রাষ্ট্রের কাঠামোর আওতায় একীভূত করার নীতির আলোকে আইএলও কনভেনশন ১৬৯-এ বিভিন্ন বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেগুলোর মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) এ কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ১ -এর উপ-অনুচ্ছেদ ১ (ক) ও (খ)-তে যথাক্রমে tribal peoples এবং indigenous peoples কারা এবং এ কনভেনশন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে মর্মে বিবৃত হয়েছে।

(খ) অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ ১-এ অধিকার ও integrity সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠীসমূহের অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের integrity (অখন্ডতা)-র প্রতি শ্রদ্ধা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট জাতি (Peoples)-এর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সমন্বিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাবে।

(গ) অনুচ্ছেদ ৩-এ মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, (১) আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠীসমূহ কোন প্রতিবন্ধকতা ও বৈষম্য ব্যতীত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবে। এ কনভেনশনের বিধানাবলী বৈষম্যহীনভাবে এ সব জাতিসমূহের পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৪-এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, (১) সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সম্পত্তি, শ্রম, সংস্কৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী-এর স্বাধীনভাবে ব্যক্ত ইচ্ছার সাথে বিরোধার্থক হতে পারবে না। (৩) বৈষম্য ব্যতিরেকে নাগরিকদের সাধারণ অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা কোনরূপ পক্ষপাতমূলক হবে না।

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৭-এ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

(১) সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী-এর জীবন, বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ এবং তাদের দখলাধীন ও ব্যবহৃত ভূমির উপর এবং তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপর প্রভাবিত করে বিধায়, তাদের নিজস্ব কার্যক্রমের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের অধিকার রয়েছে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রভাবিত করে এমন জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে তারা অংশগ্রহণ করবে।

(২) এ জাতিগোষ্ঠীর যে এলাকায় বাস করে সে এলাকার সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়, তাদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা, সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও কাজের পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে এরূপ মানোন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

(৩) সরকার নিশ্চিত করবে যে, উপযুক্ত সময়ে, পরিকল্পিত কার্যক্রমের ফলে তাদের উপর সামাজিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতায় গবেষণা করা হবে। এ গবেষণার ফলাফলই এ সব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৪) এ জাতিগোষ্ঠীর যে ভূখন্ডে বসবাস করে সে ভূখন্ডের পরিবেশ রক্ষা ও অক্ষুন্ন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতায় সরকার গ্রহণ করবে।

(চ) অনুচ্ছেদ ৮-এর উপ-অনুচ্ছেদ ১-এ প্রথাগত আইন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর বেলায় জাতীয় আইন ও বিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে, তাদের প্রথা বা প্রথাগত আইনকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

(ছ) অনুচ্ছেদ ১২-তে আইনী সহায়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে তাদের অধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে হবে এবং এ সব অধিকারের কার্যকর সুরক্ষার জন্য হয় ব্যক্তিগতভাবে নতুবা তাদের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার মাধ্যমে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণে তাদেরকে সক্ষম করতে হবে। মামলা চলাকালীন সময়ে যাতে এ সব জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা বুঝতে পারে এবং তাদের বক্তব্য যাতে মামলার সংশ্লিষ্ট ভাষা বুঝতে পারে তা প্রয়োজনবোধে দোভাষীর মাধ্যমে অথবা অন্য কোন কার্যকর উপায়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

(জ) অনুচ্ছেদ ১৩-তে ভূমি অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, (১) কনভেনশনের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সরকার সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ভোগদখলে থাকা কিংবা অন্যভাবে ব্যবহৃত ভূমি বা ভূখন্ড, অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উভয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক, এবং বিশেষ করে এ সম্পর্কিত সমষ্টিগত সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

(ঝ) অনুচ্ছেদ ১৪-তে ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

(১) সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমির উপর মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকন্তু তাদের সম্পূর্ণভাবে দখলাধীন নয় কিন্তু তাদের জীবন ধারণ ও ঐতিহ্যগত কার্যক্রমের জন্য প্রথাগতভাবে প্রবেশাধিকার রয়েছে এমন ভূমি ব্যবহারের অধিকার সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে যাযাবর জাতিগোষ্ঠী ও জুম চাষীদের অবস্থার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

(২) সরকার প্রয়োজন অনুসারে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমি পরিচিহ্নিত করা এবং তাদের মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক দাবিকৃত ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় আইনী ব্যবস্থার মধ্যে পর্যাপ্ত কার্যপ্রণালী গড়ে তুলতে হবে।

(ঞ) অনুচ্ছেদ ১৫-তে প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

(১) সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ভূমির সাথে সম্পৃক্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার বিশেষভাবে রক্ষা করতে হবে।

(২) খনিজ অথবা ভূগর্ভস্থ সম্পদের মালিকানা বা ভূমি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পদের উপর অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভূমি সংশ্লিষ্ট এরূপ সম্পদের আহরণ বা অনুমোদনের পূর্বে এ সব জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থ বিবেচনায় আনবে ও তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। এরূপ কাজের উপকার লাভের অংশীদারী হবে এবং ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলে ক্ষতিপূরণ পাবে।

(ট) অনুচ্ছেদ ১৬-তে ভূমি থেকে উচ্ছেদের বাধা-নিষেধ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

(১) সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

(২) যদি কোন কারণে স্থানান্তর করতে হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিকট হতে মুক্ত, অবহিত ও পূর্ব সম্মতি নিতে হবে।

(৩) স্থানান্তরের প্রক্রিয়া বন্ধ হবার সাথে সাথে তাদের স্ব স্ব ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

(৪) যদি এরূপ প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে সম মানের ভূমি দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী ইচ্ছা প্রকাশ করলে নগদ অর্থ অথবা ভূমি প্রদান করতে হবে।

(ঠ) অনুচ্ছেদ ২০-এ চাকরীতে নিয়োগ ও শর্তাবলী, অনুচ্ছেদ ২১-এ বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অনুচ্ছেদ ২৪ ও ২৫-এ সমাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবা, অনুচ্ছেদ ২৬ ও ২৭-এ শিক্ষার সুযোগ এবং অনুচ্ছেদ ২৮-এ শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

(ড) এ কনভেনশনের ৩৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এ কনভেনশন আইএলও কনভেনশন ১০৭-কে সংশোধন করে।

এ যাবৎ কনভেনশন ১৬৯-এ ২৩ (তেইশ) টি দেশ অনুস্বাক্ষর করেছে। কোন কোন দেশ এ কনভেনশনের আলোকে স্ব স্ব দেশের আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনেক দেশে তা আমলে নেবার প্রক্রিয়া রয়েছে। আবার অনেক দেশ তা এখনো আমলে নেয় নি।

ইউএনড্রিপের মৌলিক অধিকারসমূহ

আদিবাসী জাতিসমূহের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রে (ইউএনড্রিপে) স্বীকৃত অন্যতম মৌলিক অধিকারসমূহ হলোঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার; ভূমি ও ভূখন্ডের উপর অধিকার; আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভূমি ও ভূখন্ডের উপর সামরিক কার্যক্রম বন্ধের অধিকার; মানবিক ও বংশগত (জেনেটিক) সম্পদসহ সাংস্কৃতিক অভিপ্রকাশের উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার; ভূমি ও ভূখন্ডের উপর থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা থেকে আদিবাসীদের রেহাই পাবার অধিকার; সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রথা চর্চা ও পুনরুজ্জীবিত করার অধিকার; মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার; নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠার অধিকার; উন্নয়নের অধিকার প্রয়োগ করবার জন্য অগ্রাধিকার তালিকা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ ও গ্রহণের অধিকার; নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ঔষধি ও স্বাস্থ্য সেবা সংরক্ষণের অধিকার; মুক্ত, অবহিত ও পূর্ব সম্মতি ব্যতিরেকে অধিকৃত ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের পুনরুদ্ধার ও ফেরত পাবার অধিকার; নিজেদের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতি ও নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কাঠামো নির্ধারণ করবার অধিকার; আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদন্ড অনুসারে নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও স্বতন্ত্র প্রথা, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, বিচার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও বজায় রাখার অধিকার।

প্রথম আদিবাসী দশক (১৯৯৫–২০০৪)

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৪৮/১৭৬ রেজুলেশন মোতাবেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ হবে বিশ্বের আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক দশক। অতঃপর ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ঘোষণা দেয় যে, প্রতিবছর ৯ আগস্ট তারিখে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত হবে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ৯ আগস্ট তারিখে। উক্ত দিবসটির স্মরণে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের দিন নির্ধারিত হয়

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বের আদিবাসীদের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক শুরু হয়। এ দশকের যে প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয় তা হল ঃ "Indigenous people: partnership in action" এর সাথে সংগতি রেখে প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক-এর লক্ষ্য ছিল আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন– মানবাধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য – বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা।

প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকে আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লংঘন বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ ও সরবরাহ করা এবং আদিবাসীদের দক্ষতা বাড়ানোর কাজ সম্পাদন ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা অর্জিত হয়। কিন্তু আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে অগ্রগতি সাধিত হতে পারে নি। Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples চূড়ান্ত করা যায় নি।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক (২০০৫– ২০১৪)

২০০৪ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৫–২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১ জানুয়ারী ২০০৫ থেকে দ্বিতীয় দশক শুরু হয়।

এ দশকের জন্য যে প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয় তা হল ঃ "A Decade for Action and Dignity."; অর্থাৎ কাজ ও মর্যাদার জন্য অংশীদারিত্ব। এ প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দশকের জন্য নির্ধারিত পাঁচটি মূল লক্ষ্য হল ঃ

● আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যহীনতার অগ্রগতি সাধন এবং আদিবাসীদেরকে আইন, নীতি, সম্পদ, কার্যক্রম ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তকরণ;

● মুক্ত, অবহিত ও পূর্ব সম্মতির নীতি বিবেচনায় তাদের জীবন-ধারণ, ঐতিহ্যগত ভূমি ও ভূখন্ড, আদিবাসী হিসেবে সমষ্টিগত অধিকার কিংবা তাদের জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রে তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় আদিবাসীদের পরিপূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ উন্নয়ন সাধন করণ;

● উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিসমূহ যেগুলো ন্যায্যতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচ্যুত এবং যেগুলো আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে সম্মান প্রদর্শনসহ সংস্কৃতিগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলো পুনঃসংজ্ঞায়িত করা;

● নির্দিষ্ট মাপকাঠি এবং বিশেষ করে আদিবাসী নারী, শিশু ও যুবদের উপর গুরুত্ব আরোপসহ আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য ইঙ্গিত নীতি, কার্যক্রম, প্রকল্প ও বাজেট গ্রহণ করণ;

● আদিবাসীদের সুরক্ষা ও তাদের জীবনের উন্নতিকল্পে আইনগত, নীতিগত ও কার্যকারিতা সম্পর্কিত শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধন এবং আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা জোরদারকরণ।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক দশকের জন্য নির্ধারিত পাঁচটি মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গ সংগঠন কর্মসূচি হাতে নেয়। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের আইন, নীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন সহায়তা প্রদান করে।

জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন-এর বিধান

২২ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১১–২০২০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালকে জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতিসংঘ দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন এর অনুচ্ছেদ ৮(জে) আদিবাসী জ্ঞান, ভাল অভ্যাস শ্রদ্ধা ও সরংক্ষণ করা, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ন্যায্যতামূলকভাবে বন্টনের জন্য উৎসাহিত করার বিধান তুলে ধরেছে। একইভাবে অনুচ্ছেদ ১০(সি) জীববৈচিত্র্য সম্পদ ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে ব্যবহার ও সংরক্ষণ উৎসাহিত করার বিধান বিবৃত করেছে।

স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র-এর বিধান

স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র সাধারণত সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের নিকট হতে অভিযোগ বা মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত তথ্য পেয়ে থাকলে ও

সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের আমন্ত্রণ পেলে সংশ্লিষ্ট দেশে সফর করতে পারে এবং স্টাডি কাজ চালাতে পারে। এ যাবৎ স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র বিভিন্ন দেশে স্টাডি করে প্রতিবেদন পেশ করেছে। তন্মধ্যে ফিলিপাইনের উদাহরণ অন্যতম। ফিলিপাইন সরকারের আমন্ত্রণে মানবাধিকার কমিশনের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি ও মৌলিক স্বাধীনতা সংক্রান্ত স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র মি. রোদোলফো স্টাভেনহেগেন ২-১১ ডিসেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ফিলিপাইন সফর করেন এবং সরকারী কর্মকর্তা, আদিবাসী ও অন্যান্য সংগঠন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর মানবাধিকার কমিশন-এর নিকট সমস্যাবলী সমাধান সম্পর্কিত সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পেশ করেন। মানবাধিকার কমিশন ফিলিপাইন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। তদনুযায়ী ফিলিপাইন সরকার সেখানকার আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার আইন প্রণয়ন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন অন্যতম।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরাম ২০১০ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একজন স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র নিয়োগ করে। উক্ত স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র ২০১১ খ্রিস্টাব্দে UNPFII-এর ১০ম অধিবেশনে প্রতিবেদন পেশ করেন। উক্ত প্রতিবেদনমূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের সেনা সদস্য ও ইউনিট নিয়োগকালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনের বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য UNPFII সুপারিশ গ্রহণ করে। ঐ রিপোর্ট ২০১২ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসের জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক)-এর অধিবেশনে উত্থাপিত হয় ও তা গৃহীত হয়।

বিভিন্ন দেশ কর্তৃক গৃহীত আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ব্যবস্থা

এ ভাবে ধীরে ধীরে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি, ঘোষণা প্রভৃতি প্রণীত হতে থাকে এবং সে সব বাস্তবায়নের উদ্যোগও নেওয়া হয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা স্থাপিত বা প্রতিস্থাপিত হয়। তবে, বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে কোন কোন রাষ্ট্র কিছুটা অগ্রসর হলেও অনেক রাষ্ট্রে আদৌ বাস্তবায়িত হয় নি। উল্লেখ্য, এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের বা ভূখন্ডের কতিপয় দেশ তাদের দেশের আদিবাসীদেরকে সাংবিধানিকভাবে সরাসরি স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তন্মধ্যে এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, কম্বোডিয়া, আফ্রিকা মহাদেশের ক্যামেরুন এবং আমেরিকা মহাদেশের আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, চিলি, কানাডা, ভেনিজুয়েলা, এল সালভাদর উল্লেখযোগ্য। নেপালসহ আরো কয়েকটি দেশে আদিবাসীদেরকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভারত, উগান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভিয়েতনাম, চীন, বাংলাদেশ প্রভৃতি কয়েকটি দেশে আদিবাসী নাম ব্যবহার না করে ট্রাইব, এথনিক মাইরিটি, ন্যাশনাল মাইরিটি ইত্যাদি নামে আদিবাসীদেরকে বিভিন্ন পরিমাণের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

বলা যায়, কালের গতিতে আদিবাসীদের অধিকার বিভিন্ন দেশে আরো অধিকতর পরিমাণে প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন দেশের জন্য নিযুক্ত স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র কাজ করে চলেছেন। এ বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে স্পেশার র‍্যাপোটিয়র এল সালভাদর সফর করেন ও তার প্রতিবেদনে সুপারিশমালা পেশ করেন। উক্ত সুপারিশমালা অনুসরণ করে এল সালভাদর ১৯ জুন ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান (৬৩ অনুচ্ছেদ) সংশোধন করে সে দেশের আদিবাসীদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। এল সালভাদরের নূতন সংশোধিত ৬৩ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ- "El Salvador recognizes Indigenous Peoples and will adopt policies for the purpose of maintaining and developing their ethnic and cultural identities, cosmovision, values and spirituality." উক্ত সংশোধনী সম্পর্কে এল সালভাদরের প্রেসিডেন্ট সেঞ্চেজ সেরেন বলেছেন, "This is a historic debt that we have to our roots and to our identity."

ঘ। বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী ও আদিবাসী

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষার আদিম অধিবাসী সংক্রান্ত অভিধা বা ধারণাকে জাতিসংঘের মানবাধিকার সম্পর্কিত আদিবাসী বিষয়ক অভিধা বা ধারণা বলে তুলে ধরার অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তা কার্যত বিভ্রান্তিকর ও অসত্য। আইএলও কনভেনশন ১০৭ ও ১৬৯ এর অনুচ্ছেদ ১ (এক)-এ সাধারণভাবে উক্ত দু'টি কনভেনশন কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তা বর্ণিত হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদসমূহ নিম্নরূপঃ

আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এর প্রথম অংশ: সাধারণ পলিসি-এর অনুচ্ছেদ ১-এ উল্লেখ রয়েছে যে-

১। এই কনভেনশন প্রযোজ্য হবে–

(ক) স্বাধীন দেশসমূহের আদিবাসী এবং ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের বেলায়, যাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জাতীয় জনসমষ্টির অন্যান্য অংশের চেয়ে কম অগ্রসর এবং যাদের মর্যাদা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রথা কিংবা রীতি-নীতি অথবা বিশেষ আইন বা প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়;

(খ) স্বাধীন দেশসমূহের আদিবাসী এবং ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ক্ষেত্রে রাজ্য বিজয় কিংবা উপনিবেশ স্থাপনের কালে এই দেশে কিংবা যে ভৌগলিক ভূখন্ডে দেশটি অবস্থিত সেখানে বসবাসকারী অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রেক্ষিতে আদিবাসী বলে পরিগণিত এবং যারা, তাদের আইনসংগত মর্যাদা নির্বিশেষে নিজেদের জাতীয় আচার ও কৃষ্টির পরিবর্তে ঐ সময়কার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচার ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করে।

আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ এর প্রথম অংশ : সাধারণ নীতি এর অনুচ্ছেদ ১.১-এ বলা হয়েছে যে-

১. এই কনভেনশন প্রযোজ্য হবে-

(ক) স্বাধীন দেশসমূহের ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, যাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জাতীয় জনসমষ্টির অন্য অংশ থেকে স্বতন্ত্র এবং যাদের মর্যাদা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রথা কিংবা ঐতিহ্য অথবা বিশেষ আইন বা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়;

(খ) স্বাধীন দেশসমূহের জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, যাদের আদিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয় এই বিবেচনায় যে তারা রাজ্য বিজয় কিংবা উপনিবেশ স্থাপনের কালে অথবা বর্তমান রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের কালে এই দেশে কিংবা যে ভৌগোলিক ভূখন্ডে দেশটি অবস্থিত সেখানে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর বংশধর এবং তারা তাদের আইনগত মর্যাদা নির্বিশেষে তাদের নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন রাখে।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, জাতিসংঘের বিধানাবলী অনুযায়ী যে সকল জাতি (Peoples) বা জনগোষ্ঠী (Populations) 'সেমি-ট্রাইব্যাল' বা 'ট্রাইব্যাল' বা 'ইনডিজেনাস' নামে আখ্যায়িত এবং যাঁদের নিম্ন বর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রণীত আইএলও কনভেনশন ১০৭ ও ১৬৯ প্রযোজ্য হবে– (১) অনগ্রসরতা ঃ যাঁরা সেমি-ট্রাইব্যাল' বা 'ট্রাইব্যাল' বা 'ইনডিজেনাস' নামে আখ্যায়িত এবং National Community অর্থাৎ ক্ষমতাসীন মূল জাতি হতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম অগ্রসর; (২) নিজস্ব প্রথা ও আইন ঃ তাঁদের মর্যাদা বা অবস্থান কম-বেশি তাঁদের নিজস্ব প্রথা, ঐতিহ্য বা বিশেষ আইন বা বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; (৩) ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান ঃ উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠাকালে বা দেশের বর্তমান সীমানা স্থাপনকালে তাঁরা, তাঁদের আইনগত মর্যাদা বা অবস্থান যা-ই হোক না কেন নিজেদের কিছু বা পুরো সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধরে থাকেন এবং (৪) উত্তরসূরী ঃ তাঁরা যে দেশে বসবাসরত বা সে দেশ যে ভূ-খন্ডে (মহাদেশে) অবস্থিত সে দেশের বা ভূ-খন্ডের জাতি বা জনগোষ্ঠীর উত্তরসূরী হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় যেভাবে উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেভাবে প্রত্যক্ষভাবে কোন অঞ্চল বা এলাকা দখল করেনি বা কোন জাতিকে পদানত করে নি। তবে স্মর্তব্য যে, প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে বা মোগল সাম্রাজ্য বা ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির ছোট-বড় অনেক স্বাধীন রাজ্য ছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'ইনডিয়ান স্ট্যাটিটিউটরী কমিশন' ভারতে আসে এবং তখনকার শাসন ও আইন সম্পর্কিত সংস্কার সাধনের জন্য 'ইনডিয়ান স্ট্যাটিটিউটরী কমিশন রিপোর্ট' নামে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করে। ঐ রিপোর্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দু' ধরনের শাসন সংক্রান্ত একক ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ধরনের এককের নাম ছিল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' এবং দ্বিতীয় ধরনের এককের নাম ছিল 'ইন্ডিয়ান স্টেটস্'। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া বেঙ্গল ও বার্মাসহ মোট ৯ (নয়) টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। আর ইন্ডিয়ান স্টেটস্ ছিল ৬০০ (ছয় শো)-এর অধিক। তবে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন যে, কতিপয় প্রদেশ বা রাজ্যের বাইরে সে সময়ে ভারতে ৬০১ (ছয় শো একটি)-এর অধিক দেশীয় রাজ্য অর্থাৎ পূর্বতন ইন্ডিয়ান স্টেটস্ ছিল। অপরদিকে সে সময়ে (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে) পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে) কম করে হলেও ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগেকার ২০ (বিশ) টির অধিক দেশীয় রাজ্য বা পূর্বতন ইন্ডিয়ান স্টেটস্ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বলা যায়, মোগল বা ব্রিটিশ পূর্ব ভারতবর্ষে বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) ব্যতীত ব্রিটিশ ভারতের অপর ৮ (আট) টি প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যসহ অন্ততপক্ষে ৬৫০ (সাড়ে ছয় শো)-টির অধিক রাজ্য ছিল। এ সব রাজ্যে স্ব স্ব জাতির অধিকার ছিল প্রতিষ্ঠিত। এ সব রাজ্যগুলো ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত করে নিয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'-এর ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। এ দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যেই পূর্বেকার সব রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে পাকিস্তানের পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তানে প্রাচীনকালের বঙ্গ রাজ্যের পূর্বাংশ এবং এর প্রতিবেশী কোচ রাজ্য, গারো রাজ্য, খাসিয়া রাজ্য, জয়ন্তিয়া রাজ্য, অহোম রাজ্য, ত্রিপুরা রাজ্য ও চাকমা রাজ্যের অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে স্বাধীনতা লাভ করে। সুতরাং এ থেকে এটি স্পষ্ট যে, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর অধিকৃত বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রাজ্যের অংশ বিশেষ নিয়েই কার্যত বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পূর্বতন বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীগণ বাংলাদেশের অধিবাসী হিসেবে পরিগণিত হন। বলা যায়, বাংলাদেশ বাঙালি ও অন্যান্য কতিপয় জাতিরই দেশ। সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় বাঙালি ও এ সব অন্যান্য কতিপয় জাতির মানুষ বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী (Aborigines)।

তবে উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগ হতে আধুনিক যুগে বিভিন্ন সময়ে ভারত উপ-মহাদেশের অন্য রাজ্য থেকে কিংবা ভারত-উপ-মহাদেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন জাতির কিছু কিছু মানুষ রাজ্য জয় বা ব্যবসা-বাণিজ্য বা জীবন-জীবিকার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে অভিগমন করেন। তাঁরাও বাংলাদেশের অধিবাসী হয়ে যান।

আরো উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বা ভারত উপ-মহাদেশ মানব প্রজাতির উৎপত্তি স্থল নয়। মানব প্রজাতির উৎস স্থল হল মধ্য এশিয়া ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়া। তাই এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের অভিমত হল যে, বাংলাদেশ কিংবা ভারত উপ-মহাদেশে সকলেই আগন্তুক।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে উত্তর ভারতে ও নেপালে মৈথিলী, মগহি ও ভোজপুরী ভাষা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে মগহি ভাষা মাগধী ভাষা নামে আখ্যায়িত হয়। কালক্রমে মাগধী ভাষা বঙ্গ বা বাংলায় বাংলা নামে, উড়িষ্যায় উড়িয়া নামে, আসামে অসমিয়া বা অহমিয়া ভাষা নামে ও চাকমা জাতির নিকট চাকমা ভাষা নামে পরিচিত হয়ে উঠে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষা ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশ ভারত সরকার অনুমতি দেয়। বাংলা ভাষাকে তখনকার মগহি বা মাগধী ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতি তাদের নিজেদের লিখিত ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার ভিত্তিতে বাংলা ভাষা-ভাষী বা বাঙালি জাতির পরিচিতি গড়ে উঠে। তাদের মধ্যে অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলে মুসলমান বা বাঙালি মুসলমান হিসেবে তাদের পরিচিত সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষাকে অনেক জাতি গ্রহণ করলেও তাদের মধ্যেকার কিছু মানুষ তা গ্রহণ করেন নি বা পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া থেকেও তারা বিরত থাকেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হয়েছে। বাঙালি জাতি বাংলাদেশের শাসক জাতিতে পরিণত হন। অপরদিকে এককালের অনেক স্বাধীন জাতি কালক্রমে বিশেষত ভূমি ও পূর্ব পুরুষের আবাসস্থল হারিয়ে জনসংখ্যা কম ও প্রান্তিক জাতিতে বা জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন। জাতিসংঘ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত মানবাধিকরের আলোকে বর্তমানে বাঙালি জাতি বাংলাদেশের National Community বা রাষ্ট্রগত জাতি হিসেবে এবং অপরাপর জনসংখ্যা কম সকল নৃ-তাত্ত্বিক জাতি (যেমন – গারো, খাসিয়া, সাঁওতাল, মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা প্রভৃতি নৃ-তাত্ত্বিক জাতি) যাঁরা দরিদ্র ও প্রান্তিক জাতি বা জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে তাঁরা আদিবাসী হিসাবে আখ্যায়িত হতে পারেন।

চ। বাংলাদেশের বিধানাবলী ও আদিবাসী অধিকার

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা – এ চারটি মূলনীতির ভিত্তিতে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান রচিত হয়।

আদিবাসীদের প্রতি সাংবিধানিক স্বীকৃতি

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এ রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের অনগ্রর অংশের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের বিধান রাখা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ১৫২ বলে 'প্রচলিত আইন' হিসেবে 'পূর্ববঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০' (যা বর্তমানে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ অভিহিত) এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০' সহ অন্যান্য কতিপয় আইনকে বলবৎ রাখা হয়। এ সব আইনে Aborigines, Indigenous hill men, Hill men শব্দাবলী রয়েছে। অর্থাৎ এ সব আইনে বাংলাদেশের বাঙালি জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতিদেরকে সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় ব্যবহৃত আদিম অধিবাসী বা আদিবাসী বলা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখা কর্তৃক স্মারক নং সংস্থাপন (এডি-২)-৩৯/৯১-১৪৩ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ মূলে আইএলও-এর আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনশন ১৯৮৯ (নং ১৬৯)-এর কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রে 'উপজাতি' ও 'আদিবাসী' উভয় শব্দ উল্লেখ করা হয়। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট আইন, ২০১০-এ আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এক কথায়, আদিবাসীদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরোক্ষভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া আছে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪)-এর আলোকেই ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ প্রণীত হয়। এ সব আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিকে 'উপজাতি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে উক্ত তিনটি আইন ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সংশোধন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নামকরণ করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কার্যবিধিমালা, ২০০০ প্রণীত হয়েছে। এ সব আইনে সরকার 'উপজাতি' শব্দের ব্যবহার অব্যাহত রাখে।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২৩(ক)-তে বাংলাদেশের আদিবাসীদেরকে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা হয়েছে। সংবিধানের এ ধরনের কোন পরিচিতিই বাংলাদেশের আদিবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি। জাতিসংঘের আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রে বর্ণিত আদিবাসী পরিচিতিই তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তাদের ইপ্সিত নামেই তাদেরকে অভিহিত করা বাঞ্চনীয়।

আইএলও ১০৭ -এর প্রযোজ্যতা

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন ১০৭-এ অনুস্বাক্ষর করেছে। এ কনভেনশনে বলা হয়েছে ট্রাইবাল, সেমি-ট্রাইবাল বা ইনডিজেনাস নামে যাঁরা অভিহিত তাঁদের ক্ষেত্রে এ কনভেনশন প্রযোজ্য হবে।

সুতরাং দেশের সংবিধানের ২৩(ক)-তে বর্ণিত উপজাতি হিসেবে এবং সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার্যকর বিভিন্ন প্রচলিত আইনে উল্লেখিত Aborigines ও Indigenous hill men হিসেবে যাঁদেরকে অভিহিত করা হয়েছে বা করা হয়ে থাকে তাঁরা আইএলও কনভেনশন ১০৭-এ বর্ণিত সুযোগ-সুবিধাদি উপভোগ করতে পারে এবং সে বিষয়ে সরকারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

আদিবাসী শব্দ ব্যবহার সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ বাতিলকরণ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারের কোন কোন সংস্থা বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক কেবল উপজাতি শব্দটি ব্যবহার করবার এবং আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার না করবার জন্য নির্বাহী আদেশ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাহী আদেশ কখনো সংসদীয় আইন-এর উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। উক্ত ধরনের নির্বাহী আদেশ আইন অনুযায়ী বৈধ হতে পারে না। সে সব আদেশ বা নির্দেশনা আদিবাসীদের বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে এবং আদিবাসীদেরকে সংবিধানের ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের আওতায় একীভূত করবার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে চলেছে। সুতরাং সংবিধানের অধীনে কার্যকর বিভিন্ন প্রচলিত আইন ও সংবিধানের আওতায় প্রণীত বিভিন্ন সংসদীয় আইনের সাথে বিরোধার্থক এবং বিভ্রান্তিকর বিধায় সেসব পত্র বা নির্দেশনা বাতিল করা বাঞ্চনীয়।

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সংক্রান্ত বিধান

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৯৭ ধারায় Aborigines-এর ভূমি Non-Aborigines-এর নিকট হস্তান্তর ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধমূলক বিধান রয়েছে। এ বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করা হয় নি। ফলে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীগণ ভূমি থেকে কালক্রমে উচ্ছেদ হয়েছেন ও হচ্ছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ এখনো কার্যকর রয়েছে। উক্ত শাসনবিধির মূল ৩৪ ধারায় ভূমির উপর ব্যক্তি মালিকানার ও কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমি হস্তান্তরের বিধান ছিল। এ প্রেক্ষিতে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা অধিগ্রহণকল্পে 'The Chittagong Hill Tracts Land Acquisition Regulation, 1958' প্রণীত হয়। পরে ১৯৭১ ও ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সমতলবাসী বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি হস্তান্তরের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০-এর ৩৪ ধারা সংশোধন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৪১এ বিধি অনুযায়ী মৌজার ভূমির উপর মৌজাবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা রয়েছে। মৌজা হেডম্যান প্রয়োজনে বহিরাগত ব্যক্তিকে মৌজার ভূমি বা সম্পদ ব্যবহার করবার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা', 'রক্ষিত বন ব্যতীত অন্যান্য বন' এবং 'পানি সম্পদ' পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী বা বিষয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তা এখনো হস্তান্তর করে নি। অপরদিকে, ভূমি হস্তান্তর ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট পূর্বানুমোদন সংক্রান্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার কিংবা বন বা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা এখনো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি হারানোর প্রক্রিয়ার অবসান হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ২০০১ খ্রিস্টাব্দে সরকার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১' প্রণয়ন করে। তবে চুক্তির সাথে বিরোধার্থক কতিপয় ধারা অন্তর্ভুক্ত থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আপত্তির কারণে সরকার তা আজ অবধি কার্যকর করতে পারে নি। ফলে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরকার ভূমি কমিশন গঠন করলেও তা কাজ করতে পারে নি। বিগত সরকারের আমলে উক্ত আইন সংশোধনের জন্য কিছুটা উদ্যোগ গৃহীত হলেও তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নি। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারিতে নতুন মহাজোট সরকার গঠিত হয়েছে। এ আইনটি সংশোধন বিষয়ে এখনো কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নি।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম বনজদ্রব্য পরিবহণ বিধিমালা (সংশোধন) বিল, ২০১২' ও 'বন আইন (সংশোধন) বিল, ২০১৩' -তে পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাভুক্ত বনাঞ্চলের যথাক্রমে বনজদ্রব্য পরিবহণ ও বনজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ-এর আওতাধীন করার বিধান রাখা হয়েছে। এটি অপরিবর্তিতভাবে সংসদে পাস হলে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি হারানোর প্রক্রিয়া আরো দ্রুততর হবে।

ছ। মানবাধিকার ও ভূমি অধিকার সংক্রান্ত পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নানাবিধ কারণে তুলনামূলকভাবে দেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার লংঘন বেড়েছে। ২০১১-২০১৩ খ্রিস্টাব্দে সমতল অঞ্চলের ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আদিবাসীদের উপর মোট ২৮ (আটাশ) বার সাম্প্রদায়িক আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে এবং ৩৩ (তেত্রিশ) আদিবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

২০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তুলনামূলকভাবে ভূমি জবরদখলকরণ বেড়েছে। সমতল জেলাগুলোতে এ পরিমাণ হল ১০৩ বিঘা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৩,৭৯২ একর (তন্মধ্যে ৭৫ একর সরকার কর্তৃক ও ৩,৭১৭ একর পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের ব্যক্তি বিশেষ, এনজিও এবং ব্যবসায়ী ফার্ম কর্তৃক জবরদখল বা অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ২৬ (ছাব্বিশ) টি আদিবাসী পরিবার ঘর ছাড়া হয় ও সমতল জেলার ২৪ (চব্বিশ) টি সহ ১,০৬২ (এক হাজার বাষট্টি) আদিবাসী পরিবার উৎখাত হবার অবস্থার মুখোমুখী হয়। ২০০৯-২০১৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হতে ভূমি ও অন্যান্য কারণে নিগৃহীত হয়ে প্রায় ২০০ আদিবাসী পরিবার প্রতিবেশী দেশ ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ভূমি জবরদখল প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়েছে। বিগত জানুয়ারি–জুন মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০৪.০৩ একর ভূমি জবরদখল বা দখলের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, ৯৫ টি আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে। সমতল অঞ্চলের ৯৭ টি পরিবার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৩৮৯ টি পরিবার উচ্ছেদের হুমকির মুখে রয়েছে।

দেশের সমতল অঞ্চলের জেলাসমূহে বহু আগেই আদিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে এবং পূর্ব-পুরুষের ভূমি ও আবাসস্থল তাদের বেহাত হয়ে গেছে। সম্ভবত নেত্রকোণা উপজেলায় তুলনামূলকভাবে আদিবাসীদের বসবাস এখন সবচেয়ে বেশি এবং সেখানেও তাদের জনসংখ্যার অনুপাত মাত্র ৩০%।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি উত্তরকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরকারের ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার উন্নয়ন সহায়তার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাহ্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ স্থানীয় আদিবাসী বা জুম্মদের সাথে অস্থানীয় বাঙালিদের মধ্যেকার জাতিগত সংঘাত কমেছে ও পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কার্যত তা মোটেই সঠিক নয়।

চুক্তি-উত্তরকালে বিশেষ করে ২০০৭-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পুনরায় চুক্তি পূর্বকালের পদ্ধতিতে সমতল অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং অনেকটা বাধাহীনভাবে জমি জবরদখল চলছে। পরিণতিতে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আদিবাসী ও আদিবাসী নয় এমন জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৫৫% ও ৪৫% এবং বর্তমানে তা হয়েছে ৫১% ও ৪৯%। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২৫ (পঁচিশ) টি উপজেলার মধ্যে ৭ (সাত) উপজেলায় (নাইক্ষংছড়ি, আলিকদম, লামা, লংগদু, রামগড়, মানিকছড়ি ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায়) সমতল চাষযোগ্য ভূমি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আদিবাসীদের হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং উক্ত উপজেলাসমূহে আদিবাসীগণ জনসংখ্যাগতভাবেও নিরঙ্কুশ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক-পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক এ বছর শেষ হতে চলেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কনভেনশন, ঘোষণা ইত্যাদি প্রণীত হলেও সেসব এখনো সব দেশে বাস্তবায়িত হয় নি। এ প্রেক্ষিতে বিগত মে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের অধিবশনে জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক ফোরাম ২০১৫-পরবর্তী গ্লোব্যাল উন্নয়ন পরিকল্পনায় আদিবাসীদের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবার দাবি তুলে ধরেছে।

গত সেপ্টেম্বরে (২০১৪) আদিবাসী বিষয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি উচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হয়েছে– যা আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন নামে অভিহিত করা হয়। উক্ত সম্মেলনে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ তাদের অঙ্গীকার পুণর্ব্যক্ত করেছে। তারই আলোকে আউটকাম ডকুমেন্টস সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে।

২০১৫-উত্তর উন্নয়ন প্রক্রিয়া

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-এর সময়কাল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ এর লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জিত হয়নি। তাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচী বা লক্ষ্য কি হতে পারে তা নির্ধারণের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য বিষয়ক ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ Open Working Group on Sustainable Development Goals (SDGs) এবং আলোচনা-পর্যালোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ওয়ার্কিং গ্রুপ ইতোমধ্যে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত প্রভৃতি সম্পর্কিত ১৭ টি স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য সুপারিশ করেছে।

জ। সুপারিশ / করণীয়

১। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। বাংলাদেশ আদিবাসী বিষয়ক ককাস কর্তৃক পেশকৃত 'বাংলাদেশ আদিবাসী অধিকার আইন, ২০১৩-এর খসড়া' সরকার কর্তৃক জাতীয় সংসদে পাস করা। আদিবাসী শব্দ ব্যবহারের উপর সরকারী কর্তৃপক্ষ হতে নিষেধাজ্ঞামূলক যে সব নির্বাহী আদেশ দেওয়া হয়েছে তা বাতিল করা।

২। সমতল অঞ্চলে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আলাদাভাবে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও কমিশন গঠন করা।

৩। আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১০৭-সহ সকল আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণাপত্র যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

৪। আইএলও কনভেনশন ১০৭ ও ১৬৯ এবং ২০০৭ সালে গৃহীত জাতিসংঘ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র অনুযায়ী আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

৫। সরকার কর্তৃক আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনশন, ১৯৮৯ (নং ১৬৯) অবিলম্বে অনুস্বাক্ষর করা ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র (ইউএনড্রিপ)-কে সমর্থন করা।

৬। জাতীয় পর্যায়ের সেক্টোরাল পলিসিগুলোতে আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে তা সংশোধন করা।

৭। বাংলাদেশ সরকারি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, জুডিসিয়াল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিস প্রশিক্ষণমালায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাসহ আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

৮। পার্বত্যাঞ্চলের ৩টি সংসদীয় আসনসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসীদের জন্য জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা।

৯। সময়সূচি ভিত্তিক পরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবিলম্বে যথাযথ বাস্তবায়ন করা এবং ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনা সদস্য ও ইউনিট নিয়োগ বিষয়ে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের যে সুপারিশ গৃহীত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা।

১০। আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল এবং আদিবাসী অঞ্চলে বা গ্রামে আদিবাসী নয় এমন লোকের অবৈধভাবে বসতি স্থাপন বন্ধ করা।

১১। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগের দায়িত্ব পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ে আলাদা ডিভিশন গঠন করে ন্যস্ত করা ।

১২। আদিবাসীদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার দেওয়া। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করা। আদিবাসী অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে আদিবাসী শিক্ষক নিয়োগ করা।

১৩। আদিবাসী অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে আদিবাসীদের মতামত গ্রহণ করা এবং প্রকল্পে আদিবাসীদের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আদিবাসীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই, এ রকম উন্নয়ন পদক্ষেপ আদিবাসী অঞ্চলে গ্রহণ না করা।

১৪। জাতিসংঘ ঘোষিত ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা।

১৫। স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি)-এ আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা।

ফারুয়া সফরের কিছু অনুভূতি

মোনালিসা চাকমা

দিনক্ষণ মনে নেই, তবে গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার দুর্গম ফারুয়া ইউনিয়নে সাংগঠনিক সফরে যাওয়ার হঠাৎ একটা সুযোগ এলো। রাঙামাটি শহরের ব্যস্ত গোলমেলে জীবনের চাইতে গ্রামের শান্ত, নিবিড় পরিবেশ, গ্রামের মানুষের অকৃত্রিম আন্তরিকতা আমাকে বেশি টানে। তাই এই সুযোগ হাতছাড়া না করে ফারুয়া অভিমুখে রওনা দিলাম ২০ সেপ্টেম্বর সকাল বেলা। সাথে সফরসঙ্গী সমতলের আদিবাসী এবং কাপেং ফাউন্ডেশনের গবেষণা সহযোগী মাণিক সরেন, তিনি সাঁওতাল জাতির লোক। এছাড়া আরও ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য ত্রিজিনাদ চাকমা। এর আগে এই ধরনের সাংগঠনিক সফরে যাওয়ার সুযোগ খুব একটা হয়নি। তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম ফারুয়া কখন পৌছব। পথিমধ্যে একরাত বিলাইছড়ি সদরে অবস্থান করলাম। পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল আটটায় বিলাইছড়ি থেকে যাত্রা করলাম ফারুয়া অভিমুখে। বিলাইছড়ির জনসংহতি সমিতির থানা কমিটির সহ-সভাপতি রাহুলবাবু আর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিলাইছড়ি থানা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক উত্তম চাকমাও আমাদের সহযাত্রী হলেন।

মাথার উপরে নীল আকাশ আর ঝকঝকে রোদ্দুর, চারিদিকের সবুজ পাহাড়ে চোখ জুড়িয়ে যায়। এত সুন্দর মনোরম পরিবেশ, অথচ পাহাড়ে এত অশান্তি! এইসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখি–আমাদের বোটটা একটা আর্মী ক্যাম্পে ভিড়ছে। বোট থেকে এক দৌড়ে একটা ছেলে টিলার উপবে চেকপোস্টের খাতাটায় এন্ট্রি করিয়ে পরক্ষণে ফিরে এল। আমাদের বোট আবার চলতে শুরু করল আগের মত।

পথিমধ্যে বেশ কয়েকটা ক্যাম্প অতিক্রম করলাম। অদ্ভুত হলেও সত্যি যে, যতবারই একটা করে ক্যাম্প অতিক্রম করছি, তার আশেপাশের এলাকা জুড়ে সেটেলার বাঙালিদের ঘরবাড়ি! যাওয়ার পথে ত্রিজিনাদ দাদার কাছ থেকে জানলাম, এই অঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়িদের জীবনযাপন, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সংগ্রামের ইতিহাস।

মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে যে চারটি রিজার্ভ ফরেস্ট রয়েছে তার মধ্যে ফারুয়া ইউনিয়ন হলো রেইংখং রিজার্ভ ফরেষ্টের অধীন। ব্রিটিশ উপনিবেশ কাল থেকেই এই অঞ্চলকে রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর এ অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর থেকেই রাষ্ট্রীয় মদদে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সমতলের লোকদের এখানে বসতি প্রদান করা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বসতি প্রদান চলছে। অথচ ব্রিটিশ প্রবর্তিত বন আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ফরেষ্টের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ নিষেধ। শুধুমাত্র আদিকাল থেকে পাহাড়ে বসবাসরত আদিবাসীরাই জীবনযাত্রার প্রয়োজনে এই প্রাকৃতিক বন ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সেনাশাসনের দৌরাত্মে পাহাড় আজ পাহাড়ি জুম্মদের নয়, বরং দিন দিন বহিরাগত সেটেলারদের ভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

বেলা ১১:৩০ টা নাগাদ ফারুয়া পৌছলাম। এখানে জনসংহতি সমিতির ইউনিয়ন শাখার সভাপতি বঙ্কিম চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হল। বঙ্কিম দাদা একজন হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ। তিন সন্তানের জনক। মননে, চিন্তায়, চেতনায় একেজন সত্যিকারের সংগ্রামী সদস্য। এছাড়া আরেকজনের কথা না বললেই নয়। তিনি হচ্ছেন রাহুলবাবু। তিনি একজন প্রবীন পার্টি সদস্য ও সাবেক গেরিলা এবং বর্তমান অবধি তিনি এলাকায় পার্টির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। পার্টির প্রতি তার যে চিরন্তন আনুগত্য তা থেকে আমাদের নতুন প্রজন্ম অনেক কিছু শিখতে পারে। গোটা সফরে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন বিধায় তার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয়। সত্যিকার দুর্ধর্ষ এই গেরিলাদের জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন বীরত্ব আর গৌরবময় তেমনই বৈচিত্রে ভরপুর। চমকপ্রদ এমন কিছু কিছু অভিজ্ঞতার বর্ণনা তিনি করেছেন যা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি।

আমাদের সাংগঠনিক সফরের মূল কার্যক্রম শুরু হয় ২১ সেপ্টেম্বর। ফারুয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণ করা, পার্টি ও পার্টির অঙ্গ সংগঠনের সাংগঠনিক শক্তি ও গণসংগঠন সুদৃঢ়করণই হল এই সফরের মূল উদ্দেশ্য। আমরা প্রথমে গেলাম মন্দিরা ছড়া। এরপর পর্যায়ক্রমে সাবাতলি, পানছড়ি, গবছড়ি, জগনাছড়ি এবং সর্বশেষ তারাছড়ি। এই সমস্ত গ্রামের সাধারণ মানুষদের সাথে আলাপ- আলোচনায় তারা তাদের কতগুলি মৌলিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

যেমন–চিকিৎসা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম অবকাঠামো দরকার তা সরকার কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। অর্থাৎ গোটা সফরের রূপরেখার চিত্র ধরে মৌলিক যে কতগুলি সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তাতে সমগ্র ফারুয়া অঞ্চলের দূর্বিষহ অবস্থা প্রতিফলিত হয়। এখানকার জুম্ম জনগণের নগ্ন পায়ে ষড়যন্ত্রের শেকল পরিয়ে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। অধিকারের নামে প্রহসন, সার্বভৌমত্ব ও নিয়ম-শৃঙ্খলার নামে নিরাপত্তার বেড়াজালে আবদ্ধ রাখা, উন্নয়নের নামে ভূমি লুণ্ঠন আর শোষণ-নিপীড়ন চলছে যুগ যুগ ধরে এখানেও।

সরকার সারা দেশে উন্নয়নের মশাল নিয়ে বড় বড় কথা বলে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কোথায়? কই এখানে তার লেশমাত্র চোখে পড়ে না! গ্রামের পর গ্রাম ঘুরলাম, কিন্তু এমন কোন বিদ্যালয় পেলাম না যা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ও পরিচালিত। যে কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তাও নাকি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার অর্থায়নে নির্মিত ও পরিচালিত। এত বড় ফারুয়া অঞ্চলে মাত্র একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। গোটা বিলাইছড়ি উপজেলায় একটি কলেজ রয়েছে তাও ছাত্র ও শিক্ষকের অভাবে প্রায়ই বন্ধ থাকে। অথচ রাঙ্গামাটিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ প্রেক্ষাপট, জাতিগত স্বাতন্ত্র্যতা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি কোন কিছুই বিবেচনায় না নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য মাত্র ২০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অথচ এটা হওয়া উচিত ছিল ৮০ শতাংশ সংরক্ষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন হল, কে পড়বে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজে? যেখানে পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার যথাযথ অবকাঠামো পর্যন্ত নেই, এমনকি যেখানে তিন পার্বত্য জেলা তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ চলছে শিক্ষক, অবকাঠামো ও শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি নানা সংকটের মধ্যে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর বৈ কিছু নয়।

এছাড়া পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসীদের যে ভূমি সমস্যা তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিশেষত রাষ্ট্রীয় মদদে সেনাবাহনীর সহায়তায় বহিরাগত মুসলিম বাঙালিদের অনুপ্রবেশ পাহাড়ের সার্বিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। এমতাবস্থায় পাহাড়ি আদিবাসীদের স্বকীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবনধারার উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বোপরি এখানকার আদিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মান মোটেও সন্তোষজনক বলা যায় না। রাষ্ট্রযন্ত্রের উগ্র জাতীয়তাবাদ, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও অগণতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে পাহাড়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠী আজ উপেক্ষিত, বঞ্চিত। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের সম্ভাবনার দুয়ারকে রুদ্ধ করে বাংলাদেশ সরকার কি নিজের সম্ভাবনাকেও ধ্বংস করছে না? আজ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ভাগ কর শাসন কর নীতির মাধ্যমে ষড়যন্ত্রের যে নীল-নকশা বাস্তবায়ন করছে জুম্মদের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য, তা না করে যদি জুম্মদের অস্তিত্ব বিকশিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করত তাহলে দেশের সংহতি আরও সুদৃঢ় হত, দেশের সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র আরও সমৃদ্ধ হতে পারত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মত ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর যুগ যুগ ধরে শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাসের পট পরিবর্তনে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে।

ফারুয়া অঞ্চল রেইংখং রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় হওয়ায় এখানকার যে বাস্তবতা তা পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন। আমরা জানি যে, কাপ্তাই বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের হাজার হাজার একর কৃষিজমি পানির নীচে তলিয়ে গেছে। তাই জুমচাষ এবং পশুপালন ফারুয়া অঞ্চলের সাধারণ মানুষের প্রধান জীবিকা। এছাড়াও প্রাকৃতিক বনের উপর এ অঞ্চলের মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল। কিন্তু মুষ্টিমেয় সংকীর্ণ স্বার্থবাদী ব্যবসায়ীর দৌরাত্ম্যে সেই প্রাকৃতিক বন আজ উজাড় প্রায়। ফলে একদিকে যেমন জীবন-জীবিকার উপর প্রভাব পড়ছে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, সহ্য করতে হয় বন বিভাগের কর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনীর নানা নিপীড়ন ও হয়রানি। ফলত ফারুয়া অঞ্চলের আদিবাসীদের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন।

জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা না থাকার দরুন শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, পুষ্টিহীনতা, দারিদ্র্যতা ইত্যাদি এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রের শোষণ-বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার সর্বাগ্রে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর যেন কোন ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নেই। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে এই অঞ্চলের যুব সমাজের মধ্যে এখনও পর্যন্ত যথাযথ নেতৃত্ব বিকশিত হতে পারেনি। ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজ করছে নেতৃত্ব সংকট। অথচ সর্বাগ্রে পিছিয়ে পড়া এই মানুষদের দরিদ্র্য, অশিক্ষা, অর্থনৈতিক পরাধীনতা জন্মগত নয়, বরং রাষ্ট্রশক্তির নীতি-নির্ধারকদের সুনিপুণ ষড়যন্ত্রের ফলেই তাদের এই দুরবস্থা।

সরকারের এই বৈষম্যের ফলে জুম্ম জনগণ যে আজ অসহায়, অবহেলিত ও বঞ্চনার শিকার তার কারণ তারা বাঙালি নয়। আমাদের ভাষা, রীতি-নীতি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জীবনধারা সম্পূর্ণ আলাদা। রাষ্ট্রশক্তির পরিচালিত সেনাশাসনের নিপীড়ন-নির্যাতনে আমাদের অস্তিত্ব আজ সংকটাপন্ন। এই সংকটময় মুহূর্তে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে যুব সমাজকে। সাম্যবাদী নীতি-আদর্শে বলিয়ান হয়ে সঠিক নেতৃত্বদান করে জুম্ম জাতিকে এ সংকট থেকে বাঁচাতে হবে। সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ও শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিহত করতে হবে। তাহলেই সমাজ ও জাতি এই বিভীষিকাময়, কালো অন্ধকার থেকে আলোর পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে; ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে আসবে জাতীয় মুক্তি অর্জিত হবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার।

মানবেন্দ্র, একজন রাজনীতির কবি

আনন্দ জ্যোতি চাকমা

১০ নভেম্বর ১৯৮৩, ভয়াল এক কালো রাত,
অসীম আকাশের উল্কার মতো
হিংসার রোষানলে হঠাৎ খসে পড়লো এক উজ্জ্বল নক্ষত্র;
যে নক্ষত্রের আলোর বিচ্ছুরণে
আলোকিত হতো সামন্ত প্রথার নিগড়ে আবেষ্টিত
একটি সমাজ-একটি জাতি-জুম্ম জাতি।।

তখন নীরব নিস্তব্দ মিশকালো অন্ধকার,
কে জানতো এমন পাশবিকতায় উন্মত্ত হয়ে
তোমার নিষ্পাপ উদারতায় ভরা বিশালাকার বুক
বুলেট আর বেয়নেটের নির্মম কষাঘাতে ঝাঁঝড়া করে দেবে
ঘাতকের দল?
কে জানতো হায়েনারা সেদিন তোমার রক্তে হোলি খেলার
উৎসবে মেঠে উঠবে?
ইতিহাসের এমন জঘন্য হত্যাযজ্ঞ যেন
মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়;
জাতি তোমাদের কখনো ক্ষমা করবে না।।

স্বপ্নচারি অগ্রজ পথিক তুমি
ঘাতকেরা তোমার প্রাণস্পন্দন থমকে দিলেও
তোমার সংগ্রামের গতিপথ রুদ্ধ করতে পারেনি।।
তাই আজও নিপীড়িতের প্রতিটি ঘরে
ভূমিষ্ট নব জাতকের আর্তনাদে
তোমার প্রতিধ্বনি শুনি, তোমার প্রতিধ্বনি।।

সামন্তবাদ- সাম্রাজ্যবাদের রণ হুঙ্কারে যখন
সারা পৃথিবী কম্পমান;
লেনিন, স্ট্যালিন, সান ইয়েৎ সেন, মাও কিংবা চে গুয়েভারার মতো
অন্ধকারের ধূম্রজাল ভেদ করে
শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে তুমি;
শোনালে তোমার অমোঘ বজ্র বাণী।।
তোমার মৃত্যু তোমাকে করেছে মহান, তুমিই রাজনীতির কবি।।

আহ্বান

জুয়েল চাকমা

আহা! কি সুন্দর না দেখতে!
এখানে মেঘেরা খেলা করে
যেয়ো কোন একদিন, শীতকালে
মেঘও ধরতে পারবে নিজ হাতে
অপূর্ব! কি অপূর্ব না দেখতে!

বলছি আমি, সখী আমার,
এই সেই নীলগিরি নীলাচল, দেখতে যেয়ো
ইচ্ছে হবে করুণ সুরে বাঁশি বাজাতে
দেখতে পাবে শঙ্খ নদীকে সাপের রূপে
পাখির কিচির মিছির গান হৃদয় খানি ভরিয়ে দেবে
বলছি আমি, সখী আমার, যেয়ো তুমি ঐখানে।

সখী, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে
ছল ছল চোখের পানি বাড়িয়ে প্রশ্ন আমার
শুধু এতটুকু দেখলে?
দেখতে পাওনি উচ্ছেদের হোলি খেলা?
শুধু পাখির কিচির মিছি গানই শুনলে
শুনতে পাওনি ম্রো মায়ের নীরব কান্না?
কুমুলাং উৎসবে ম্রো তরুণীর অপ্সরার সাজ
তরুণীর সাজে তরুণের মনজয়ী বাঁশির সুর
শুনতে পাওনি সে বাঁশিতে বিচ্ছেদের করুণ ধ্বনি?
লোকজ সাংস্কৃতিক উৎসব, সেতো এক এলাহী ব্যাপার
নীলগিরি নীলাচলে, কুমুলাং উৎসব যেন সেকেলে
সংস্কৃতি যে জাতির অঙ্গ, অস্তিত্বের জানান
শুনতে পাওনি অস্তিত্বে সংকটের প্রতিধ্বনি?

সখী, আনন্দের নয় বেদনার চোখেও পরখ কর
শুধু নিজের চোখে নয়, ম্রো মায়ের চোখেও অনুভব কর
নীলাচলের দিকে নয়, সামগ্রিক দিকে প্রদক্ষিণ কর
খুঁজে পাবে অস্তিত্বের ঠিকানা
বেছে নিতে হবে মুক্তির দিশা।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

শরৎ জ্যোতি চাকমা

চির বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা,
এই দেশে তোমার হিংসাদ্বেষ বিহীন সমাজতন্ত্র শুধু রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি
সাদা কাগজে লিখিত সংবিধানের চারি মূলনীতির একটি।
এখনো নিষ্পেষিত তোমার গরীব কৃষক, তাঁতি, রিক্সাচালক, ভিক্ষুক, শ্রমিক, বাস্তুহীন অসংখ্য নরনারী
পদ্মা মেঘনা যমুনা পাড়ের অসংখ্য জেলের বেদনার ইতি ঘটেনি,
খোলা আকাশে তাকিয়ে নক্ষত্র মন্ডলীর কাছে জীবনের প্রার্থনা করে।
বঙ্গবন্ধুর এই বাংলায় বিকৃত হয় সংবিধান-
ধর্ম নিরপেক্ষতা ছিনতাই হয়ে রাষ্ট্র ধর্ম হয় ইসলাম
জাতীয়তাবাদে যোগ হয় উগ্র বাঙালিত্ব, গণতন্ত্রের নামে চর্চা হয় স্বৈরতন্ত্র
আত্মপরিচয়ের বঞ্চনায় আদিবাসী, পথের দিশা হারায় এ দেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান।
এখানে অধিপতির প্রভূত্বে শোষিতের জীবনে অন্ধকার নামে
নীরবে কেঁদে যায় তোমার স্বপ্নের সবুজ পাহাড়।
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা,
তোমার প্রিয় বরগাং এখনো বয়ে যায় আপন স্রোতে বেদনার্থ হৃদয়ে
ভেসে নিয়ে যায় নিযুত জনের চোখের অশ্রু
তোমার চেঙ্গি মেয়োনি কাজলং শংঙ্খ মাতামহুরির তীরে নিষ্পেষিত লাখো জনতার প্রাণাকুতি
চির বঞ্চিত জাতিগুলোর আর্তচিৎকার তাজিনঢং ঘুরে ফুবামোন হয়ে আলুটিলা অতিক্রম করে সৃষ্টি করে প্রতিধ্বনির
কাঁদে মানবতা, হাসে শোষক আর এক ঝাঁক স্বজাতির দালাল
তোমার চেতনার দাবানলে ছাড়খার হোক সমস্ত জঞ্জাল, নির্মল সমীরণে পত্র পল্লবের ঢেউ খেলে যাক পাহাড়ে।

বিশেষ প্রতিবেদন

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর ঐতিহাসিক জয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের তালবাহানার বিরুদ্ধে আপামর জনগণের ক্ষোভের বহি:প্রকাশ

বিজয়ের পর ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ে জয়সূচক চিহ্ন দেখাচ্ছেন উষাতন তালুকদার এমপি। সঙ্গে ছিলেন জনসংহতি সমিতির জ্যেষ্ঠ সদস্যবৃন্দ।

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৪ দেশের দশম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের অংশগ্রহণ ব্যতীত অনেকটা একতরফাভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের একক অংশগ্রহণ ছিল। উল্লেখ্য যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট নির্দলীয় সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি করে। ইতিপূর্বে ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকার উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে। ফলশ্রুতিতে নির্বাচন কমিশন শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়। পক্ষান্তরে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত না হওয়ার কারণে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট এ নির্বাচন বর্জন করে এবং প্রতিরোধের ঘোষণা করে।

নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবুদ্দিন আহমেদ ২৫ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের মধ্য দিয়ে দশম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন। উক্ত ভাষণে তিনি ২ ডিসেম্বর ২০১৩ সর্বশেষ মনোনয়নপত্র পেশ, ৫-৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহার এবং ৫ জানুয়ারি ২০১৪ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে তার পরদিন থেকে বিএনপি জোট প্রথম দফায় ৪৮ ঘন্টার অবরোধ ঘোষণা করে, যা পরবর্তীতে নির্বাচনকালীন সময়ে দফায় দফায় বাড়ানো হয়। ক্ষমতাসীন দল ও তৎকালীন বিরোধী দলের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকো ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় আসেন। তিনি দু পক্ষের সাথে ম্যারাথন সংলাপ করেও দু পক্ষকে সমঝোতায় নিয়ে আসতে পারেননি। এমতাবস্থায় বিএনপি জোটের প্রতিরোধের মুখে হরতাল-অবরোধ, ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোট কেন্দ্রে হামলা ও অগ্নিসংযোগ, ভোটদানে ভোটারদের বাধাদান ও ব্যাপক সহিংসতার মধ্য দিয়ে সারাদেশে ৫ জানুয়ারি একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জনসংহতি সমিতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সদস্যবৃন্দ উষাতন তালুকদার এমপিকে পুষ্প স্তবক প্রদান করছেন।

দেশব্যাপী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অংশ হিসেবে তিন পার্বত্য জেলার তিনটি সংসদীয় আসনের নির্বাচনও বিএনপি জোটের অংশগ্রহণ ছাড়া অনুষ্ঠিত হয়। সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ২ নভেম্বর ২০১৩ সংসদ নির্বাচন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জনসংহতি সমিতি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীতা প্রদানের জন্য জনসংহতি সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়। তিন আসনের মধ্যে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও পার্বত্য বান্দরবান সংসদীয় আসনে জনসংহতি সমিতির প্রার্থী এবং পার্বত্য খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী প্রদানের সমঝোতা প্রস্তাব করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন বলে জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও প্রার্থী দেয়ার সময় আওয়ামী লীগ জনসংহতি সমিতির সাথে কোন যোগাযোগ করেনি এবং তিন পার্বত্য জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগের এককভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে।

অপরপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদারকে (হাতি প্রতীক) দাঁড় করানো হয় এবং সমিতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেয়া সমঝোতা প্রস্তাব অনুসারে ২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে (নৌকা প্রতীক) সমর্থন প্রদান করা হয়। অন্যদিকে ৩০০ পার্বত্য বান্দরবান আসনে জনসংহতি সমিতি প্রার্থীতা প্রদান থেকে বিরত থাকে। আওয়ামী লীগ পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান আসনে যথাক্রমে দীপঙ্কর তালুকদার ও বীর বাহাদুর উশৈসিংকে প্রার্থী হিসেবে (নৌকা প্রতীক) দাঁড় করায়। পার্বত্য বান্দরবান আসনে বীর বাহাদুরের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা (টেবিল ঘড়ি) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনে উষাতন তালুকদার ও দীপঙ্কর তালুকদার ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সমঅধিকার আন্দোলনের রাঙ্গামাটি জেলার একাংশের সভাপতি এড. আবছার আলী আনারস প্রতীক, সংস্কারপন্থীদের স্বতন্ত্রপ্রার্থী সুধাসিন্ধু খীসা বই প্রতীক, ইউপিডিএফের সচিব চাকমা উড়োজাহাজ প্রতীক এবং জাতীয় পার্টির রাঙ্গামাটি জেলা সদস্য ডা. রূপম দেওয়ান লাঙ্গল প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে সচিব চাকমা ও রূপম দেওয়ান এই দুই প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় থাকেননি। ইউপিডিএফ তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় না গিয়ে সুধাসিন্ধু খীসাকে সমর্থন দিয়ে কৌশলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায়। তবে সর্বশেষ উষাতন তালুকদার ও দীপঙ্কর তালুকদারের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। পার্বত্য বান্দরবান আসনেও বীর বাহাদুর ও প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা ছাড়াও আওয়ামী লীগের আরেক বিদ্রোহী প্রার্থী মো: কামরুজ্জামান টোটা পাখি প্রতীক এবং ইউপিডিএফের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা হাতি প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পার্বত্য খাগড়াছড়ি আসনে আওয়ামী লীগের কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ছাড়াও ইউপিডিএফের প্রসিত বিকাশ খীসা হাতি প্রতীক ও উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা টেবিল প্রতীক, সংস্কারপন্থীদের স্বতন্ত্র প্রার্থী মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা বই প্রতীক এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী সোলায়মান আলম শেঠ লাঙ্গল প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সারাদেশে একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসনে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে তিনটি পার্বত্য আসনের মধ্যে ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার ও জনসংহতি সমিতির স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাতন তালুকদারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে।

পার্বত্য খাগড়াছড়ি আসনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের অস্ত্রের মুখে ভোটারের হুমকি-ধামকি সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতির সমর্থনের জোরে আওয়ামী লীগের প্রার্থী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হন। উক্ত আসনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ইউপিডিএফের প্রসিত বিকাশ খীসার প্রাপ্ত ৬৬,৭০০ ভোটের বিপরীতে কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ৯৯,০৫৮ ভোট পেয়ে জয়যুক্ত হন। পার্বত্য বান্দরবান আসনে জনসংহতি সমিতি প্রার্থীতা প্রদান না করলেও আওয়ামী লীগের প্রার্থী বীর বাহাদুর উশৈসিং এবং বিদ্রোহী প্রার্থী প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে এগোতে থাকে। কিন্তু নির্বাচনের দিনে এক পর্যায়ে প্রশাসনের

ছত্রছায়ায় বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ৪৩টি ভোট কেন্দ্রে প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব, সরকার দলীয় প্রার্থী বীর বাহাদুরের লোকজনের কেন্দ্র দখল ও অবাধ জালভোটের মাধ্যমে বীর বাহাদুর উশৈসিং জয় ছিনিয়ে নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ৫ জানুয়ারি তাৎক্ষণিকভাবে দেয়া লিখিত অভিযোগে প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা উল্লেখ করেন যে, উল্লেখিত ৪৩টি কেন্দ্রে তাঁর এজেন্টদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের সম্মুখে আওয়ামী লীগের বীর বাহাদুরের কর্মী ও সন্ত্রাসীরা ব্যালট ছিড়ে নৌকা মার্কায় সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে। ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য হিসেবে প্রশাসনকে প্রভাবিত করে এবং অর্থ ও পেশীশক্তির জোরে তিনি এই ভোট জালিয়াতি করতে সক্ষম হন বলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা মিডিয়ার কাছে অভিযোগ করেন। বান্দরবান জেলা শহর এবং লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ভোটারের উপস্থিতি কম দেখা গেলেও সবচেয়ে বেশি ভোট কাস্টিং দেখা গেছে ঐ চার উপজেলায় হয়েছে, যা ভোটারের উপস্থিতির সঙ্গে কাস্টিং হওয়া ভোটের সঙ্গতিহীনতাই এই ভোট জালিয়াতির প্রমাণ বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার প্রাপ্ত ৩৩,০২৯ ভোটের বিপরীতে বীর বাহাদুর ৬১,৯৯২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

বিজয়ের পর বিভিন্ন স্তরের জনগণের শুভেচ্ছায় সিক্ত উষাতন তালুকদার

২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনে জনসংহতি সমিতির স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাতন তালুকদার মোট ৯৬,২৩৭ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দীপঙ্কর তালুকদারকে ১৮,৮৫২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। দীপঙ্কর তালুকদার পেয়েছিলেন ৭৭,৩৮৫ ভোট। পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনে ভোট কাস্টিং ছিল ৫৬.৬ শতাংশ। এই আসনে এই দুই প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল একদিকে অর্থ, ক্ষমতা ও পেশী শক্তির দাপট আর অন্যদিকে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অব্যাহত তালবাহানা এবং দীপঙ্কর তালুকদারের চুক্তি পরিপন্থী ভূমিকার প্রতি পার্বত্য রাঙ্গামাটিবাসীর তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিশোধের স্পৃহা। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য দীপঙ্কর তালুকদার অর্থ, ক্ষমতা ও পেশী শক্তির ব্যবহার ছাড়াও জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা এবং পাহাড়ি-বাঙালির বিভাজনের মতো কদর্যতারও আশ্রয় নিয়েছিলেন। ২৫ ডিসেম্বর বুধবার বিকেলে রাঙামাটি শহরের রিজার্ভ বাজার এলাকায় নির্বাচনী ক্যাম্প উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী দীপঙ্কর তালুকদার বলেন, "হাতি মার্কায় (উষাতন তালুকদারকে) ভোট দিলে পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত বাঙালিদের এই অঞ্চল থেকে চলে যেতে হবে। ...পার্বত্যাঞ্চলে বাঙালিরা কোনো ধরনের সুযোগ-সুবিধাতো পাবেই না বরং এখান থেকে বিতাড়িত হবে।" "হাতি মার্কা স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাতন তালুকদারকে একজন ঠগবাজ, ধারবাজ ও চাঁদাবাজ" বলে তিনি উল্লেখ করেন। দীপঙ্কর তালুকদারের এরূপ বক্তব্য 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধি, ২০০৮' এর ব্যক্তিগত চরিত্র হনন ও মানহানিকর এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বিধিনিষেধ সংক্রান্ত ১১(ক) ধারার সরাসরি লঙ্ঘন। সরেজমিন তদন্ত পূর্বক যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উষাতন তালুকদারের নির্বাচনী চীফ নির্বাচনী এজেন্ট উদয়ন ত্রিপুরা কর্তৃক নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তি দেয়া সত্ত্বেও নির্বাচনী প্রশাসনিক কর্তপক্ষ দীপঙ্কর তালুকদারের ক্ষমতাসীন দলের দাপটের কারণে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় দীপঙ্কর তালুকদারের কর্মীরা উষাতন তালুকদারের সমর্থক ও কর্মীদের মারধর, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও এমনকি পোস্টার ছিঁড়ে দিয়ে বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন। ২ জানুয়ারি ২০১৪ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উষাতন তালুকদারের (হাতি মার্কা) পক্ষে রাঙামাটি শহরের আমানত বাগ এলাকায় নির্বাচনী প্রচার কালে রাঙ্গামাটি পৌরসভার কলেজ গেইটের আমানত বাগের বাসিন্দা রুহুল আমিন পিতা আবদুল কাদের মুন্সীকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দীপঙ্কর তালুকদারের প্রচার কর্মী এবং আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি বসর সওদাগরের নেতৃত্বে ৫ জন সন্ত্রাসী কর্তৃক মারধর করা হয়। উষাতন তালুকদারের পক্ষে প্রচারাভিযানে বাধা প্রদান বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এই হামলা সংঘটিত হয়েছে যা নির্বাচনী আচরণ বিধির পরিপন্থী।

এছাড়া ২২ ডিসেম্বর রাত ৭-৯ ঘটিকার সময় বরকল উপজেলাধীন সুবলং বাজারে এবং ২৪ ডিসেম্বর কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা মিশন হাসপাতাল এলাকায় উষাতন তালুকদারের পোস্টার ছিড়ে দেয়া হয়। ২৫ ডিসেম্বর আসামবস্তী এলাকায় উষাতন তালুকদারের

মাইকিং প্রচারণাকালীন সময়ে সিএনজির উপর ইটপাটকেল ছোঁড়া হয় এবং ২৬ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি শহরের তবলছড়ি আনন্দ বিহার এলাকায় উষাতন তালুকদারের অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়। অধিকন্তু বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়ন, লংগদু উপজেলার আটারকছড়া ইউনিয়ন ও কাট্টলী এলাকায় এবং নানিয়ারচর উপজেলাধীন সমগ্র এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের দিয়ে উষাতন তালুকদারের সমর্থকদের ভোটদানে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হয়, অন্যথায় প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করা হয়। কিন্তু এসব নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আপত্তি দিয়েও নির্বাচন কর্তৃপক্ষ থেকে কোন সুবিচার পাওয়া যায়নি। ভোট গ্রহণের দিনে রাঙ্গামাটিতে ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠে। বিশেষ করে কাউখালী ও কাপ্তাই উপজেলায় এবং রাঙ্গামাটি শহর এলাকায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা এবং নানিয়ারচর, বাঘাইছড়ি ও লংগদু উপজেলার কতিপয় কেন্দ্রে চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা ভোট কারচুপি ও ভোটারের অবাধে ভোটদানে বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন।

নির্বাচনী প্রচারকালে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন উষাতন তালুকদার

ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা, বিশেষ করে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে রাঙ্গামাটিতে দীপঙ্কর তালুকদার এবং সংসদ সদস্য হিসেবে বান্দরবানে বীর বাহাদুরের ক্ষমতার জোরে অবাধে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন ছাড়াও নির্বাচনী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাদের মদদে নির্বাচনের দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত গোয়েন্দা বাহিনীর একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই তিন পার্বত্য জেলায় মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়। সারাদেশে কোথাও মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ না থাকলেও একমাত্র তিন পার্বত্য জেলায় বিশেষ উদ্দেশ্যে হঠাৎ করে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়। নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ দিনে ৫ জানুয়ারি ভোর থেকে বিকেল সোয়া ৫টা পর্যন্ত তিন পার্বত্য সংসদীয় আসনে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকে। কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়া নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকায় ভোট শুরুর পূর্ব মুহূর্তে ভোট সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়ার ব্যাপারে ভোটারদের সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয়। এমনিতে একতরফা নির্বাচনে যেখানে ভোটারদের তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল না ও নানা শঙ্কা বিরাজ করছিল, সেখানে হঠাৎ করে মোবাইল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভোটাররা আরো শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধের ব্যাপারে তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসক ও নির্বাচনী কর্মকর্তারা কোনো কিছুই জানাতে পারেননি। তারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করা হয়নি বলে জানানো হয়েছে। পরে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদে নিরাপত্তাজনিত কারণে একটি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করা হয়েছে বলে জানা গেছে, যেখানে নির্বিঘ্ন ভোট জালিয়াতির লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদেরও হাত ছিল বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

এভাবে নানা ষড়যন্ত্র, দলীয় প্রভাব ও ক্ষমতার জোরে পার্বত্য বান্দরবান আসনে আওয়ামী লীগের বীর বাহাদুর অবাধ ভোট জালিয়াতি ও কেন্দ্র দখলের মাধ্যমে জয়যুক্ত হলেও রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ি-বাঙালি আপামর জেলাবাসীর দৃঢ়তা, জনসংহতি সমিতির কর্মীবাহিনী ও উষাতন তালুকদারের সমর্থকদের কান্তিহীন পরিশ্রম, জেলার নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রশাসনের অনেকাংশে নিরপেক্ষতার কারণে আওয়ামী লীগের প্রার্থী অহংকারী দীপঙ্কর তালুকদার ব্যাপকভাবে ভোট জালিয়াতি করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়, যার ফলে তাঁর চরম ভরাডুবি ও পক্ষান্তরে জনসংহতি সমিতির স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাতন তালুকদারের বিজয় নিশ্চিত হয়ে পড়ে।

উষাতন তালুকদারের সংবাদ সম্মেলন

বিজয় লাভের পর ৬ জানুয়ারি ২০১৪ রাঙ্গামাটির সাবারাং রেস্টুরেন্টে আয়োজিত নির্বাচন-উত্তর তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে উষাতন তালুকদার বলেন, ছোটোখাটো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সত্ত্বেও ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এবং মূল্যবান ভোট প্রদান করে তাঁকে জয়যুক্ত করার জন্য তিনি সাংবাদিকদের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি জেলাবাসীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ বিজয় তাঁর বিজয় নয়, এ বিজয় রাঙ্গামাটি জেলাবাসীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের বিজয়। এ বিজয় রাঙ্গামাটি জেলার শান্তিকামী, পরিবর্তনকামী, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষের গণমানুষের জয়। এ বিজয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পাহাড়ি-

বাঙালির ঐক্যের বিজয়। এ বিজয় দুর্নীতি, দলীয়করণ, দুর্বৃত্তায়ন, অনিয়মের বিরুদ্ধে জনতার বিজয় বলে তিনি সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন। এ বিজয় দেশে একটা গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ অবসানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত করায় রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী, রাঙ্গামাটিস্থ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নির্বাচন কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলকেও উষাতন তালুকদার ধন্যবাদ জানান। এ নির্বাচনে কর্মীবাহিনীসহ পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে জেলার স্থায়ী অধিবাসীগণ কঠোর পরিশ্রম, অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে তাঁকে জয়যুক্ত করায় তাদের সকলের প্রতিও তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ সময় তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের, যারা এ জেলায় সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে এ বিজয় এখানেই থেমে গেলে চলবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং এ অঞ্চলের গণমানুষের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ জেলার পাহাড়ি-বাঙালি সর্বস্তরের মানুষের আরো অধিকতর ঐক্য ও সংহতি অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ আন্দোলনকে আরো দুর্বার গতিতে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নিতে হবে বলে তিনি দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। নির্বাচনী ইসতেহারে প্রতিশ্রুত সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ পার্বত্যবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি সর্বদা সচেষ্ট ও সোচ্চার থাকবেন বলে সংবাদ সম্মেলনে তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাকায় নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বরেণ্য কলামিস্ট ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদের সাথে উষাতন তালুকদার

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল আসন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত জনসংহতি সমিতির স্বতন্ত্র প্রার্থী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এবং দক্ষিণাঞ্চল আসন থেকে জনসংহতি সমিতির আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী চাইথোয়াই রোয়াজার ঐতিহাসিক জয় লাভের প্রায় ৪০ বছর বাদে জনসংহতি সমিতির স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উষাতন তালুকদার জয়যুক্ত হয়েছেন।

নির্বাচনী সহিংসতা

নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ এবং সংস্কারপন্থী খ্যাত দলচ্যুত সুবিধাবাদী গোষ্ঠী খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রতিপক্ষ সমর্থক, কর্মী ও ভোটারদের উপর চড়াও হয়। নির্বাচনী প্রচারণার শুরু থেকেই ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীরা তাদের প্রার্থীদেরকে ভোট দিতে অস্ত্রের মুখে জুম্ম ভোটারদের ভয়ভীতি ও চাপ দিতে থাকে। নির্বাচনে পরাজয়ের পর তারা আরো মরিয়া হয়ে উঠে। নির্বাচনী প্রচারণার সময় ৩ জানুয়ারি ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা সংস্কারপন্থীদের স্বতন্ত্র প্রার্থী মৃণাল কান্তি ত্রিপুরার নির্বাচনী প্রচারণায় খাগড়াছড়ি সদরের গিরিফুল এলাকায় গেলে মৃণাল ত্রিপুরার স্ত্রীসহ ৭ জন নারীকে অপহরণ করে সারাদিন আটকে রাখে। নির্বাচন-উত্তর ইউপিডিএফের সহিংস আক্রমণে ৮ জানুয়ারি ২০১৪ পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের বৈদ্যমোহন কার্বারী পাড়ার কার্বারী নব কুমার ত্রিপুরাকে (৪২) গুলি করে হত্যা করে। তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালান বলে জানা গেছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রসিত বিকাশ খীসার পক্ষে প্রচারণা চালানোর জন্য ইউপিডিএফের চাপ দেয়া সত্ত্বেও সম্মত না হওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন। আরো জানা যায় যে, ৯ জানুয়ারি নব কুমার ত্রিপুরার দাহক্রিয়া শেষ করে ফেরার পথে গ্রামবাসীর মুখে ইউপিডিএফের কয়েকজন সন্ত্রাসী পড়লে গ্রামবাসীরা তাদেরকে ধাওয়া করে। এতে গ্রামবাসীর আক্রমণে একজন ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী নিহত এবং আরেকজন গুরুতর আহত হয় বলে জানা গেছে।

গত ৭ জানুয়ারি মাটিরাঙ্গা উপজেলার ফেলা কুমার কার্বারী পাড়ায় ফেলা কুমার কার্বারীর ছেলে যোসেফ ত্রিপুরাকে (৪০) ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা মারধর করে। পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি ইউনিয়নের দুইজন এবং লতিবান ইউনিয়নে একজন ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা মারধর করে। আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে সমর্থন দেয়ার অভিযোগে ৪ জানুয়ারি ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা মাটিরাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৯ জন ত্রিপুরা গ্রামবাসীকে অপহরণ করে এবং অপহরণের পর অমানুষিকভাবে মারধর করে। নির্বাচনের পর ৬ জানুয়ারি ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়। এদিকে ৭ জানুয়ারি রাসেল চাকমা ও আপন চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মহাজন পাড়ার বাসিন্দা উমেশ চন্দ্র চাকমার ছেলে কালাইয়া চাকমাকে (৩২) অপহরণ করে। এলাকাবাসীর প্রবল চাপের মুখে ৮ জানুয়ারি সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা অপহৃত ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় বলে জানা যায়।

৪র্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

জনসংহতি সমিতির সমর্থিত ৮ জন চেয়ারম্যান, ১০ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ৯ জন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০১৪ পাঁচ দফায় সারাদেশে চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫টি উপজেলার মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মতো উপজেলায় প্রত্যক্ষভাবে সমর্থিত প্রার্থী দাঁড় করানো হয় এবং প্রায় অর্ধ-ডজনের মতো উপজেলায় পরোক্ষ সমর্থন প্রদান করা হয়। তিন পার্বত্য জেলায় ২৫টি উপজেলার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রত্যক্ষভাবে সমর্থিত ৮ জন চেয়ারম্যান, ১০ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ৯ জন পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া জনসংহতি সমিতির পরোক্ষভাবে সমর্থিত আরো কমপক্ষে ৪ জন জুম্ম প্রার্থী চেয়ারম্যান হিসেবে জয়লাভ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৫টি উপজেলার মধ্যে একটি উপজেলায় একজন নারী চেয়ারম্যান জয়যুক্ত হয়েছেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সরাসরি সমর্থিত মনি চাকমা। রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলায় এই ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হয়েছে। জনসংহতি সমিতির প্রত্যক্ষভাবে সমর্থিত বিজয়ী চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানরা (মহিলা ও পুরুষ) হলেন-

চেয়ারম্যান	ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ)
১. অরুণ কান্তি চাকমা, রাঙ্গামাটি সদর	১. রিতা চাকমা, রাঙ্গামাটি সদর	১. পলাশ কুসুম চাকমা, রাঙ্গামাটি সদর
২. বড়ঋষি চাকমা, বাঘাইছড়ি	২. সুমিতা চাকমা, বাঘাইছড়ি	২. দীপ্তিমান চাকমা, বাঘাইছড়ি
৩. শ্রীমতি মনি চাকমা, বরকল	৩. শকুন্তলা চাকমা, বরকল	৩. বিধান চাকমা, বরকল
৪. উদয় জয় চাকমা, জুরাছড়ি	৪. শেফালি দেওয়ান, জুরাছড়ি	৪. রিটন চাকমা, জুরাছড়ি
৫. শুভমঙ্গল চাকমা, বিলাইছড়ি	৫. শ্যামা চাকমা, বিলাইছড়ি	৫. অমৃত সেন তঞ্চঙ্গ্যা, বিলাইছড়ি
৬. কাহ্লোচিং মারমা, থানচি	৬. বকুলী মারমা, থানচি	৬. চসা থোয়াই মারমা, থানচি
৭. অংথোয়াইচিং মারমা, রুমা	৭.ওয়াইচিং প্রু মারমা, বান্দরবান সদর	৭. কাইনথপ ম্রো, আলিকদম
৮. ক্যবা মং মারমা, রোয়াংছড়ি	৮. ব্যয়ারী মারমা, আলিকদম	৮. সুব্রত বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা, কাপ্তাই
	৯. ক্রয় সুইউ মারমা, রাজস্থলী	৯. মংসুইউ চৌধুরী, কাউখালী
	১০. এ্যানি চাকমা, কাউখালী	

জনসংহতি সমিতির পরোক্ষভাবে সমর্থিত বিজয়ী চেয়ারম্যানরা হচ্ছেন মানিকছড়ি উপজেলার আওয়ামী লীগের সমর্থিত ম্রাগ্য মারমা, দীঘিনালা উপজেলার নব কমল চাকমা, লামা উপজেলার বিএনপি সমর্থিত থোয়াইনু অং মারমা, লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার সুপার জ্যোতি চাকমা প্রমুখ।

এবারের নির্বাচনে পাবর্ত্য চট্টগ্রামের ২৫টি উপজেলার মধ্যে ১৮টি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে আদিবাসী জুম্ম প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিএনপি ৭টি, আওয়ামী লীগ ৩টি এবং জামায়াতে ইসলামী ১টি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে জয়যুক্ত হয়েছেন। এবারের উপজেলা নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংহতি সমিতির প্রত্যক্ষভাবে সমর্থিত প্রার্থী তথা আদিবাসী জুম্ম প্রার্থীরা জয়যুক্ত হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তথা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি পার্বত্যবাসীর আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস। উপজেলা পরিষদ নির্বাচন স্থানীয় নির্বাচন হলেও জাতীয়

জন সংহতি সমিতির কার্যালয়ে জন সংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন (বাম থেকে) জুরাছড়ি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) শেফালি দেওয়ান, বরকল উপজেলার চেয়ারম্যান মনি চাকমা, জুরাছড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান উদয়জয় চাকমা, জুরাছড়ি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রিটন চাকমা প্রমুখ বিজয়ীদেরকে।

রাজনৈতিক ইস্যুগুলো, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের অব্যাহত তালবাহানা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে জাতীয় রাজনৈতিক দলের চরম উদাসীনতা ও অবহেলার বিষয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। অধিকন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে আদিবাসীদের 'বাঙালি' হিসেবে অভিহিত করার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের আদিবাসীরা আওয়ামী লীগের প্রতি ছিল ক্ষুব্ধ। ফলে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ সুবিধা করতে পারেনি। রাঙ্গামাটি জেলায় রাজস্থলী উপজেলা এবং কাউখালী উপজেলায় আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থীর জয়ের পেছনে অন্যতম কারণ ছিল ভোট কারচুপি। অন্যথায় খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলা ব্যতীত আওয়ামী লীগের সমর্থিত কোন প্রার্থী জয়যুক্ত হতে পারতেন না।

রাজস্থলী উপজেলায় আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী উথিন সিন মারমা (প্রাপ্ত ভোট ৪,১৫৭) মাত্র ৫৪০ ভোটের ব্যবধানে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থী পুলুখই মারমাকে (প্রাপ্ত ভোট ৩,৬১৭) পরাজিত করেছেন বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার দলীয় প্রভাব খাটিয়ে বাঙালহালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই দুটি কেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সহায়তায় ভোট কারচুপি করে। ভোট কারচুপির অসৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভোট গণনার আগে পুলুখই মারমার এজেন্টদের কাছ থেকে দস্তখত নিয়ে রাখা হয় এবং ভোট গণনা শেষে সুবিধা মতো আওয়ামী লীগের সমর্থিত প্রার্থী উথিন সিন মারমাকে ৭০৩ ভোট, বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী থোয়াং সুইখই মারমাকে ৯৬৪ ভোট এবং জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থী পুলুখই মারমাকে ৯০ ভোট পেয়েছেন বলে ফলাফল সীটে দেখানো হয়। অথচ এই কেন্দ্রে পুলুখই মারমা তথা জনসংহতি সমিতির সমর্থন বেশি রয়েছে। এভাবেই ছলনা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ভোট কারচুপির করে আওয়ামী লীগ জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থী থেকে বিজয় ছিনিয়ে নেয়।

৩১ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠিত রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও এভাবে সরকারি দলীয় প্রভাব ও ক্ষমতা ব্যবহার করে ভোট কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ তার সমর্থিত প্রার্থী জাহিদ হোসেন সেলিমকে (আনারস প্রতীক) জয়যুক্ত করতে হীন পরিকল্পনা করে। তাদের পরিকল্পনায় প্রধান টার্গেট ছিল রাঙ্গামাটি শহরের ৯টি ভোট কেন্দ্র, যেখানে তুলনামূলকভাবে অন্য যে কোন কেন্দ্র থেকে ভোটার বেশি এবং সিংহভাগ ভোটার হচ্ছে বাঙালি। গত ৫ জানুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়ও দলীয় প্রার্থী দীপঙ্কর তালুকদারের পক্ষে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এসব ৯টি কেন্দ্রসমূহে সাধারণ ভোটারদের হুমকি-ধামকি প্রদর্শন, অর্থের

বিজয়ের পর জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হচ্ছে (বাম থেকে) বিজয়ী রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান পলাশ কুসুম চাকমা, বিলাইছড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান শুভ মঙ্গল চাকমা, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রিতা চাকমা, রাজস্থলী উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান ক্রয় সুইউ মারমা, বিলাইছড়ি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) শ্যামা চাকমা, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান অরুন কান্তি চাকমাদেরকে।

বিনিময়ে ভোট ক্রয়, জালভোট, পেশীশক্তির প্রদর্শন, নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিদের উপর চাপ প্রয়োগ করার অপচেষ্টা চালায়। এসব কেন্দ্রগুলো ছিল- শহীদ আবদুল আলী একাডেমী, রাঙ্গামাটি সিনিয়র মাদ্রাসা, রাঙ্গামাটি সরকারি শিশু একাডেমী, কাঠালতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোধুলী আমানত বাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং স্বর্ণটিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বরকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী মনি চাকমা, একই উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান বিধবা চাকমা ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী শতুস্বলা চাকমাকে বরণ করছেন মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ।

৩১ মার্চ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা নির্বাচনে ভোট কারচুপির পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে ক্ষমতাসীন দলের সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগের রাঙ্গামাটি জেলা সভাপতি দীপঙ্কর তালুকদার ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল কুমার চাকমা স্বয়ং সেদিন ১১ ঘটিকার পর দলবল নিয়ে রাঙ্গামাটি শহরে রিজার্ভ বাজার, তবলছড়ি, কলেজ গেইট ইত্যাদি এলাকায় অবস্থিত ভোট কেন্দ্রে ভোট কারচুপির চেষ্টা চালান। তারই অংশ হিসেবে জাহিদ হোসেন সেলিম-এর সমর্থকরা কেন্দ্র দখল করে ব্যাপক ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার হীন উদ্দেশ্যে এসব কেন্দ্রে ইটপাটকেল ও লাঠিসোটা নিয়ে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী অরুণ কান্তি চাকমা (কাপ-পিরিচ), ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) পদপ্রার্থী রিতা চাকমা (প্রজাপতি) ও ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) পদপ্রার্থী পলাশ কুসুম চাকমার নির্বাচনী এজেন্ট, কর্মী ও সমর্থকদের উপর হামলা করে। উক্ত হামলায় তাদের কমপক্ষে ১৫ জন সমর্থক গুরুতরভাবে আহত হয়, যাদের মধ্যে ১১ জনকে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং অপর দু' জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এমনকি আওয়ামী লীগের সমর্থকরা সেদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বিশ্রামাগার ও হিল ফ্লাওয়ার অফিসেও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদারকে টার্গেট করে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা আঞ্চলিক পরিষদের বিশ্রামাগারে হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ইন্ডিপেনডেন্ট টিভি সাংবাদিক হিমেল চাকমা ও প্রথম আলোর সংবাদদাতা হরিকিশোর চাকমাও আক্রমণের শিকার হয়ে আহত হন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে বিজয়ী ক্যথা মং মারমা

আওয়ামী লীগের সমর্থকরা সেদিন ভোট চলাকালে আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে শাহ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর বুথ থেকে চেয়ারম্যানের ব্যালট পেপার নম্বর ০৬৬১২৮১-০৬৬১৩০০, ০৬৬১১৪৭-০৬৬১২০০ এবং ০৬৬১০৫৩-০৬৬১১০০ ছিনতাই করে। পরে নির্বাচনী কর্মকর্তা ঐসব ব্যালট পেপার বাতিল ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়েও এভাবে ব্যালট পেপার ছিনতাই করে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা। বলা যায়, ভোট কেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা এবং জনসংহতি সমিতির সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচনী এজেন্ট ও সমর্থকদের সতর্কতা ও দৃঢ়তার কারণে আওয়ামী লীগ, দীপঙ্কর তালুকদার ও তাঁর গং বড় ধরনের ভোট কারচুপি করতে ব্যর্থ হন।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা নিজ বাস ভবনে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন (বাম থেকে) বিজয়ী রুমা উপজেলা চেয়ারম্যান অংথোয়াই চিং মারমা, থানচি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) বকুলী মারমা, রোয়াংছড়ি উপজেলার চেয়ারম্যান ক্যাবা মারমা ও থানচি উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান চসা থোয়াই মারমা প্রমুখদেরকে।

শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউপিডিএফকে দিয়ে নির্বাচনের তিন দিন আগে ২৮ মার্চ ২০১৪ রিজার্ভ বাজার সংলগ্ন ডকইয়ার্ড এলাকা থেকে দুই বাঙালি শ্রমিক অপহরণের ঘটনা ঘটানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাহাড়ি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে নির্বাচনী ফলাফল নিজেদের পক্ষে নেয়া।

উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা

সরকারের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে এইচ এম এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। প্রথম মেয়াদে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হয় ১৯৮৫ সালে এবং দ্বিতীয় মেয়াদের নির্বাচন ১৯৯০ সালে হলেও পরিষদ তার পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করতে পারেনি। ১৯৯১ সালে তৎকালীন খালেদা জিয়া সরকার এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি বাতিল করে। তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ প্রণীত হলেও উক্ত সময়ে পরিষদের নির্বাচন হয়নি। এরপর ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ রহিত করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি পুন:প্রচলন করা হয়। এর পর ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং একই সময়ে উপজেলা পরিষদ (রহিত পুন:প্রচলন ও সংশোধন) আইন ১৯৯৮ পাশ ও জারি করা হয়। পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ করা হয়।

জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা নিজ বাস ভবনে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন (বাম থেকে) বান্দরবান সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) প্রয়াইচিং প্রু মারমা ও আদিকদম উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান কাইনথপ ত্রো প্রমুখ বিজয়ীদেরকে।

বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার পদ্ধতির দ্বিতীয় স্তর হলো উপজেলা পরিষদ যা প্রায় সকল জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে স্থানীয় পর্যায়ের মানুষের সেবা নিশ্চিতকরণে কাজ করে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় মোট ৪৯৬টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান এবং দুই জন ভাইস চেয়ারম্যান (যার মধ্যে একজন মহিলা) থাকেন যারা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। এছাড়া উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভা, যদি থাকে, এর মেয়র এবং উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা, যদি থাকে, এর সংরক্ষিত মহিলা

সদস্য/কাউন্সিলের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক মহিলা সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে থাকেন।

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ২৩ ধারার অধীনে দ্বিতীয় তফসিলে উপজেলা পরিষদের ১৮টি কার্যাবলী তালিকাভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা; পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা; আন্তঃইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ; স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ; শিক্ষা প্রসার, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যক্রমের মান উন্নয়ন, ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ; সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় সাধন; মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান; কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; উপজেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলার বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রেরণ; আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ; ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ; নারী ও শিশু নির্যাতনসহ ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার, ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কাজের সমন্বয় ইত্যাদি অন্যতম।

বিশেষ প্রতিবেদন

'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহারে সরকারি নিষেধাজ্ঞার মধ্য দিয়ে সারাদেশে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালিত

'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার পরিহার করার সরকারী নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সারাদেশে আদিবাসী জনগণ ও দেশের নাগরিক সমাজ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ২০১৪ সালের আদিবাসী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Bridging the Gap: Implementing the Rights of Indigenous Peoples"-এর সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক নির্ধারিত "আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মুক্তিকামী জনতার সেতুবন্ধন" প্রতিপ্রাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক সমাবেশ, আলোচনা সভা, আদিবাসী মেলা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মানববন্ধন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ইত্যাদি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে আদিবাসী দিবস পালিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন: গত ৫ আগস্ট ২০১৪ ঢাকায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সারাদেশে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন ও নাগরিক সমাজ কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত অনেক অধিকার এখনো রাষ্ট্রগুলো বাস্তবায়ন করেনি। আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশে দেশে এখনো ব্যাপক ফারাক রয়েছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই ১৯৭২ সালে আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন নং ১০৭ অনুস্বাক্ষর করলেও উক্ত কনভেনশনে স্বীকৃত আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার তথা ভূমির উপর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ লাভ, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি অধিকার বাস্তবায়নে সরকার এখনো এগিয়ে আসেনি। তাই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারকে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি আরো বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল ও তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার হীন উদ্দেশ্যে আদিবাসীদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, আদিবাসীদের ভূমি জবরদখল ও উচ্ছেদ, আদিবাসী নারীর উপর ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণসহ নৃশংস সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ২০১৪ সালে তিন জন আদিবাসীকে হত্যা করা এবং ২৬ জন আদিবাসী নারী যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গত ১৫ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়িতে সবিতা চাকমাকে ধর্ষণের পর হত্যা এবং ২৬ মার্চ মহালছড়িতে ভারতি চাকমাকে হত্যা; গত ২৭ জুলাই শেরপুর জেলায় ধর্ষণের হাত থেকে ভাইয়ের স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে একজন আদিবাসী হাজং হত্যা ও নবাবগঞ্জে ২ আগস্ট ভূমিগ্রাসীদের হামলায় একজন আদিবাসী সাঁওতালকে হত্যা। প্রভাবশালী ভূমিদস্যু কর্তৃক আদিবাসীদের ভূমি জবরদখলকে কেন্দ্র করে গত জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে ১০৬টি আদিবাসী পরিবার আক্রান্ত হয়েছে এবং এতে ৪২ জন হতাহতের শিকার হয়েছে। নারী ও শিশুসহ আদিবাসীদের উপর সহিংসতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো এসব মানবতা বিরোধী সহিংসতায় জড়িত অপরাধীদের বিচারের আওতায় না আনা। অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ায় সারা দেশে আদিবাসীদের উপর সহিংসতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে সরকার বর্তমানে বিজিবি, সামরিক বাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প সম্প্রসারণ, সেনাবাহিনীর তথাকথিত পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, সংরক্ষিত বন ঘোষণা, সেটেলার বাঙালিদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণের নামে ভূমি অধিগ্রহণ এবং বহিরাগত ব্যবসায়ী/প্রভাবশালী ব্যক্তি/ভূমিগ্রাসীদের ভূমি জবরদখলে মদদ ও সহায়তা দিয়ে চলেছে। ক্ষোভের সাথে তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের অনেক মন্ত্রী-আমলা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের কেবল একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে। গত ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের পর দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর সাত মাস অতিক্রান্ত হলেও সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, বরং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও জনবিরোধী আইন প্রণয়ন ও কার্যক্রম হাতে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন

না করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে সরকার একতরফাভাবে অর্ন্তবর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন প্রণয়ন এবং আদিবাসী জুম্মদের অধিকার ও অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে অনিশ্চিত রেখে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা, যা সরকারের চরম অগণতান্ত্রিক, জনবিরোধী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী মানসিকতারই প্রতিফলন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম দেশের আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করে আদিবাসীদের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানসহ ১১ দফা দাবিনামা দাবি তুলে ধরে। আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রংয়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি: ৯ আগস্ট ২০১৪ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যালি আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের বেসরকারি বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি। আদিবাসী ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সংহতি বক্তব্য রাখেন দেশের বরেণ্য রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার, নারী অধিকার, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্র-যুব প্রতিনিধিবৃন্দ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. মিজানুর রহমান বলেন, দেশকে যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ধারণ করতে চাই তাহলে দেশের আদিবাসীদের অস্তিত্ব ও অধিকারকে স্বীকার করতে হবে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, কে সেই বুদ্ধিজীবী যারা আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিলে দেশের নিরাপত্তা সমস্যা দেখা দেবে বলে যুক্তি দেখান? আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে একটা দেশের নিরাপত্তা কখনোই নিশ্চিত হতে পারে না। বরং বৈষম্য-বঞ্চনা মুক্ত ঐক্যবদ্ধ জনগণই একটা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আদিবাসীদের অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধান অতিথি রাশেদ খান মেনন বলেন, আদিবাসীদের স্বীকৃতি না দেয়া হলো অজ্ঞতারই পরিচায়ক। সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য নগণ্য পরিমাণ বাজেট বরাদ্দের প্রেক্ষিতে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আন্তরিক রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সমাবেশ ও র‍্যালি: পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে রাঙ্গামাটি পৌরসভা প্রাঙ্গণে এক সমাবেশ আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখার ফোরামের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক বিজয় কেতন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জেলা শাখার সভাপতি গুনেন্দু বিকাশ চাকমা, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অরুন কান্তি চাকমা, ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ-এর প্রতিনিধি রবার্ট স্টুলম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক শান্তি বিজয় চাকমা, বিলাইছড়ি উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শ্যামা চাকমা, বালুখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিজয় গিরি চাকমা, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনোজ বাহাদুর, উদয়ন ত্রিপুরা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উষাতন তালুকদার তাঁর বক্তব্যে অবিলম্বে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানান। অন্যথায় জনগণকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে সরকারকে বাধ্য করা হবে বলে তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। সরকার গায়ের জোরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লংঘন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন সংশোধন করছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবাস্তবায়িত রেখে ও জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার পাঁয়তারা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

উক্ত সমাবেশে রাঙ্গামাটির বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংহতি প্রকাশ করেন। সভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি আদিবাসী অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত ধারাবিবরণী, প্লে-কার্ড, পোস্টার, ব্যানার ও শ্লোগানের মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটি পৌরসভা থেকে রাঙ্গামাটি শিল্পকলা একাডেমিতে এসে শেষ হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন স্তরের রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীলসমাজ ও গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ, ছাত্র-যুবসমাজ ও আদিবাসী নেতৃবৃন্দ।

বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচি: কাপেং ফাউন্ডেশন, এএলআরডি, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ আদিবাসী সাংস্কৃতিক ফোরাম, গারো স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (গাসু), বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, মাদল প্রভৃতি সংগঠন কর্তৃক ঢাকায় আলোচনা সভা, আদিবাসী মেলা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মানববন্ধন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। এছাড়া সিলেট, মধুপুর-টাঙ্গাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাও, জয়পুরহাট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মৌলভীবাজার-কুলাউরা, নাটোর, নেত্রকোণা প্রভৃতি জেলায় আদিবাসী দিবস পালিত হয়।

সরকারের আদিবাসী বিরোধী প্রেস নোট: আদিবাসী দিবসের দু'দিন আগে ৭ আগস্ট ২০১৪ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে "'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার পরিহার করা প্রসঙ্গে" শীর্ষক একটি তথ্যবিবরণী প্রকাশ করে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। উক্ত তথ্যবিবরণীতে বলা হয় যে, "বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী বর্তমানে দেশে আদিবাসীদের কোন অস্তিত্ব না থাকলেও বিভিন্ন সময় বিশেষ করে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে 'আদিবাসী' শব্দটি বারবার ব্যবহার হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আগামী ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আলোচনা ও টকশোতে 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার পরিহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ সকল আলোচনা ও টকশোতে অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকসহ সুশীল সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আদিবাসী শব্দটির ব্যবহার পরিহারের জন্য পূর্বেই সচেতন থাকতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।"

উল্লিখিত তথ্যবিবরণীটি কোন স্বাক্ষর ছাড়াই প্রকাশ করা হয়। আদিবাসী দিবসের দু'দিন আগে সরকারের তরফ থেকে এরূপ আদিবাসী বিরোধী তথ্যবিবরণী প্রকাশ করায় সারাদেশে আদিবাসী ও নাগরিক সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। দেশের আদিবাসী, নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো থেকে এ তথ্যবিবরণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সরকারের নির্দেশনা সত্ত্বেও সংবাদ মাধ্যমে, আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচিতে ও প্রকাশিত পোস্টার, ফেস্টুন ও প্রকাশনায় আদিবাসী শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার ও প্রচার করা হয়।

সেটেলার বাঙালি সংগঠনের আদিবাসী দিবস বিরোধী অপতৎপরতা: রাঙ্গামাটিতে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে ৯ আগস্ট আয়োজিত কর্মসূচি ভন্ডুল করার হীন উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন, বাঙালি ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য যুব ফ্রন্ট প্রভৃতি ভূঁইফোড় সাম্প্রদায়িক সংগঠন আদিবাসী দিবস বিরোধী প্রচারণা ও অপতৎপরতা চালায়। এসব সংগঠনসমূহ সরকারের বিশেষ কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের মদদে আদিবাসী দিবস ও জুম্ম বিরোধী সাম্প্রদায়িক শ্লোগান সম্বলিত মাইকিং করে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

বিশেষ প্রতিবেদন

দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ায় বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন

গত ১-৩ জুলাই ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলায় বাবুছড়া বিজিবি ক্যাম্প কর্তৃক এলাকাবাসীর উপর হামলার তদন্ত করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গত ২৯ জুন ২০১৪ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো: আলমগীর হোসেনকে এ ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্তকালে তিনি খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক, দীঘিনালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাবুছড়া বিজিবি ক্যাম্পের উপ-অধিনায়ক, দীঘিনালার উপজেলা চেয়ারম্যান, দীঘিনালার ইউপি চেয়ারম্যান, বাবুছড়া ইউপি চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলেন।

উল্লেখ্য যে, ২০০৫ সালে বিজিবি ৫১ ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার আওতাধীন দীঘিনালা ইউনিয়নের অন্তর্গত যত্ন মোহন কার্বারী পাড়া ও শশী মোহন কার্বারী পাড়ার ৪৫.০ (পয়তাল্লিশ) একর টিলা ও ধান্য জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়। তারই অংশ হিসেবে গত ৩১ মার্চ ২০০৫ তারিখে উক্ত জমি হুকুম দখলের জন্য উক্ত পাড়ার ১১ পরিবার পাহাড়িকে নোটিশ প্রদান করা হয় এবং নোটিশ জারির সাথে সাথে ৪৫.০ একর জমি পরিচিহ্নিত করে লাল পতাকা দ্বারা বেষ্টনী দেয়া হয়। উল্লিখিত ১১ পরিবার নোটিশ পাওয়ার পর উক্ত নোটিশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করে। এর প্রেক্ষিতে গত ২৩ মে ২০০৫ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট উক্ত ৪৫.০ একর হুকুম দখলের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন। স্থগিতাদেশ বহাল থাকা অবস্থায় গত ১৪ মে ২০১৪ বিজিবি রাতে গোপনে উক্ত জায়গা দখলে নেয় এবং ১৫ মে ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক বিজিবি ব্যাটেলিয়নকে বুঝিয়ে দেন।

হাই কোর্টের স্থগিতাদেশকে লঙ্ঘন করে বিজিবি কর্তৃপক্ষ উক্ত জমি বুঝিয়ে না নেয়ার আগে সেদিন ১৪ মে ২০১৪ রাত আনুমানিক ৩.০০ ঘটিকার সময় ১৪/১৫টি গাড়ি নিয়ে বিরোধপূর্ণ জায়গাটি বিজিবি দখলে নেয়। তারা গ্রামের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ কাটাতারের বেষ্টনী তৈরী করে। পক্ষান্তরে গত ১০ জুন ২০১৪ তারিখে বিকাল ৪.০০টার সময় যত্ন কুমার কার্বারী ও শশী মোহন কার্বারী পাড়ার প্রায় শতাধিক পাহাড়ি অধিবাসীরা উক্ত জায়গায় কলাগাছ রোপণ করতে গেলে বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে বাধা প্রদান করে। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় ১৮ (আটার) জন জুম্ম আহত হন বলে জানা যায়।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজিবি দীঘিনালা থানায় ১১১ জন জুম্ম গ্রামবাসীর নামে ও ১০০/১৫০ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে (মামলা নং-০২, তারিখ-১১/০৬/২০১৪)। এমনকি উক্ত মামলায় ৩ জন মৃত ব্যক্তিকেও আসামী করা হয়। পুলিশ উক্ত মামলায় ৭ জন জুম্মকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ১৬ বছর বয়সী অন্তরী চাকমা নামে এক ছাত্রীও রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করা হয় যে, ৮০'র দশকের দিকে যত্ন কুমার কার্বারী ও শশী মোহন কার্বারী পাড়া সংলগ্ন ললিত মোহন চাকমার রেকর্ডীয় খামারবাড়ির ভিটায় সেনাবাহিনী জোরপূর্বক ক্যাম্প স্থাপন করে। ১৯৮৯ সালের মার্চ/এপ্রিলের দিকে যত্ন কুমার কার্বারী পাড়া ও শশী মোহন কার্বারী পাড়াসহ বিভিন্ন গ্রামের দিকে এলোপাতাড়িভাবে উক্ত ক্যাম্পের তৎকালীন সেনা সদস্যরা গুলি ছুড়লে উক্ত গ্রামের জুম্ম অধিবাসীরা নিরুপায় হয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। সেই সুযোগে যত্ন কুমার কার্বারী পাড়া ও শশী মোহন কার্বারীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে সেনাবাহিনী ঘাটার ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের জায়গা হিসেবে ব্যবহারের জন্য দখল করে নেয়। ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের ৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে সম্পাদিত ২০-দফা প্যাকেজ চুক্তি এবং ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আওতায় ২৮ মার্চ ১৯৯৭ হতে সকল ৭ শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর বাধার কারণে ভারত প্রত্যাগত উক্ত গ্রামের লোকজন বসতি স্থাপন করতে পারেনি যা চুক্তির পরিপন্থী বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

উক্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ২০১১ সালের শেষের দিকে এক সেনা কর্মকর্তার সহানুভূতিতে ১৫/১৬ পরিবার জুম্ম নিজ

বাস্তুভিটায় ঘর নির্মাণ করার সুযোগ পান। উক্ত পরিবারগুলো বর্তমানেও বসবাস করছেন এবং উক্ত জায়গায় বংশ পরম্পরায় তারা বসবাস করে আসছেন বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ যুগ যুগ ধরে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুযায়ী প্রথাগতভাবে কেবলমাত্র জুম চাষ করে বসতি স্থাপন করার পর বাগান-বাগিচা করে থাকেন। যার কারণে অধিকাংশ পাহাড়ি জনগণের ১ম ও ২য় শ্রেণির জমি বন্দোবস্ত ব্যতীত টিলা জমির বন্দোবস্তী নেই বললেই চলে। সেই সুযোগে খাগড়াছড়ির জেলা প্রশাসক মহোদয় ২৯.৮১ একর জমি খাস হিসেবে তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন এবং জনবসতি বা ঘরবাড়ি থাকার কারণে বাগান-বাগিচা বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদানের নোটিশ দেন যা উক্ত বিতর্কিত জায়গায় স্থানীয় পাহাড়ি অধিবাসীদের দখলের সুস্পষ্ট প্রমাণ বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে, খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদনে বাবুছড়া ইউনিয়নের কোন বিজিবি ক্যাম্প নেই, এমনকি ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় কোন বিজিবি ক্যাম্প না থাকায় ১৪৩ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা অরক্ষিত রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে বাবুছড়া ইউনিয়নের ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় এক কিলোমিটার সীমানার মধ্যে কুকীছড়া মৌজায় পাকিস্তান আমল হতে বর্তমান পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বিজিবি ক্যাম্প রয়েছে। তাছাড়াও বাবুছড়া ইউনিয়নের ডুলুছড়ি মৌজায় ওয়াইটং ক্যাম্পও এর সাথে যুক্ত রয়েছে। জেলা প্রশাসকের প্রতিবেদনে বর্তমান সম্ভাব্য স্থাপিত বাবুছড়া বিজিবি ক্যাম্পটি ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকার কাছাকাছি উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি সীমান্ত থেকে ৪০/৪৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত বলে মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। অধিকন্তু বিজিবি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত স্থান থেকে পশ্চিমে রয়েছে মাত্র ৮০০ গজ দূরে সেনা সাবজোন, উত্তরে রয়েছে জারুলছড়ি সেনা ক্যাম্প, দক্ষিণে রয়েছে রাঙ্গাপানিছড়ার আনসার ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্প এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে কাটারুংছড়া সেনা ক্যাম্প। এই ক্যাম্পগুলোর অবস্থানও প্রস্তাবিত বিজিবি সদর দপ্তর হতে এক থেকে দেড় কিলোমিটার এলাকার সীমানার মধ্যে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে এও উঠে এসেছে যে, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে ২০০৫ সালে হুকুম দখল করা হয়েছে। এটা পার্বত্য চুক্তির আওতায় গঠিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৪ ধারার (ক) ও (খ) এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে পর্যালোচনা ও মতামত দেয়া হয়েছে যে, প্রথমত: বর্তমানে বিজিবিকে যে ২৯.৮১ একর জমি দেয়া হয়েছে তা নিরবচ্ছিন্ন নয়। এ জমি ৪টি খন্ডে বিভক্ত। এক খন্ড থেকে অন্য খন্ডে যেতে হলে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির উপর দিয়ে যেতে হবে এবং বর্তমানে বিজিবি তাই করছে। অধিগ্রহণ না করেই তারা অন্যের জমি ব্যবহার করছে। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন দুই খন্ড জমি আছে যা সম্পূর্ণভাবে বিজিবির জমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ জমির মালিকগণ বিজিবি এলাকার উপর দিয়ে ছাড়া কখনোই তাদের জমিতে যেতে পারবে না। বিজিবির দয়ার উপর তাদেরকে নির্ভর করতে হবে। এদের পারস্পরিক অবস্থা বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অবস্থিত ছিটমহলের বাসিন্দাদের মত হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়ত: ঘটনার পর থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বন্ধ রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক এবং অবিভাবকদেরকে বিজিবির দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির অবস্থান প্রমাণ করে যে এর চার পাশে জনবসতি ছিল। এছাড়া এ জমির মধ্যে ৯৬০ দাগে একটি কিয়ং ঘর ছিল মর্মেও রেকর্ডে দৃশ্যমান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নামীয় জমি অধিগ্রহণের বাইরে রাখা দরকার ছিল বলে তদন্ত প্রতিবেদনে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

তৃতীয়ত: ১৯৮৯ সালের আগ পর্যন্ত এখানে স্বাভাবিক জনবসতি ছিল সে বিষয়টিও তদন্তকালে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে শরণার্থীরা প্রত্যাবর্তনের পরে এ জমিতে তারা আর বাড়িঘর নির্মাণ করতে পারেনি সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণে। সাম্প্রতিককালে সেনাবাহিনী তাদের অকার ছোট করলে কিছু জমি খালি হয় এবং পাহাড়িরা নতুন করে বাড়ি করার উদ্যোগ নেয়। জেলা প্রশাসনের বক্তব্যে যথেষ্ট স্ববিরোধীতা রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাগণের মধ্যে অনেকেরই পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা না থাকার ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। জমিতে পাহাড়িদের প্রথাগত অধিকারের বিষয়টি অনেক কর্মকর্তা জানেন না এবং কেহবা জানলেও মানতে চান না। তারা সমতলের ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে এক করে দেখেন। ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন বলে তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত দেয়া হয়।

চতুর্থত: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ কেস নং ০২/২০০৫ এর নথি পর্যালোচনা ও এলএ শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, এলএ কেসটিতে পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল অনেক। এলএ কার্যক্রম শুরুর আগে বা পরে এলএ শাখার কর্মকর্তাগণ সরেজমিনে কোন পরিদর্শন করেন নাই, তারা অফিসের কাগজপত্র দেখে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ভাষায় যারা অবৈধ দখলদার তাদেরকে উচ্ছেদের জন্য কোন আইনানুগ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি। অস্ত্রভীতি ও কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। সরকারি একটা সংস্থার কাছ থেকে এধরনের কাজ অনাকাঙ্ক্ষিত বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ এত বেশি না হলেও চলত। নিয়ম থাকলেও অতিরিক্ত ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা এলএ কেসে প্রস্তাবিত জমির কোন ভিডিও বা স্থির চিত্র দেখাতে পারেননি বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

পঞ্চমত: সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ১৪ মে ২০১৪ তারিখ দিবাগত রাত ২/৩ টার সময় বিজিবি জমির দখল নেয় এবং এর ৮/১০ ঘন্টা পরে দিনের আলোতে তাদেরকে আনুষ্ঠানিক দখল দেয়া হয়। একটা ইউনিফর্মধারী বাহিনীর জন্য এটি সম্মানজনক হয়নি এবং জেলা প্রশাসনও নিজেদের জন্য মর্যাদাহানিকর কাজ করেছেন বলে তদন্ত প্রতিবেদনে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

ষষ্ঠত: বিজিবি কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় ১১১ জনের মধ্যে ৩০, ৩২ ও ৯৪ নং আসামী বহু বছর আগে মারা গেছেন অর্থাৎ ফৌজদারী মামলাটির অবস্থাও এলএ কেসের মত। গণহারে আসামী করা হয়েছে। লোকজনকে ঘরবাড়ি ছাড়া করার উদ্দেশ্যে মামলাটিকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। একটা দায়িত্বশীল বাহিনী কর্তৃক এ ধরনের হয়রানিমূলক মামলা দায়ের দু:খজনক এবং এজন্য মামলার বাদীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা যায় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত কমিটি প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশমালা প্রদান করেছে। সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. অধিগ্রহণকৃত জমিতে যেসকল পাহাড়ি পরিবার ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত বসবাস করেছিল তাদেরকে চিহ্নিত করে এ জায়গায় অথবা বিরোধমুক্ত অন্য জায়গায় পুনর্বাসিত করা।

২. হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করে পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সাথে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেয়া।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বাঙালি কর্মকর্তাদেরকে পার্বত্য এলাকার প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিভাগীয় কমিশনারের সহায়তায় এ কাজটি করতে পারে।

৪. পাহাড়ি এবং বাঙালিদের মধ্যে বিরাজমান আস্থার সংকট দূর করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেয়া।

উল্লেখ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়নি ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা

সরকারের তালবাহানা নীতি এবং চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রমের ধারা পূর্ববর্তী মেয়াদের মতো অব্যাহত রয়েছে

গত ৫ জানুয়ারি ২০১৪ নির্বাচনের পর ১২ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নতুন করে সরকার গঠন করলেও সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তালবাহানা নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। পূর্বের মতো বর্তমানেও সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ এবং চুক্তি পরিপন্থী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ধারা অব্যাহত রেখেছে। নতুন করে সরকার গঠনের পর আজ প্রায় ১১ মাস অতিক্রান্ত হলেও সরকার চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি (উপজাতীয়) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয় ও কার্যাবলী কার্যকরকরণ এবং এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এ বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ ও পুনর্বাসন; সেনা শাসন 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিলকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরীতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ; চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পূর্ববর্তী মেয়াদের (২০০৯-২০১৩) মতো সরকার একের পর এক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে মিথ্যার বেসাতি করে চলেছে।

গত ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনে তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদারকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী ঊষাতন তালুকদারকে জয়যুক্ত করার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের তালবাহানা নীতির প্রতি পার্বত্যবাসী যে অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ ছিল তার একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়া হয়েছে। এমনকি ২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনে জনসংহতি সমিতির সমর্থন না হলে এবং ৩০০ পার্বত্য বান্দরবান সংসদীয় আসনে ক্ষমতাসীন প্রার্থী ব্যাপকভাবে ভোট কারচুপি না করলে উভয় আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটতো তা ছিল একপ্রকার নিশ্চিত। এভাবে ভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতারণার বিরুদ্ধে পার্বত্যবাসী তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বিগত ১১ মাসে কোন কার্যকর ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

গত ১ আগস্ট ২০১৪ যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের চন্দ্রঘোনা-বান্দরবান সদর যোগাযোগ সড়ক পরিদর্শনের সময় বলেন, এ সরকারের মেয়াদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হবে। অনুরূপভাবে গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মোট ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ইতিমধ্যে সরকার বাস্তবায়ন করেছে। ১৫টি ধারার আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বাকি ৯টি ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরো বলেন, তাঁর সরকার পার্বত্য এলাকার জনগণের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে। বস্তুত এভাবেই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে একদিকে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে পার্বত্যবাসীর সাথে চরম প্রতারণা করে যাচ্ছে।

চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩" মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৪ (চার) খন্ডের মধ্যে 'ক' খন্ডে ৪টি (চার), 'খ' খন্ডে ৩৫টি (পয়ত্রিশ), 'গ' খন্ডে ১৪টি (চৌদ্দ) এবং 'ঘ' খন্ডে ১৯টি (উনিশ) সর্বমোট ৭২টি (বাহাত্তর)

ধারা রয়েছে। ইহার 'ক' খন্ডের ধারা ১, ২, ৩ ও ৪; 'খ' খন্ডের ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ও ৩৩; 'গ' খন্ডের ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, এবং 'ঘ' খন্ডের ১, ৫, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৯ ধারা মোট ৪৮ টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে; 'খ' খন্ডের ৪(ঘ), ৯, ১৯, ২৪, ২৭, ৩৪; 'গ' খন্ডের ২, ৩, ৪, ৫, ৬; 'ঘ' খন্ডের ৪, ৬, ১৭, ১৮ নম্বর মোট ১৫ টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং 'খ' খন্ডের ২৬, ২৯, ৩৫; 'গ' খন্ডের ১১, ১৩; 'ঘ' খন্ডের ২, ৩, ৭, ৯, নম্বর ধারা মোট ৯ টি ধারা বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে বলে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের উক্ত প্রতিবেদন সর্বাংশে সত্য নয়। উদাহরণ হিসেবে 'ক' খন্ডের ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার যে দাবি করছে সেই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে সরকারের ধোঁকাবাজির চিত্র ফুটে উঠবে। প্রথমত: চুক্তির 'ক' খন্ডের ১নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পাহাড়ি (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিধান এখনো কাগজ-কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কোন আইনী বা কার্যগত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সরকারের কোন অফিস আদেশ, দিক-নির্দেশনা বা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি। ফলে নানা কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহতভাবে অভিবাসন ঘটছে। ফলে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে বসেছে। দ্বিতীয়ত: ২নং ধারায় "যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে" মর্মে যে বিধান রয়েছে তদনুযায়ী ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ সংশোধন করা হলেও অন্যান্য অনেক জাতীয় আইন রয়েছে যেগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায়ও প্রযোজ্য সেগুলো এখনো চুক্তির এই ধারা মোতাবেক পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পুলিশ আইন, বন আইন, স্থানীয় সরকার পরিষদ (ইউনিয়ন পরিবষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা) আইন, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ইত্যাদি সংশোধন করা হয়নি। তাহলে সরকার কিভাবে উল্লিখিত দু'টি ধারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করছে তা সহজেই বুঝা যায়।

চুক্তির 'খ' খন্ডের ধারাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে যে, এ খন্ডের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩৫টি ধারার মধ্যে ৬টি ধারা [৪(ঘ), ৯, ১৯, ২৪, ২৭ ও ৩৪ ধারা] ব্যতীত বাকী ২৯টি ধারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন অর্থে উল্লিখিত ২৯টি ধারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে তা বোধগম্য নয়। ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের মাধ্যমে উন্নয়ন সংক্রান্ত ১৯নং ধারা ব্যতীত যদিও 'খ' খন্ডের অন্যান্য সকল ধারা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানেই তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭ বছরেও এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ৩৪-সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের পরিবর্তে এখনো অনির্বাচিত বা সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ সদস্যের অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ দিয়ে এসব তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই যেখানে আইনের প্রয়োগ নেই, সেখানে এ বিধানগুলো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করা কখনোই সঠিক হতে পারে না। বস্তুত জনমতকে বিভ্রান্তি করার হীন উদ্দেশ্যেই এভাবে বিভ্রান্তিকর, বাস্তব-বিবর্জিত ও মনগড়া দাবি করা হচ্ছে বলে বলা যেতে পারে।

এছাড়া সরকার যেসব ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করছে সেসব ধারাগুলোর মধ্যে সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান সংক্রান্ত ৪(ঘ) নং ধারা, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ৯নং ধারা; উন্নয়ন সংক্রান্ত ১৯নং ধারা; পার্বত্য জেলা পুলিশ গঠন সংক্রান্ত ২৪নং ধারা; জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য জমিসহ কোন জায়গা-জমি পার্বত্য জেলা পরিষদে পূর্বানুমোদন ব্যতীত ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করার উপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত ২৬নং ধারা; ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত ২৭নং ধারা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাবলী সংক্রান্ত ৩৪নং ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হওয়ার দাবিও সর্বাংশে সঠিক নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ভোটার তালিকা বিধিমালা বা নির্বাচন বিধিমালা যেখানে এখনো প্রণীত হয়নি, সেখানে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয়টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে দাবি করা বাতুলতা বৈ কিছু নয়। পার্বত্য জেলা পুলিশ বিষয়টি যেখানে এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি, সেখানে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য নিয়োগ, বদলী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই আসে না। তাহলে কোন অর্থে সরকার এ বিষয়গুলো আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করছে তা বোধগম্য নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যান্য ধারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সরকারি প্রতিবেদন কতটুকু সঠিক ও যথাযথ তা উল্লেখিত উদাহরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বাড়ানো

১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিগত ১১ মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করে এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ না নিয়ে সরকার অতি সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার ৫ থেকে ১১ সদস্যে বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে অনেক আগে

১৯৯২ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও পরবর্তী ২২ বছর ধরে কোন সরকার এ পরিষদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এবং এলক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়নেরও কোন উদ্যোগ নেয়নি। যে দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সেই ক্ষমতাসীন দল তাদের দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অন্তর্বর্তী জেলা পরিষদসমূহ অগণতান্ত্রিকভাবে বছরের পর বছর ধরে পরিচালিত করে আসছে। এমনিতর এক পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে অন্তর্বর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার চেয়ারম্যানসহ ৫ সদস্য থেকে ১১ সদস্যে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪ নামে তিনটি বিল গত ১ জুলাই ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন এবং যাচাইয়ের জন্য সেদিন উক্ত বিলসমূহ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। জনসংহতি সমিতি অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা না বাড়িয়ে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ৩৪-সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে।

বস্তুত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনকে অব্যাহতভাবে পাশ কাটানো, পার্বত্য জনগণের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের মতো রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার হীন উদ্দেশ্যে সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। বলাবাহুল্য শক্তিশালী ও গতিশীল পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন, পরিষদে সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি জনমুখী, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত পার্বত্য জেলা পরিষদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ৩৪ সদস্য-বিশিষ্ট নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন বিকল্প নেই। অনির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার যতই বাড়ানো হোক না কেন তাতে করে কখনোই শক্তিশালী, গতিশীল ও জবাবদিহিমূলক পার্বত্য জেলা পরিষদ গড়ে উঠতে পারে না বা সকল জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যেতে পারে না। বস্তুত অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার বাড়ানো হলে সুবিধাবাদী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া কিছুই সাধিত হবে না। পক্ষান্তরে এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরেক নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে এবং পার্বত্যবাসীদের প্রতি বঞ্চনা ও অবহেলা অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবয়ানের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন আইন প্রণয়ন

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে গত ১ জুলাই ২০১৪ জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ পাশ করেছে। এই আইনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় রূপান্তর করা হয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার মূল প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে জেলা পর্যায়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ প্রণয়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে নিঃসন্দেহে ক্ষুণ্ন করবে এবং প্রশাসন ও উন্নয়নে জটিলতা সৃষ্টি করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২(ক)(গ) ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধানের বিধান রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধান থাকলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ বরাবরই উক্ত বিধান অবজ্ঞা করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও বোর্ডের মূল নির্বাহী পদে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে সরকারি আমলারাই মূলত সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন যাদের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে। তার অর্থ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের মূল দায়িত্ব সরকারি আমলাদের হাতে থেকে যাচ্ছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামে গণমুখী ও সুষম উন্নয়নে তথা পার্বত্য জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থায় চরমভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে বিষয়/কার্যাবলী হস্তান্তর

গত ১২ জানুয়ারি বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যতম অগ্রগতি বলা যায় তা হলো মাধ্যমিক শিক্ষা ও পর্যটন (স্থানীয়) - এ দু'টি বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা। গত ২৬ মে ২০১৪ তারিখে মাধ্যমিক শিক্ষা এবং সর্বশেষ ২৮ আগস্ট ২০১৪ পর্যটন (স্থানীয়) বিষয়টি হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে অভিযোগ রয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত পর্যটন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন থাকবে। পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত পর্যটন কেন্দ্র ও প্রকল্পগুলো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন হচ্ছে না যা পার্বত্য

চট্টগ্রাম চুক্তির মূল চেতনার সাথে বিরোধাত্মক বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত রয়েছে। সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদের (২০০৯-২০১৩) সময় ২০১৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ সংশোধনের মাধ্যমে 'জুম চাষ' বিষয়সহ ইতিপূর্বে হস্তান্তরিত বিভাগ/বিষয়ের অধীন ৯টি কর্ম/অফিস তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে। তবে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশেষ করে জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), বন ও পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এখনো হস্তান্তর করা হয়নি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ

আওয়ামী লীগ নতুন করে সরকার গঠনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্যবাসীর সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ জোরদার করেছে। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ৫৩(১) ধারায় "সরকার আঞ্চলিক পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে এবং আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ বিবেচনাক্রমে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে" মর্মে বিধান থাকলেও সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা বা পরামর্শ ছাড়া "রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০১" প্রণয়ন করে। একইভাবে আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও পরামর্শ ছাড়াই সরকার অতি সম্প্রতি রাঙ্গামাটিতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনেরও উদ্যোগ নেয়। এটা সরকারের সরাসরি আইন লঙ্ঘন ও আইনের প্রতি স্পষ্ট অবজ্ঞা। আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে যে কোন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পূর্ণভাবে অবৈধ ও পদ্ধতি-বহির্ভূত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বলাবাহুল্য যে, সরকার উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা, স্বাতন্ত্র্যতা, জাতিবৈচিত্র্যতা, পশ্চাদপদতা, ভূমি সমস্যা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটের কথা বিন্দুমাত্র আমলে নেয়নি। দেশে বিদ্যমান অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একই ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের ৫নং ধারায় বলা হয়েছে, যে কোন জাতি, ধর্ম, গোত্র এবং শ্রেণির পুরুষ ও নারীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে আদিবাসী ও স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের কোন বিধান বিশ্ববিদ্যালয় আইনে উল্লেখ করা হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত বিশেষ অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। প্রস্তাবিত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, কোষাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে জুম্ম তথা স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য সংরক্ষণের কোন বিধান উল্লেখ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী সংস্থা 'রিজেন্ট বোর্ড' গঠনেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধিত্ব তথা জুম্ম ও স্থায়ী অধিবাসীদের থেকে সদস্য নিয়োগের সুনির্দিষ্ট কোন বিধান রাখা হয়নি।

বলাবাহুল্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ন্যায় সর্বোচ্চ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থীর যোগান দেয়ার মতো পার্বত্যবাসীর অর্থনৈতিক-সামাজিক-শিক্ষাগত ভিত্তি এখনো গড়ে উঠেনি। স্বভাবতই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজ সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা অনুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হলে ৯০% এর অধিক আসনে বহিরাগত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে থাকবে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো কাপ্তাই সুইডেন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে এটি স্থাপিত হলেও বর্তমানে ৯০% এর অধিক ছাত্রছাত্রী বহিরাগত। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একই অবস্থা সৃষ্টি হবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজ হয়ে দাঁড়াবে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ কেন্দ্রে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বহিরাগতদের ক্রমাগত অভিবাসন ও ভূমি বেদখল হওয়ার কারণে জুম্মদের জীবন-জীবিকা, পেশা ও ভূমি সংকট অত্যন্ত প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাদি আরো জটিলতর হতে পারে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। এটা জুম্ম ও স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্বাবহিতকরণ পূর্বক সম্মতি ব্যতিরেকে তাদের নিজস্ব জায়গা-জমি ও বসতবাটি হতে উচ্ছেদকরণ দেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিধানাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বিবেচনা করা যায়।

টাস্ক ফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত

নতুন সরকার গঠনের পর গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা, ভারত থেকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকৃত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন, শরণার্থীদের ব্যাঙ্ক ঋণ মওকুফ, প্রত্যাগত শরণার্থীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণীতে (খ) ও (গ) ক্রমিকে উল্লেখিত "অউপজাতীয় শরণার্থীগণকে সরকার ভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে" বাক্যটি বাদ দেয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা তুলে ধরেন। কেননা গত বৈঠকে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতেও অউপজাতীয় ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের কোন বিধান নেই। ২৭ জুন ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভা গৃহীত অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বিষয়ক নিম্নোক্ত পূর্ববর্তী সংজ্ঞা এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিতকরণের জন্য ২০ জুলাই ১৯৯৮ অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্সের চতুর্থ সভায় গৃহীত তথ্য সংগ্রহের পূর্ববর্তী ফরম সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় বলে জানা গেছে। টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভা গৃহীত অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু বিষয়ক সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

"১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৯২ সনের ১০ আগস্ট (অস্ত্র বিরতির শুরুর দিন পর্যন্ত) পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান) দীর্ঘ অশান্ত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে যে সকল উপজাতি নিজ গ্রাম, মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তারা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসাবে বিবেচিত হবেন।"

৭১২ জন প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ব্যাংক ঋণ এখনো মওকুফ করা হয়নি বলে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ না করে টাস্কফোর্সের অফিসের মাধ্যমে ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে জানা গেছে। প্রত্যাগত শরণার্থীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক গঠিত জেলা পর্যায়ের মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কমিটির মাধ্যমে মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল কর্তৃক দীঘিনালায় প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমিতে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করা প্রসঙ্গে উত্থাপন করা হলে টাস্কফোর্সের সদস্য-সচিব চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার বলেন, এটা টাস্কফোর্সের আওতাধীন বিষয় নয়। এ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী-সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় টাস্কফোর্সের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু এটা প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের উচ্ছেদ করে এই বিজিবি ক্যাম্প স্থাপিত হচ্ছে তাই এ বিষয়ে টাস্কফোর্সের করণীয় রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তনকারী জুম্ম শরণার্থীদের প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন কিছু আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি।

ঢাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধন বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ২৭ অক্টোবর ২০১৪ বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর উদ্যোগে ঢাকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর সংশোধন বিষয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ও সদস্য কে এস মং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং ও সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রেজাউল করিম হীরা এবং আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ শাখার জনৈক সচিব। বেলা ২:৩০ ঘটিকার সময় শুরু হওয়া এ বৈঠক প্রায় আড়াই ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

ভূমি কমিশন সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে উল্লেখ আছে যে, পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই ভূমি কমিশনের থাকবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে। এ কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।

বৈঠকের শুরুতে ড. গওহর রিজভী পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির স্বার্থে এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর সংশোধন বিষয়ে ঐকামত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরী বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এরপর জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা ও ভূমি কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট ও এর গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন কল্পে ১৩টি সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতক্রমে ঐকমত্য হওয়া সত্ত্বেও সরকার গত ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এ সংক্রান্ত বিলে ১৩টির মধ্যে মাত্র ৮টি সংশোধনী প্রস্তাব যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে উল্লেখ করেন। বাকী ৩টি সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত বিলে ত্রুটিপূর্ণভাবে উত্থাপিত হয় এবং ২টি সংশোধনী প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয় বলে তিনি জানান। শ্রী লারমা ত্রুটিপূর্ণভাবে উত্থাপিত ৩টি সংশোধনী প্রস্তাব এবং বাদে পড়া ২টি সংশোধনী প্রস্তাব মোট ৫টি সংশোধনী প্রস্তাবগুলো বৈঠকে একে একে তুলে ধরেন।

এ প্রেক্ষিতে প্রথমত: পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর ধারা ৬-এর উপধারা ১-এর দফা (ক), (খ) ও (গ)-এর "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি" শব্দাবলীর সাথে "পদ্ধতি" শব্দটি সন্নিবেশিত করা; এবং দ্বিতীয়ত: দফা (গ)-

এর "বন্দোবস্ত প্রদান করা" শব্দগুলির পরে "বা বেদখল" শব্দগুলি এবং "উক্ত বন্দোবস্তজনিত" শব্দগুলির পর "বা বেদখলজনিত" শব্দটি সন্নিবেশিত করা; তৃতীয়তঃ ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩)-এ কমিশনের বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর তিনজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে মর্মে সংশোধন করা বিষয়ে বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য হয়।

এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর ধারা ৬-এর উপধারা ১-এর শর্তাংশ বিষয়ে আলোচনা করার সময় বন বিভাগ কর্তৃক ১৯৮৯ সাল থেকে পদ্ধতি-বহির্ভূতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌজা বনসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন সংরক্ষিত ও অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলগুলোকে 'রক্ষিত বন' (রিজার্ভ ফরেস্ট) হিসেবে ঘোষণা পূর্বক অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে আদিবাসী জুম্মসহ স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্ছেদের মুখে পড়েছে বলে শ্রী লারমা তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনার একপর্যায়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ঘোষিত এসব নব সৃষ্ট রক্ষিত বন বাতিল ও অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংরক্ষিত বন ও অশ্রেণিভুক্ত বন বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। উক্ত শর্তাংশ বিষয়ে বৈঠকে বিশদ আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে দ্রুত আরেকটি বৈঠক আয়োজন করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উপসংহার

প্রসঙ্গত ইহাও উল্লেখ্য যে, গত ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার নির্বাচনী ইসতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করলেও সরকার এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদের (২০০৯-২০১৩) শেষ পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল ৯ম জাতীয় সংসদে উত্থাপন করলেও অবশেষে তা সংসদীয় কমিটিতে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। অপরদিকে গত ১-৩ জুলাই ২০১২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার ও প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর অনুষ্ঠিত এক সভার মাধ্যমে অহস্তান্তরিত বিষয়সমূহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের উদ্যোগ নিলেও তাও অকার্যকর অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে। ঝুলিয়ে রাখা উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ না নিয়ে সরকার উল্টো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন লঙ্ঘন করে একতরফাভাবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন প্রণয়ন এবং রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও পার্বত্যবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে এই অগণতান্ত্রিক ও জনবিরোধী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হলে, সর্বোপরি আদিবাসী জুম্মদের অধিকার ও অস্তিত্বকে বিপন্নতা দিকে ঠেলে দেয়া হলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এভাবে সরকারের তালবাহানার নীতি অব্যাহত থাকলে তার জন্য যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ভূমি বেদখল ও আদিবাসী জুম্মদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ

সম্প্রতি পাবত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় জুম্মদের আবাসভূমি ও ধর্মীয় স্থানসহ রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমি বেদখল এবং স্বভূমি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি নানা উদ্যোগের পাশাপাশি বিশেষ করে সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এই বেদখলের প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে সেনাক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে যত্রতত্র বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের তৎপরতা। এরসাথে পাল্লা দিয়ে আদিবাসী জুম্মদের আবাসভূমি, জুমভূমি, ভোগদখলীয় ও বিচরণভূমিতে অহরহ গড়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন পর্যটন স্পট, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, শপিং সেন্টার, বিলাসবহুল হোটেল, মোটেল ইত্যাদি নানা বিনোদন ও বাণিজ্য কেন্দ্র। সবচেয়ে ভয়াবহ আগ্রাসনের মুখে রয়েছে বান্দরবান পার্বত্য জেলা, তবে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিও পিছিয়ে নেয়। এতে অনেক আদিবাসী জুম্ম পরিবার হয় ইতোমধ্যে নিজের বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, নতুবা অনেকেই উচ্ছেদের মুখে রয়েছে।

বলাবাহুল্য, ইতিপূর্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানি ও ব্যক্তি কর্তৃক লীজ বা বাগান সৃজনের নামে এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থাপনা নির্মাণের নামে জুম্মদের হাজার হাজার ভূমি নানাভাবে বেদখল করা হয়েছে। সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য সরকার কেবলমাত্র বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ৭৫,৬৮৬ পাহাড়ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বনবিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত ও অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলের ২,১৮,০০০ একর ভূমি রিজার্ভ ফরেস্ট হিসেবে ঘোষণা করেছে। কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় ৭টি উপজেলায় ৩৫টি মৌজায় ৯৪,০৬৭ একর সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন প্রভাবশালী সামরিক-বেসামরিক আমলা, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশাজীবীদের কাছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বা শিল্প স্থাপনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে হাজার হাজার একর পাহাড়ভূমির ইজারা প্রদান করা হয়েছে। কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় ৪০,০৭৭ একর ভূমির ১৬০৫টি প্লট ইজারা প্রদান করা হয়েছে বহিরাগতদের কাছে। বলাবাহুল্য, এসমস্ত ঘটনাবলী জুম্মদের ভূমি অধিকার সুরক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারায় যেমনি গভীর সংকট সৃষ্টি করবে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও চরম এক জটিলতার দিকে ধাবিত করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির মধ্য দিয়ে যেখানে আদিবাসীদের ভূমি ও অধিকার সুরক্ষা করার কথা রয়েছে, সেখানে একের পর এক এধরনের কর্মকান্ডের ফলে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্বই ক্রমাগত বিলুপ্তির দিকে ধাবিত করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালের ভূমি বেদখলের কিছু চিত্র এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল।

১. ক্রাইক্ষ্যং পাড়া ও হাংসামা পাড়ায় জুম্মদের বসতি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শ্মশানভূমি দখল করে বিজিবি সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপনের উদ্যোগ

বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন হাপাইক্ষং মৌজায় প্রায় ১১টি পাড়ায় যুগ যুগ ধরে মারমা জাতিগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে আসছে, বর্তমানে যার জনসংখ্যা প্রায় ৮ শতাধিক পরিবার। এই হাপাইক্ষং মৌজার আয়তন প্রায় ৭,০০০ (সাত হাজার) একর। তন্মধ্যে বনবিভাগের দখলাধীন রয়েছে ৪,৫৫০ একর, ব্যবহার অনুপযোগী খাল, ঝিরি ও খাড়া পাহাড়-পর্বতের পরিমাণ প্রায় ১,০০০ একর। অবশিষ্ট ১,৪৫০ একর জায়গার মধ্যেও স্বল্প পরিমাণ সমতল চাষযোগ্য ভূমি রয়েছে।

উক্ত হাপাইক্ষং মৌজাধীন বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়কে অবস্থিত ক্রাইক্ষ্যং পাড়া ও হাংসামা পাড়ায় কয়েকশ মারমা পরিবার বসবাস করে আসছে। কিন্তু আগস্ট ২০১৪ হতে বিজিবি সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। অধিগ্রহণের জন্য প্রার্থিত জায়গায় ক্রাইক্ষ্যং পাড়া ও হাংসামা পাড়ার মারমা অধিবাসীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শ্মশানের জায়গাসহ ভোগদখলীয় ও বন্দোবস্তীর জন্য প্রক্রিয়াধীন জায়গা রয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় জুম্মদের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির সাথে এই ভূমির রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এই ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে বা এতে বিজিবি সদর দপ্তর স্থাপন করা হলে অনেক জুম্ম পরিবার যেমন উচ্ছেদের সম্মুখীন হবে তেমনি আশেপাশের অনেক জুম্মবসতিতেও তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাই সংশ্লিষ্ট হেডম্যান উক্ত স্থানে বিজিবি সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু এলাকাবাসীর আপত্তি সত্ত্বেও এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই বিজিবি কর্তৃপক্ষ তা বেদখলের উদ্দেশ্যে উক্ত জায়গায় লাল পতাকা টাঙিয়ে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিক ও এলাকাবাসীদের সেখানে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এতে

সংশ্লিষ্ট এলাকার জুম্ম জনগণের দৈনন্দিন জীবনে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার বাস্তবতা সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, এর আগে বিজিবি কর্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্তী ছাইঙ্গ্যা তেঁতুলিয়া পাড়া ও রামজাদি বিহার সংলগ্ন এলাকা দখলের চেষ্টা করে। তখনও এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ ও আন্দোলন করা হলে পরে আবার ক্রাইক্ষ্যং পাড়া ও হাংসামা পাড়ায় এই অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এমতাবস্থায় গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ক্রাইক্ষ্যং পাড়া ও হাংসামা পাড়ায় বিজিবি সেক্টর সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি জানিয়ে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, বিজিবির মহাপরিচালক ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এর বরাবরে অনুলিপি প্রেরণ করা। এর আগে এলাকার কার্বারী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বারগণসহ এলাকার জনগণ উক্ত বিজিবি সদর দপ্তর স্থাপনের প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানের বরাবরে আবেদন পত্র পেশ করেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া বাতিলের খবর জানা যায়নি।

রুমা উপজেলার পাইন্দু মৌজা ও পলি মৌজার পাইন্দু পাড়া, চান্দু পাড়া ও চাইপো পাড়ার প্রায় ৫০০ মারমা পরিবারকে উচ্ছেদ করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন, রোয়াংছড়ি উপজেলায় রামজাদি জায়গা দখল করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া যার মধ্যে বাবুছড়ায় জুম্ম গ্রামবাসী ও বিজিবি-পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা সারাদেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

২. লামায় লাদেন গ্রুপ কর্তৃক সম্প্রতি আরও ৭৪ জুম্ম পরিবার উচ্ছেদ করে জমি জবরদখল, শত শত পরিবার উচ্ছেদের মুখে

লামায় দীর্ঘ দিন ধরে বান্দরবানের অন্যতম ভূমি আগ্রাসী কক্সবাজার নিবাসী মো: আনিসুর রহমান ওরফে লাদেন ও মো: মোহসিন বাদল এর নেতৃত্বে তথাকথিত লাদেন গ্রুপের নামে বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় জুম্মদের ভূমি বেদখলের অপচেষ্টা চলে আসছে। এতে ইতোমধ্যে মারমা, ত্রিপুরা, ম্রোসহ অনেক জুম্ম পরিবার স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়েছে এবং শত শত পরিবারে উচ্ছেদের মুখে জীবনযাপন করছে। গত ২১ মে ২০১৪ এই ভূমি আগ্রাসনের প্রতিকার চেয়ে বিভিন্ন মৌজার বিভিন্ন গ্রামের ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা ২৭০ জন স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরণ করে। এছাড়া বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের বরাবরেও স্মারকলিপির অনুলিপি প্রেরণ করে।

জানা গেছে, সাঙ্গু মৌজা ও ইয়াংছা মৌজার পাশাপাশি চারটি গ্রামের ৩০ বছরাধিক আগে থেকে গড়ে তোলা ফলজ-বনজ বাগানসহ ১৭৫ একর বন্দোবস্তীকৃত জায়গা জবরদখল করে অন্তত ৭৪ পরিবার ত্রিপুরা, মারমা ও ম্রো গ্রামবাসীকে ইতোমধ্যে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে একই মৌজার আরও ৯টি পাড়ার প্রায় ৫০০ পরিবারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, এই লাদেন গ্রুপের অধিকাংশই টেকনাফ, উখিয়া ও কক্সবাজার এলাকায় অবস্থিত রোহিঙ্গ্যা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে আসা সন্দেহজনক ব্যক্তি, যারা বিভিন্ন চোরাচালান, মাদকব্যবসা, বিভিন্ন অপরাধচক্র এবং রোহিঙ্গা সলিটারি অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত বলে জানা যায়।

জানা যায়, এই লাদেন গ্রুপ ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে ভাড়াটে সন্ত্রাসী দিয়ে ২১ মার্চ ২০১৪ উল্লিখিত এলাকার দুর্গম গ্রামে ক্যজাইমং মারমা (৬০) নামের এক গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে। এর প্রায় সাত দিন পর ২৮ মার্চ ২০১৪ উক্ত লাদেন গ্রুপ খুন হওয়া ক্যজাইমং মারমার বাড়িসহ অন্তত ২১ পরিবারের বিভিন্ন বাগান ও চাষিলা জমিসহ আবাসভূমি বাচিং পাড়ার প্রায় ৩০০ একর ভূমি বেদখল করে নেয়। বর্তমানে ঐ জায়গায় একদল সশস্ত্র রোহিঙ্গা সদস্য লাদেন গ্রুপের পাহাড়াদার হিসেবে অবস্থান করছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

এছাড়া এই লাদেন গ্রুপের অব্যাহত খুন, সন্ত্রাস, হুমকি, মিথ্যা মামলাসহ বিভিন্ন হয়রানিমূলক কর্মকান্ডের কবলে পরে সাঙ্গু মৌজার আরও ১১টি পাড়ার প্রায় ২২১ পরিবার অচিরেই স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হবে বলে এলাকাবাসীর আশঙ্কা। এছাড়া ইয়াংছা মৌজায় ৯৩ পরিবার ত্রিপুরা অধ্যুষিত কাঠালছড়া পাড়া সংলগ্ন ত্রিপুরাদের সৃজিত বাগান এলাকায় রাবার বাগানের নামে প্রায় ৬০ একর ভূমি বেদখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে ঐ এলাকার ত্রিপুরা পরিবারসমূহ অচিরেই উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে।

উল্লেখ্য, লাদেন গ্রুপ ছাড়াও আরও বিভিন্ন মহল এই এলাকায় জুম্মদের ভূমি বেদখলের জন্য সদা উন্মুখ থাকে। যেমন-গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সকাল ৮.০০টায় ভূমিদস্যু সেটেলার মুজিবুল হক মাষ্টার (মুজিবুল লিডার) গ্রুপের ২০-৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল লামা উপজেলার রূপসী ইউনিয়নের পলিঝিড়ি (পলিক্ষ্যং) এলাকায় জুম্মদের ভূমি জবরদখল করতে গেলে জুমে কর্মরত জুম্মদের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় ২ জন মহিলাসহ ৮ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী আহত হয়। সন্ত্রাসীরা জুম্মদের জুমঘরও ভেঙে দেয়। আরও উল্লেখ্য যে, দড়দড়ি মৌজার পলিঝিড়ি এলাকায় উশৈহ্লা মারমাসহ ম্রাচাই পাড়াবাসীর বাগান ও জুম রয়েছে। ইতিপূর্বে মুজিবুল গ্রুপের লোকেরা আরও একবার ঐ জায়গা বেদখলের চেষ্টা করলে জুম্ম গ্রামবাসীর বাধা দেয়ার কারণে ব্যর্থ হয়। ভূমিদস্যু মজিবুল হকের সন্ত্রাসী গ্রুপের লোকেরা এলাকায় ভূমি জোরপূর্বক দখল করে বাইরে কোম্পানির হাতে তুলে দিত।

৩. আলীকদমে লীজের নামেও হাজার হাজার জুম্ম ভূমি বহিরাগতদের বেদখলে

ম্রো, ত্রিপুরা, মারমা ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত বান্দরবানের অন্যতম প্রত্যন্ত উপজেলা আলীকদম। মূলত জুমচাষই এই এলাকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। কিন্তু বিভিন্ন বহিরাগত ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে লীজ গ্রহণ ও হুমকি-ধামকিসহ জুম্মদের ভূমি বেদখলের অপচেষ্টার কারণে জুম নির্ভর অনেক জুম্ম পরিবার আজ উচ্ছেদের মুখে।

জানা যায়, বদিউল আলম নামে বহিরাগত এক ভূমিদস্যু ইতোমধ্যে রাবার ও হর্টিকালচার প্লট লীজের নামে উপজেলার তৈনফা মৌজাসহ ২৮৮নং আলীকদম মৌজা, চৈক্ষাং মৌজা ও তৈন মৌজায় কাগজেপত্রে ১,৩৫০ একর পাহাড় ভূমি দখলের কথা থাকলেও বাস্তবে আনুমানিক অন্তত ১০,০০০ একরের অধিক ভূমি বেদখল করেছেন বলে এলাকাবাসীর মত। এসময় এই বদিউল আলম ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা তৈনফা মৌজার উকিং ম্রো পাড়া, চোনং ম্রো পাড়া, প্রভাত ত্রিপুরা পাড়া, ধর্মচরণ ত্রিপুরা পাড়া, লনডন ম্রো পাড়া, মেন তঞ্চঙ্গ্যা পাড়া, ভাবি ম্রো পাড়া, কালাবুরি মার্মা পাড়া, দমচিং পাড়া এলাকায় জুম্মদের প্রথাগত ভোগদখলীয় জমি জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। ফলে সংশ্লিষ্ট ২১টি পাড়ার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪টি পাড়ার মানুষ উচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং বাদবাকী পাড়াবাসীও প্রতিনিয়ত বদিউল আলমের লোকজনের হুমকির মুখে উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। এই বেদখলের হাত থেকে স্থানীয় বাঙালি পরিবারগুলোও রেহাই পাচ্ছে না। এই বদিউল আলমের সন্ত্রাসীরা প্রায়ই জুম্ম গ্রামবাসীদের সৃজিত বিভিন্ন ফলজ ও বনজ গাছ কেটে দিয়ে যাচ্ছে এবং বাড়াবাড়ি করলে মিথ্যা মামলা দেয়া হবে, মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। এই বদিউল আলম থানা, পুলিশসহ স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু কিছু নেতাকেও কিনে ফেলেছেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

এছাড়া নাইক্ষ্যংছড়িতে ২১টি চাক পরিবারকে উচ্ছেদ করে বহিরাগত প্রভাবশালী কর্তৃক তাদের জায়গা-জমি জবরদখল ও কামিছড়া মৌজায় প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ কর্তৃক ব্যাপক জুম ভূমি জবরদখলের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যা রাষ্ট্রযন্ত্রের মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখলের ক্ষেত্রে মাৎস্যন্যায়ের অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে।

৪. পর্যটন কেন্দ্র, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্টের নামে বিভিন্ন পাহাড় দখল

বান্দরবানে জুম্মদের বাস্তুভিটা ও বাগান-বাগিচা বেদখল ছাড়াও কেবল সেনাবাহিনীর উদ্যোগে পর্যটন কেন্দ্র, রিসোর্ট, বিলাসবহুল হোটেল-মোটেল বা রেস্টুরেন্ট স্থাপনের কারণে জুম্মদের অনেক জুমভূমি এখন তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে তাদের জীবন-জীবিকার পরিসর অনেক ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। জানা যায়, এসব পাহাড় দখল বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমির উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তার কয়েকগুণ ভূমি দখলের আওতায় আনা হয় বলে জানা যায়। জানা যায়, সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত 'নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র'এর জন্য দলিল অনুযায়ী নির্ধারিত জায়গা ১৬ একর হলেও বাস্তবে এই পর্যটন কেন্দ্রের দখলে রয়েছে অন্তত ৬০ একর ভূমি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন বহির্ভূতভাবে সেনাবাহিনীর পরিচালিত বিলাসবহুল বাণিজ্যিক কেন্দ্র (রিসোর্ট, রেষ্টুরেন্ট, শপিং সেন্টার বা দোকান ইত্যাদি) স্থাপনের জন্য চিম্বুক পাহাড়ের ডলা ম্রো পাড়া (জীবন নগর), কাপ্রু ম্রো পাড়া (নীলগিরি), চিম্বুক ১৬ (ষোল) মাইল, ওয়াইজংশন (১২ মাইল), রুমার কেওক্রাডং পাহাড়ের কেওক্রাডং চূড়ায় হতদরিদ্র ও সার্বিকভাবে অনগ্রসর জুম্মদের বিপুল পরিমাণ জুমভূমি বেদখলের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। সেনাবাহিনীর এসমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে যুগ যুগ ধরে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জুম্মদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। বিশেষ করে এ অঞ্চলের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ম্রো ও বম জনগোষ্ঠী ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এদিকে চিম্বুক পাহাড়ের কাপ্রু ম্রো পাড়া এলাকায় বিলাসবহুল নীলগিরি অবকাশ যাপন কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য স্থাপিত নীলগিরি সেনা ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষ ও বান্দরবানের ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের কর্মকর্তারা কাপ্রু ম্রো পাড়ার নীলগিরি হতে জীবন নগর পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এমনকি স্থানীয়দের কোন প্রকার উদ্যান বাগান ও অন্যান্য কাজ করতে দিচ্ছেন না বলে জানা গেছে। সেই বিশাল জমি (আনুমানিক ৬০০ একর) সেনাবাহিনীর নামে নেওয়া হয়েছে বলে সেনা কর্মকর্তারা দাবি করছে। ফলে এই এলাকার আদিবাসী জুম্মরাও নিশ্চিতভাবে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে চলেছে। তবে দলিলপত্রে জীবন নগর এলাকায় ১৬ (ষোল) একর জমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বন্দোবস্ত দেয়া হলেও ঐ ১৬ (ষোল) একর জমি কেন এবং কোন কাজে সেনাবাহিনীকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই বলে জানা যায়।

এছাড়া সম্প্রতি রুমা উপজেলায় অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাহাড় কেওক্রাডং এর চূড়ায়ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রুমা জোনের সেনাবাহিনী জায়গা পরিমাপ করেছে বলে স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা ও মুরুব্বীদের কোন কিছু না জানিয়ে তারা সম্পূর্ণ গোপনীয়ভাবে এবং নিজেদের ইচ্ছেমত কাজ করছে।

৫. খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করে জুম্মদের উচ্ছেদ

সাম্প্রতিককালে ভূমি বেদখল ও জুম্ম উচ্ছেদের চেষ্টার অন্যতম ঘটনা হল দীঘিনালার বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের জন্য জুম্মদের ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ। দীঘিনালার যত্ন কুমার কার্বারী পাড়া ও শশী মোহন কার্বারী পাড়ার জুম্মরা সেনাক্যাম্পের কারণে যেখানে নিজ ভূমিতে বসত গড়তে পারছে না, সেখানে আরও একটি বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করার পাঁয়তারা করে চিরতরে জুম্মদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

জানা গেছে, ১৯৮৬ সালে যত্ন কুমার কার্বারী পাড়া ও শশী মোহন কার্বারী পাড়ার জুম্মরা সবাই যখন পরিস্থিতির কারণে ভারতে শরণার্থীতে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তপ্ত ঠিক সেই সময়ে সেই গ্রাম দুটিতে একটি সেনাক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ক্যাম্পটি যত্ন কুমার কার্বারী পাড়ার মনো রঞ্জন চাকমার রের্কডীয় ২.০০ একর টিলা জমিতে তখনকার সময়ে স্থাপন করা হয় এবং জমির মালিক মনোরঞ্জন চাকমাকে তখন থেকে জমির বর্গা দিয়ে আসা হচ্ছিল। পরবর্তীতে শরণার্থীরা যখন ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে, তখনই দুই গ্রামবাসী মোট ৫৮ পরিবার তাদের নিজ নিজ গ্রামে বসতবাড়ী গড়তে চায়। কিন্তু ক্যাম্পের সেনারা তাদের গ্রামে ঘর তুলতে বাধা প্রদান করে। ফলে ঐ ৫৮ পরিবার তাদের পুরানো গ্রামে এখনও ফিরে যেতে পারেনি। তারা বর্তমানে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

উপরন্তু, ২০০৫ সালে বিজিবি ৫১ ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার আওতাধীন দীঘিনালা ইউনিয়নের অর্ন্তগত যত্ন মোহন কার্বারী পাড়া ও শশী মোহন কার্বারী পাড়ার ৪৫.০ (পয়তাল্লিশ) একর টিলা ও ধান্য জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়। তারই অংশ হিসেবে গত ৩১ মার্চ ২০০৫ তারিখে উক্ত জমি হুকুম দখলের জন্য উক্ত পাড়ার ১১ পরিবার পাহাড়িকে নোটিশ প্রদান করা হয় এবং নোটিশ জারির সাথে সাথে ৪৫.০ একর জমি পরিচিহ্নিত করে লাল পতাকা দ্বারা বেষ্টনী দেয়া হয়। উল্লিখিত ১১ পরিবার নোটিশ পাওয়ার পর উক্ত নোটিশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করে। এর প্রেক্ষিতে গত ২৩ মে ২০০৫ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট উক্ত ৪৫.০ একর হুকুম দখলের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন। স্থগিতাদেশ বহাল থাকা অবস্থায় গত ১৪ মে ২০১৪ বিজিবি রাতে গোপনে উক্ত জায়গা দখলে নেয় এবং ১৫ মে ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক বিজিবি ব্যাটেলিয়নকে বুঝিয়ে দেন। পক্ষান্তরে গত ১০ জুন ২০১৪ তারিখে বিকাল ৪.০০টার সময় যত্ন কুমার কার্বারী ও শশী মোহন কার্বারী পাড়ার প্রায় শতাধিক পাহাড়ি অধিবাসীরা উক্ত জায়গায় কলাগাছ রোপণ করতে গেলে বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে বাধা প্রদান করে। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় ১৮ (আটার) জন জুম্ম আহত হন বলে জানা যায়।

৬. মাটিরাঙ্গায় তিন জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ

খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার ২০৭নং ওয়াসু মৌজার চালতাছড়ায়ও তিন জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ করে একটি বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। জানা যায়, উক্ত নতুন ক্যাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা অংশ হিসেবে গত ৬ মে ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার পলাশপুর বিজিবি জোন কম্যান্ডার লেঃ কর্ণেল মোখলেসুর রহমান (২৯ ব্যাটালিয়ন) মাটিরাঙ্গা সদর থেকে সার্ভেয়র নিয়ে ২০৭ নং ওয়াসু মৌজার চালতাছড়ার ৩ গ্রামবাসীর মালিকানাধীন বসত ভিটা, বাগান-বাগিচা ও জুমভূমির উপর জরিপ চালান। উক্ত তিন গ্রামবাসীর মালিকানায় প্রায় আট একর পরিমাণ জায়গা রয়েছে বলে জানা যায়। উক্ত কম্যান্ডার জায়গাটি ক্যাম্পের নামে বন্দোবস্তীর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করছেন বলেও এলাকাবাসীর সূত্র জানায়। যদিও বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলায় বন্দোবস্তী প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। যাদের জায়গা জরিপ করা হয়েছে সেই তিন জুম্মর নাম হচ্ছে–(১) ভুবন মোহন ত্রিপুরা (৪৫), (২) জনি কুমার ত্রিপুরা (৩৫) ও (৩) মোহন ত্রিপুরা (৩৮)।

জানা যায়, প্রায় এক বছর আগেও উক্ত জায়গাগুলিতে ফেনী ও হেঁয়াকো (রামগড়ে অবস্থানরত সেটেলার) থেকে সেটেলার বাঙালি এনে উক্ত জায়গা বেদখল করার চেষ্টা চালানো হয়। এলাকাবাসীদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে ঐ সেটেলাররা চলে যেতে বাধ্য হয়। এলাকাবাসীর ধারণা, উক্ত এলাকায় একটি ক্যাম্প স্থাপন করে সেখানে আরও পূর্বের মত সেটেলার বসিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে।

৭. রাঙ্গামাটির সাজেক পাহাড়েও সেনাবাহিনী ও বিজিবর পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন

রাঙ্গামাটির বিভিন্ন শহর এলাকা ছাড়াও সেনাবাহিনী ও বিজিবির উদ্যোগে জেলার অন্যতম পাহাড়ি ও জুম্ম অধ্যুষিত এলাকা সাজেক পাহাড়ে রুইলুই ভ্যালিতে সম্প্রতি নির্মাণ করা হয়েছে বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র। ইতিমধ্যে পাঁচটি পরিবার উচ্ছেদ করা হয়েছে। দু'টি গ্রামের আরো ৬৫টি জুম্ম পরিবার উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে রয়েছে। যে এলাকার মানুষ এখনও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ বিভিন্ন অধিকার থেকে সুদূরে রয়েছে এবং যে এলাকার মানুষ বহিরাগতদের আগ্রাসনে প্রতিনিয়ত শঙ্কিত ভবিষ্যত নিয়ে দিনযাপন করছে সেই এলাকায়ই এই পর্যটন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, এই পর্যটন কেন্দ্র দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। এজন্য সেনাবাহিনী ও বিজিবির উদ্যোগে নির্মাণ করা হয়েছে বিলাসবহুল কটেজ, সুদৃশ্য সড়কসহ বিভিন্ন ব্যয়বহুল অবকাঠামো। জানা যায়, কোটি টাকা ব্যয়ে সেনাবাহিনীর তৈরী কটেজের নাম দেয়া হয় থ্রিস্টার কটেজ আর বিজিবির তৈরী কটেজের নাম দেয়া হয় রুনময়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় জুম্মদের অধিকার ও জাতীয় অস্তিত্ব যেখানে অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা বিবেচনা না করে নির্বিচারে পার্বত্য এলাকার যত্রতত্র বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ জুম্ম জনগণের জন্য এবং এ অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন সুফল বয়ে আনবে না বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা। সর্বোপরি এতে সাধারণ জুম্মদের ক্ষতি বৈ কোন সুফল আশা করা যায় না।

৮. বনবিভাগ কর্তৃক মৌজা ভূমিকে অবৈধভাবে রিজার্ভ বন ঘোষণা

অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে লঙ্ঘন করে বনবিভাগ কর্তৃক বন আইন ১৯২৭-এর ২০ ধারার অধীনে রক্ষিত বন (রিজার্ভ ফরেস্ট) হিসেবে ঘোষিত রাঙ্গামাটি জেলার ২২টি মৌজার ৮৪,৫৪২.৪২ একর মৌজা ভূমি

অধিগ্রহণের কাজ জোরদার করা হয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় উক্ত মৌজা ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে জানা গেছে।

তারই অংশ হিসেবে গত ৭ জুলাই ২০১৪ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব) ও ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক ডেপুটি কমিশনারের কাছে এক প্রতিবেদন জমা দেন। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বন আইনের ৯ ধারা মোতাবেক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ২০টি মৌজার হেডম্যানদের প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনভূমির বিষয়ে আপত্তির প্রেক্ষিতে বিশটি মৌজা যথাক্রমে ১। ১৩০নং বারুদগুলা মৌজা, ২। ১২৮নং বসন্ত মৌজা, ৩। ১২২নং কুতুবদিয়া মৌজা, ৪। ১৩১নং বল্লাছড়ি মৌজা, ৫। ১০৮নং মানিকছড়ি মৌজা, ৬। ৯৯নং ঘাগড়া মৌজা, ৭। ১২৭নং আটারকছড়া মৌজা, ৮। ৫৭নং উল্টাছড়ি মৌজা, ৯। ১২৩নং হেমন্ত মৌজা, ১০। ১০৯নং সাপছড়ি মৌজা, ১১। ১১১নং কুতুবছড়ি মৌজা, ১২। ১১০নং শুকুরছড়ি মৌজা, ১৩। ১২৫নং ফুলগাজী মৌজা, ১৪। ১২৯নং কাইন্দা মৌজা, ১৫। ৭৯নং কেঙ্গেলছড়ি মৌজা, ১৬। ৭৭নং তৈচাকমা মৌজা, ১৭। ৭০নং হাজাছড়ি মৌজা, ১৮। ৬৯নং ঘিলাছড়ি মৌজা, ১৯। ৬৯নং চৌধুরীছড়া মৌজা ও ২০। ৩নং লংগদু মৌজার হেডম্যানগণ ও বন বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গত ২৯ জুন ২০১৪ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ৬ জুলাই ২০১৪ তারিখে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ও বন বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ ১১০নং শুকুরছড়ি মৌজা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনে শুকুরছড়ি মৌজায় প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনভূমির জন্য ৫০০ (পাঁচশত) একর জমির মধ্যে ৪৬টি পরিবার যথাযথ প্রক্রিয়ায় বন্দোবস্তী পেয়ে বসবাস করছেন এবং বাকি ৪২টি পরিবার বন্দোবস্তীর জন্য আবেদন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বসতভিটা ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির বনজ ও ফলজ বাগান সৃজন করেছেন। উক্ত এলাকায় দখলমুক্ত কোন জমি নেই বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য মৌজার হেডম্যানরা জানিয়েছেন যে, তাদের মৌজাগুলিতেও দখলীয় কোন জমি নেই। কেউ যথাযথ প্রক্রিয়ায় বন্দোবস্তী নিয়ে এবং কেউ বন্দোবস্তীর জন্য আবেদন করে ফলজ ও বনজ বাগান সৃজনসহ বসতভিটা নির্মাণ করে অনেক পূর্ব থেকে বসবাস করে আসছেন বলেও প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করলে অনেক লোকজনকে উচ্ছেদ করতে হবে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে সমীচীন নয় বলে প্রতিবেদনে মতামত দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২৫ জুন ১৯৯০ থেকে ৩১ মে ১৯৯৮ তারিখের জারীকৃত বিভিন্ন গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২,১৮,০০০ (দুই লক্ষ আটার হাজার) একর জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব জমির মধ্যে রয়েছে বন্দোবস্তীকৃত বসতভিটা এবং ফল ও বনবাগানের জমি, বন্দোবস্তীর প্রক্রিয়াধীন জমি, প্রথাগত আইনের আওতায় মালিকানাধীন জুম ভূমি ও ভোগদলীয় জমিসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বনবিভাগের জুম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জমিয়া পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার আওতাধীনে পুনর্বাসিত লোকজনের জমি। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে প্রায় দুই লক্ষ পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসী তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে।

জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ ও হত্যা

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের উপর দেশের শাসকগোষ্ঠী ও প্রশাসনের বৈষম্য, নিপীড়ন, আগ্রাসন ও অবমাননামূলক আচরণ ও কর্মকান্ডের একটি ন্যাক্কারজনক দিক হচ্ছে আদিবাসী জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত না হওয়া এবং দোষীদের বিচারের আওতায় না আনা বা আনলেও অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী সময়ের মতই এখনও জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা যেমন ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, খুন, ধর্ষণের চেষ্টা, অপহরণ ইত্যাদি অব্যাহতভাবে সংঘটিত হয়ে চলেছে। গত ২২ নভেম্বর ২০১৩ হতে গত ৩ নভেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় অন্তত ৩ জন জুম্ম নারী ও শিশু ধর্ষণের পর হত্যা, ১ জন খুন, ৯ জন ধর্ষণ, ৭ জন ধর্ষণের চেষ্টার শিকার, ৩ জন অপহরণ ও ২ জন অপহরণের চেষ্টার শিকার হয়েছেন। উক্ত সহিংস ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নে তুলে ধরা হল–

রামগড়ে তৃতীয় শ্রেণির এক আদিবাসী ত্রিপুরা শিশু ধর্ষিত

গত ২২ নভেম্বর ২০১৩ সকাল সাড়ে দশটায় খাগড়াছড়ি'র রামগড় উপজেলার তৈচাকমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণির এক আদিবাসী ত্রিপুরা শিশু সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। জানা যায়, ঘটনার দিন তৈচাকমা গ্রামের বাসিন্দা লয়া চান ত্রিপুরা তার অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে নাকাপা বাজারে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যায়। এ সময় হাতুড়ে ডাক্তার মো: ইকবাল হাসানের (৩৪) চেম্বারে গেলে শিশুটির বাবাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে এবং অসুস্থ শিশুটিকে চিকিৎসার নামে চেম্বারের ভেতরে নিয়ে যায়। শিশুটির ভাষ্যমতে এ সময়ে লম্পট মো: ইকবাল হাসান তাকে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে শিশুটির চিৎকারে লম্পট মো: ইকবাল হোসেন তাকে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য স্থানীয় বাঙালি নেতৃবৃন্দ ও আওয়ামীলীগ নেতা মনিন্দ্র লাল ত্রিপুরা সালিশের নামে ধর্ষক মো: ইকবাল হোসেনকে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে ৬ষ্ঠ শ্রেণির একজন মারমা শিশু ধর্ষিত

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইসছড়ি ইউনিয়নের সাদোঅং পাড়ার ১৩ বছরের ৬ষ্ঠ শ্রেণির এক মারমা ছাত্রীকে বাইশারী সদরের মো: জসিম (২৫), পীং নুরুল ইসলাম গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ রাত ১০.০০ টায় মেয়েটি নিজ বাড়িতে ফেরার পথে একা পেয়ে ধর্ষণ করে। ঐ দিন রাতে মেয়েটি সাদোঅং পাড়ার বৌদ্ধ বিহারে পরলোকগত ভিক্ষুর অন্তোষ্টিক্রিয়ার জন্য মারমা সমাজের রীতি অনুযায়ী স্বইংনাচ (ভিক্ষুদের অন্তোষ্টিক্রিয়ায় দলগতকসরৎ) অনুশীলন শেষে বিহার থেকে নিজ বাড়ি ফিরছিল। ঘটনাটি জানাজানি হলে পাড়াবাসী ধর্ষককে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করে, যার মামলা নং–১/১৬, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ধারা-৯/১-এ নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় মামলা হয়েছে। মেয়েটিকে এখন ডাক্তারি পরীক্ষা জন্য বান্দরবান হাসপাতালে নেয়া হয়।

খাগড়াছড়িতে একজন জুম্ম নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ আনুমানিক দুপুর ১২টায় খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার কমলছড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত কলমছড়ি চেঙ্গী চর এলাকায় সবিতা চাকমা (৩০) নামের এক জুম্ম নারী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে কমলছড়ি মুখ পাড়ার বাসিন্দা এক সন্তানের জননী সবিতা চাকমা স্বামী দেব রতন চাকমা চেঙ্গী নদীর চরে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যায়। সেখানে পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে কর্মরত অনেকে তাকে দুপুর পর্যন্ত ঘাস কাটতে দেখেছে। দুপুরের আহারের জন্য অন্যরা স্ব স্ব বাড়িতে চলে আসলে সবিতা চাকমা ঘাস কাটতে থাকে। এরপর সবিতা চাকমা সারাদিন বাড়িতে ফিরে না আসায় তার স্বামী দেব রতন চাকমাসহ এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে তাকে খোঁজ করতে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বিকাল সাড়ে পাঁচটায় একটি ঝোঁপের ভেতরে সবিতা চাকমার বিবস্ত্র লাশ খুঁজে পান। ঘটনাটি পুলিশকে জানানোর পর খাগড়াছড়ি সদর থানার পুলিশ ও ভূয়াছড়ি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। ঘটনার সময় সেখানে চেঙ্গী নদী থেকে একদল সেটেলার বাঙালি ট্রাক্টরে বালু উত্তোলন করছিল। সেটেলাররা যে স্থান থেকে বালু উত্তোলন করছিল তার পাশেই সবিতা চাকমার ব্যবহৃত সেন্ডেল, সুইটার, ঘাস কাটার কাঁচি ও ঘাসের বস্তা পাওয়া গেছে। তাকে হত্যার পর লাশটি ঘটনাস্থল থেকে ১০/১২ গজ দুরে টেনে হেঁচড়ে একটি ঝোঁপের মধ্যে ফেলে রাখা হয়। উক্ত শ্রমিকরা ঘটনাটি সংঘটিত করেছে বলে এলাকাবাসী দাবি করছেন। সবিতা চাকমার গলায় পরা সাত আনা ওজনের সোনার চেইনও দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে যায়। বালু উত্তোলনকারী শ্রমিকদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে তারা হলো- (১) ট্রাক্টরের ড্রাইভার মো: নিজাম, (২) ভূয়াছড়ি সেটেলার পাড়ার বাসিন্দা (বর্তমানে গঞ্জপাড়ায়

বসবাসকারী) মো: রাজ্জাক, (৩) গঙ্গপাড়ার বাসিন্দা জিয়াউল হক, (৪) ভূয়াছড়ির বাসিন্দা মো: আনোয়ার। উক্ত ট্রাক্টরের মালিকের নাম মো: নজরুল বলে জানা গেছে। উদ্ধারের পর সেদিন সন্ধ্যায় ময়নাতদন্তের জন্য সবিতা চাকমার লাশ খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নিহতের স্বামী দেব রতন চাকমা খাগড়াছড়ি সদর থানায় একটি হত্যা ও ধর্ষণের মামলা দায়ের করে।

উল্লেখ্য যে, কমলছড়ি এলাকায় অবস্থিত ভূয়া সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে জায়গা-জমি দখলের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক হামলা, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি ন্যাক্কারজনক ঘটনা চালিয়ে আসছে। গত ১ অক্টোবর ২০১১ এ ধরনের একটি ঘটনায় কমলছড়ি গ্রামের প্রতিমা চাকমাকে (৩২) সেটেলার বাঙালিরা হত্যা করে। সেসময় প্রতিমা চাকমার স্বামী প্রীতি বিকাশ চাকমা খাগড়াছড়ি সদর থানায় মো: রফিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

সাজেকের লক্ষীছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণ চেষ্টা

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের লক্ষীছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায় যে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ দুপুর পৌনে ১২টার দিকে লক্ষীছড়ি সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার (সুবেদার) কাদের ও তার এক বডিগার্ড ক্যাম্পের পাশ্ববর্তী লক্ষীছড়ি বাজারে (কয়েকটি দোকানের সমন্বয়ে গড়ে তোলা) লাকড়ি কিনতে যান। সেখানে যাওয়ার পর তারা বাজারের পাশে একটি বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। এ সময় ওই বাড়িতে থাকা ২৮ বছরের এক পাহাড়ি নারীকে সুবেদার কাদের পিছন দিক থেকে ঝাপটে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় ওই নারী বাড়িতে একাই ছিলেন এবং চাউল বাছাইয়ের কাজ করছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ওই নারী চিৎকার করলে আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে। সেনা সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে পালিয়ে যায়।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনা অস্বীকার করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের লক্ষীছড়ি আর্মি ক্যাম্পের টহল দলের একজন সদস্য টহলরত অবস্থায় লক্ষীছড়ি বাজারসংলগ্ন দীন মোহন চাকমার বাড়ির আঙিনায় উপস্থিত হলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে এর অবসান ঘটে। কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলের একটি বিশেষ মহল এ ঘটনাকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে ইস্যু তৈরির চেষ্টা করছে। ঘটনাটি সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হওয়ার পরপরই উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উল্লিখিত অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সেনা সদস্যের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাটিরাঙ্গায় একজন আদিবাসী ত্রিপুরা ছাত্রী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সকাল ১১ টায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের প্রাণ কুমার পাড়ায় এক আদিবাসী ত্রিপুরা ছাত্রী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। সে খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্রী।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে ওই ছাত্রী তরকারি খুঁজতে জঙ্গলে যায়। তরকারি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তাকে একা পেয়ে দু'জন সেটেলার যুবক জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে ছাত্রীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে। অভিযুক্ত ধর্ষক সেটেলার বাঙালিরা হল- আব্দুল খালেক মিয়া (২২), পিতা আব্দুল রহিম মিয়া, গ্রাম- রামশিরা পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি এবং মো: তারু মিয়া (২৩), পিতা মৃত লাল মিয়া, গ্রাম- রামশিরা পাড়া, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি।

মানিকছড়িতে সেটেলার বাঙালি যুবক কর্তৃক এক জুম্ম মারমা কিশোরী ধর্ষিত

গত ৭ মার্চ ২০১৪ দুপুর সাড়ে বারটায় খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় পিচলাতলা নামক স্থানে তিনজন সেটেলার বাঙালি যুবক কর্তৃক সতের বছরের এক আদিবাসী মারমা কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

জানা যায়, ধর্ষিত ওই কিশোরী চট্টগ্রামের একটি বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। ঘটনার দিন সকালে ওই কিশোরী চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি যায়। পরে খাগড়াছড়ি থেকে ফেনীর গাড়িতে ওঠে জালিয়াপাড়া পর্যন্ত আসে, সেখান থেকে চট্টগ্রামের গাড়িতে করে মানিকছড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়। গবামারা এলাকায় পৌঁছলে গাড়ির সুপারভাইজার ভাড়া চাইলে কিশোরীটি ১০ টাকা দেয়। ভাড়া ১৫ টাকা দাবি করে সুপারভাইজার জোরপূর্বক গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে যায়। সেখানে একটি দোকানে থাকা সেটেলার বাঙালিরা বিষয় জানতে চায়। কিশোরীটি জানায় যে তাঁর কাছে আর টাকা নেই। এসময়ে সেটেলার বাঙালিরা একজন ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল চালককে ডেকে মেয়েটিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তার মা-বাবার কাছ থেকে ভাড়া নিতে বলে। পিচলাতলা নামক স্থানে পৌঁছলে চালক সেটেলার যুবকটি মোবাইলে কথা বলে এবং কিশোরীকে জানায় যে তার মোটরসাইকেলের লাইসেন্স নাই তাই ঘুরে জঙ্গল পথে যেতে হবে। কিছু দূর যাওয়ার পর আরও দু'জন সেটেলার যুবক সেখানে আসে এবং তিনজনে মিলে কিশোরীটিকে জোরপূর্বক ধর্ষন করে সেখানে রেখে পালিয়ে যায়। পরে কিশোরীটি পায়ে হেঁটে আবার গবামারা দোকানে এসে তাকে ধর্ষণ করার বিষয় জানালে এলাকার সেটেলার বাঙালিরা মোবাইলে মোটরসাইকেল চালকসহ অপর দুইজনকে কৌশলে ডেকে এনে আটক করে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে তিনজন ধর্ষক সেটেলার যুবককে প্রথমে মানিকছড়ি থানায় নিয়ে যায় পরে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে প্রেরণ করে। ঐ কিশোরীকে ধর্ষণের আলামত পরীক্ষার জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

অভিযুক্ত ধর্ষক সেটেলার যুবকরা হল গবামারা এলাকার ওসমান পল্লীর বাসিন্দা (সেটেলার গুচ্ছগ্রাম) মোটর সাইকেল চালক শহীদুল ইসলাম (২২) পিতা: চানু মিয়া ও একই গ্রামের মো: বেলাল হোসেন (২২) পিতা: ফজলুল ফরাজী ও মো মাহবুবুর রহমান (২৫) পিতা: সওরাত হোসেন।

পানছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী জুম্ম কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ১৪ মার্চ ২০১৪ পানছড়ি উপজেলার লোগাং মাচ্ছ্যোছড়া এলাকায় সেটেলার মো: আইতুল্লাহ চোখকালা চাকমার বাড়িতে গিয়ে তার কিশোরী কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় কিশোরীটি চিৎকার করলে মো: আইতুল্লাহ পালিয়ে যায়।

জানা গেছে, ঘটনার দিন দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টার মধ্যে পানছড়ির লোগাং গুচ্ছ গ্রামের শান্তিনগর ভিডিপি পোস্ট সংলগ্ন বাড়ির মো: আইতুল্লাহ নামের জনৈক সেটেলার বাঙালি জঙ্গল থেকে বাঁশ আনতে যায়। পথে মাচ্ছ্যোছড়া গ্রামের চোখকালা চাকমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাড়িতে গিয়ে মো: আইতুল্লাহ বলে, "ভাবী তোমাদের জমিতে গরু ধান খাচ্ছে"। একথা শুনে চোখকালা চাকমার স্ত্রী কালাচোগি চাকমা গরু তাড়ানোর জন্য ধান ক্ষেতে চলে যায়। সে সময় চোখকালা চাকমা ঘরের ভেতরে ঘুমাচ্ছিল। বাড়িতে আর কেউ নেই মনে করে চোখকালা চাকমার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিশোরী কন্যাকে মো: আইতুল্লাহ ঝাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিশোরীর চিৎকারে তার বাবা ঘুম থেকে উঠে বাইরে আসলে মো: আইতুল্লাহ পালিয়ে যায়।

এ ঘটনা জানাজানি হলে লোগাং ইউপি চেয়ারম্যান জলৎকার চাকমা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, লোগাং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সদস্য লোকমান, গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি, পুলিশ চোখকালার বাড়িতে যায়। চোখকালা চাকমা অত্যন্ত গরীব বিধায় এ ঘটনায় মামলা করতে রাজি হননি।

কাউখালীতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী জুম্ম ছাত্রীকে চেতনানাশক ঔষধ ব্যবহার করে অপহরণের চেষ্টা

গত ২২ মার্চ ২০১৪ সকাল নয় ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া ইউনিয়নে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী জুম্ম ছাত্রীকে চেতনানাশক ঔষধ ব্যবহার করে অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। মিখ্যাইচিং মারমা (১৫) বেতবুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। সে শিয়ালবুক্কা গ্রামের থোয়াইচিং অং মারমার (মিন্টু ড্রাইভার) মেয়ে।

জানা যায়, ঘটনার সময় মিখ্যাইচিং মারমা প্রতিদিনের মতো স্কুলে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর পথে চারজন বখাটে সেটেলার বাঙালি যুবক মিখ্যাইচিং মারমাকে চেতনানাশক ঔষধ ব্যবহার করে অপহরণের চেষ্টা চালায়। ওই ছাত্রীর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে। অনেকদিন ধরে বখাটে ছাত্রলীগের সেটেলার যুবকরা ওই ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করে আসছে বলে জানা যায়। অপহরণের চেষ্টাকারী বখাটে সেটেলার যুবকরা সকলেই আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মী বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ছাত্রীটির মা উসাচিং মারমা শিহাব উদ্দিনকে প্রধান আসামী করে কাউখালী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা (মামলা নং-২/ ২২/০৩/২০১৪) দায়ের করেছে। এরা হল- ১. মো: শিহাব উদ্দিন (২৩), পিতা- খোরশেদ মিস্ত্রী, গ্রাম- পূর্ব আদর্শ গ্রাম, কলমপতি ইউনিয়ন, কাউখালী ও সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কমলপতি ইউনিয়ন শাখা; ২. মো: লায়েক (২০) পিতা- অজ্ঞাত, গ্রাম- ঐ, কলমপতি ইউনিয়ন; ৩. মো: নাসির (১৯), পিতা- ওবায়দুল মিস্ত্রী, গ্রাম- ঐ, কলমপতি ইউনিয়ন; ৪. মো: মনির হোসেন (২৫) পিতা- অজ্ঞাত, গ্রাম- ঐ, কলমপতি ইউনিয়ন, কাউখালী উপজেলা।

কাউখালীতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী মারমা শিশু ধর্ষিত

গত ২৩ মার্চ ২০১৪ বিকাল আনুমানিক তিনটার সময় কাউখালী উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নের তারাবনিয়া ব্রীকফিল্ডের শ্রমিক বেলাল কর্তৃক তারাবনিয়া গ্রামের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া স্কুল ছাত্রী এক আদিবাসী মারমা শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষক মো: বেলালকে গ্রামবাসীরা ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

জানা যায়, উপজেলার কলমপতি ইউনিয়ন ও কলমপতি মৌজার তারাবনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া স্কুল ঐ ছাত্রী গত ২৩ মার্চ ২০১৪ সকালে প্রতিদিনের মতো স্কুলে যায়। স্কুলের পাশে স্থাপিত ব্রীকফিল্ডের শ্রমিক সেটেলার মো: বেলাল বিকাল তিনটার দিকে ওই ছাত্রীকে বাড়িতে ফেরার পথে একা পেয়ে কলমপতি নদীর পাড়ে জঙ্গলে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

এদিকে বাড়িতে ফিরে না আসায় ছাত্রীর মা-বাবা বিকাল সাড়ে চারটার দিকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জঙ্গলে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর জ্ঞান ফিরে এলে ওই ছাত্রী তার মা-বাবার কাছে মো: বেলাল কর্তৃক ধর্ষণের কথা জানায়। পরে উত্তেজিত গ্রামবাসী ব্রীকফিল্ডের শ্রমিক সেটেলার মো: বেলালকে ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোর্পদ করে।

মহালছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী চাকমা নারীকে গণধর্ষণের পর হত্যা

গত ২৬ মার্চ ২০১৪ খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার কড়ল্যাছড়ি নবদ্বীপ হেডম্যান পাড়ার মৃত অজয় কুমার চাকমার মেয়ে ভারতী চাকমাকে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক গণধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।

জানা যায়, ভারতী চাকমা চট্টগ্রামের ইপিজেড এলাকায় কোম্পানিতে চাকুরীরত অবস্থায় বান্দরবান নিবাসী অংকিউ মারমাকে বিয়ে করে। তারা সেখানে একসাথে চাকরী করে আসছিল। গত ২৫ মার্চ ২০১৪ ভারতী চাকমা চট্টগ্রাম থেকে তার ভাই সঞ্চয় চাকমার বাড়িতে বেড়াতে আসছিল। কিন্তু ভারতী চাকমা সেদিন ভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছেনি। পরে ২৮ মার্চ ২০১৪ সকালে পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রাম থেকে এক সেটেলার বাঙালির ছেলে কড়ল্যাছড়িতে কালা পাহাড় হয়ে আসার পথে জঙ্গলে লাশটা দেখতে পেয়ে হৈ চৈ করে ও গ্রামবাসীদেরকে জানায়। এলাকাবাসীরা থানায় খবর দেয় এবং পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বাররা এ ব্যাপারে পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিলে গুচ্ছ গ্রামের সেটেলারদের পক্ষ থেকে এ ঘটনায় জড়িত পাকুজ্যাছড়ি গুচ্ছগ্রামের পাঁচজন সেটেলারের নাম জনপ্রতিনিধিদের কাছে জমা দেয় বলে জানা যায়। উক্ত পাঁচজন হল- ১) তারা মিয়া (২৮) পিতা- প্রমিজ উদ্দিন, গ্রাম- পাকুজ্যাছড়ি, (২) আশ্রাফ আলী, পিতা- মোতালেব, সাং- ঐ, (৩) ইনসাফ আলী, পিতা- মোঃ হোসেন আলী, সাং- ঐ, (৪) সাইফুল, পিতা- মকবুল, সাং- ঐ, (৫) জহুর আলী, পিতা- ফয়সাল, সাং- ঐ। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীর ভাই সঞ্চয় চাকমা মহালছড়ি থানায় ডায়েরী করেছে।

নিহতের পরিবারের অভিযোগ ভারতী চাকমা ভাইয়ের বাড়িতে আসার আগে তার ভাই সঞ্চয় চাকমা পাকুজ্যাছড়ির গুচ্ছগ্রামের রাজমিস্ত্রি সেটেলার মোঃ আজিজ (৩৫) এর মোবাইল দিয়ে ভারতী চাকমার সাথে কথা বলেছিল। সেইদিন মোঃ আজিজ সঞ্চয় চাকমার কাছে ঘর তৈরি করে দেয়ার টাকা খুঁজতে গিয়েছিল। সঞ্চয় চাকমা তার বোন বাড়িতে পৌঁছলে টাকাগুলো পরিশোধ করার কথা বলেছিল। এভাবেই ভারতী চাকমার মোবাইল নম্বর মোঃ আজিজ পেয়ে যায়। তাই এ হত্যাকান্ডের ঘটনায় মোঃ আজিজও জড়িত থাকতে পারে বলে এলাকাবাসীরা সন্দেহ করছে।

লক্ষীছড়িতে এক বাকপ্রতিবন্ধী আদিবাসী চাকমা কিশোরী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত

গত ৩ এপ্রিল ২০১৪ বিকাল আনুমানিক তিনটার সময় খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলার লক্ষীছড়ি ইউনিয়নের ছোট ধ্রুংমুখ গ্রামের নিজু কার্বারীর বাকপ্রতিবন্ধী কিশোরী মেয়ে ময়ূরখিল গুচ্ছ গ্রামের দুইজন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।

জানা যায়, ঘটনার সময়ে মেয়েটি নিকটবর্তী হাতিছড়া থেকে পানি আনতে যায়। সেখানে আগে থেকে ওঁতপেতে থাকা দুইজন সেটেলার বাঙালি তাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ঘটনাটি গ্রামের এক ছেলে দেখে গ্রামবাসীদেরকে জানালে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে মোঃ কাশেমের ছেলে মোঃ শরিফুল ইসলামকে (১৫) হাতেনাতে ধরে ফেলে। গ্রামবাসী গণধোলাই দিয়ে তাকে অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করে।

পরে গত ৪ এপ্রিল ২০১৪ সদর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র চাকমার নেতৃত্বাধীন পাহাড়ি-বাঙালি মিলে এক সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সালিশী বৈঠকে ধর্ষকদের কান ধরে উঠবস করানো হয়। ধর্ষকদের টাকা জরিমানা করার কথা বললে ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরীর বাবা তা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এ সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওমীলীগের প্রাক্তন সভাপতি কাশেম চৌধুরী ও উপজেলা বিএনপির বর্তমান সভাপতি ফুরকান হাওলাদার প্রমুখ। ধর্ষণকারী সেটেলার বাঙালিরা হল- মোঃ সজীব (১৬) পিতা- নাছির মাস্টার, গ্রাম- ময়ূরখিল গুচ্ছগ্রাম এবং মোঃ সরিফুল ইসলাম (১৫) পিতা- মোঃ কাশেম, সাং- ময়ূরখিল গুচ্ছগ্রাম, লক্ষীছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

নাইক্ষ্যংছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম নারী অপহরণের শিকার

গত ৫ এপ্রিল ২০১৪ সন্ধ্যা আনুমানিক ছয়টার সময় বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার রেজু ফাত্রাঝিরি গ্রামের লেবাইয়া তঞ্চঙ্গ্যা এর স্ত্রী কেস্রাংবি তঞ্চঙ্গ্যাকে ডাঃ হামজা, প্রধান শিক্ষক, রেজু গর্জনবনিয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ডাঃ মোক্তার, রেজু ফাত্রাঝিরি এর নেতৃত্বে ৫/৬ জনের একদল সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণ করা হয়।

জানা যায়, ঘটনার সময় কেস্রাংবি তঞ্চঙ্গ্যাকে বাড়িতে একা পেয়ে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া যায়। গত ২৩ মার্চ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার নির্বাচনে নিজ সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী তোফাইল আহম্মদের পক্ষে এজেন্ট ছিলেন মিসেস কেস্রাংবি। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামীলীগ প্রার্থী মোঃ শফিউল্লা এর সমর্থক ছিল ডাঃ হামজা ও ডাঃ মোক্তার। নির্বাচনের দিনে মিসেস কেস্রাংবি এবং ডাঃ হামজা ও ডাঃ মোক্তারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এলাকাবাসীদের ধারণা সে কারণেই মিসেস কেস্রাংবিকে অপহরণ করা হয়। উল্লেখ্য, সেদিন রাত নয়টায় মিসেস কেস্রাংবিকে উকিয়া উপজেলার রাজা পালং ইউনিয়নের দরকাবিল গ্রাম থেকে ঘুমধুম পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের আইসি বাচ্চু মিয়ার নেতৃত্বে উখিয়া থানা পুলিশসহ উদ্ধার করে। কিন্তু অপহরণকারীদের পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ত্রিপুরা যুবতিকে অপহরণ

গত ২৪ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা ইউনিয়নের মাইরুংপাড়া নিবাসী মাটিরাঙ্গা পাইলট ভোকেশন্যাল স্কুলের এক নবম শ্রেণির ছাত্রী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক অপহরণ করা হয়।

জানা গেছে যে, সেদিন ঘটনার শিকার মেয়েটির বাবা-মারা বাড়িতে ছিলেন না। সে দিনটিতেই ইমাম হোসেন উক্ত মেয়েকে ডেকে নিয়ে এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এদিকে বাড়িতে মেয়েটির অনুপস্থিতি দেখে তার বাবা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু কোথাও খোঁজ মিলেনি। তবে মো: ইমাম হোসেন মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে গেছে বলে পরে জানতে পেরেছে। জানা গেছে দুই রাত কোন খোঁজ মিলেনি। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের দ্বারস্ত হন। বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদের উদ্যোগে সেনা ও উপজেলা প্রশাসন মো: মালেক হাজীকে চাপ সৃষ্টি করে মেয়েটিকে বের করে দেয়। সেনা প্রশাসন উভয় গার্ডিয়ানকে মামলা না করে মেয়েটির অভিভাবককে এক লক্ষ টাকা দিয়ে ফয়শালার প্রস্তাব দিলে মেয়ের অভিভাবক তা প্রত্যাখান করে বলে জানা গেছে।

বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে এক মারমা তরুণী ধর্ষণের পর হত্যার শিকার

গত ৬ জুন ২০১৪ বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলাধীন রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের অংজাইপাড়া গ্রামের মিস উপ্রু মারমা (২১) পীং-মপ্রু হ্লা মারমা নামের এক মারমা তরুণী একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হন। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় রোয়াংছড়ি থানা পুলিশ দুর্বৃত্তদের মধ্যে চার জনকে গ্রেফতার করে যাদের মধ্যে একজন পাহাড়িও রয়েছে। অপর এক অভিযুক্ত ধর্ষণকারী রোহিঙ্গা বাঙালি গণপিটুনির শিকার হয়ে মারাত্মক আহত হয় এবং পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। ঘটনার বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তের পিতা রোয়াংছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, গত ৫ জুন ২০১৪ বিকাল বেলা একটি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত আনন্দ স্কুলের শিক্ষক মিস উপ্রু মারমা রোয়াংছড়ি বাজার এলাকায় আসেন এবং সেখানে একটি আত্মীয়ের বাড়িতে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন ৬ জুন ২০১৪ সকাল বেলা তিনি রোয়াংছড়ি বাজার থেকে কিছু জিনিস কিনে সকাল প্রায় ৯:০০ টায় বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে না পৌছলে, তার পরিবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং উক্ত আত্মীয়ের বাড়িতে ফোন করে খোঁজখবর নেয়। এতে তার পরিবার যখনি জানতে পারে যে, সেই সকালেই উপ্রু মারমা বাড়ির উদ্দেশে রোয়াংছড়ি বাজার ছেড়ে চলে যায়, তখন তারা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেয়। এক পর্যায়ে রাত প্রায় ১০-১১ টায় পার্শ্ববর্তী ব্যাঙছড়ি এলাকায় রাস্তার পাশে একটি পাহাড়ি জায়গায় নগ্ন অবস্থায় উপ্রু মারমার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। মৃতদেহের মাথার পেছন দিকে পাথরের আঘাতের কয়েকটি চিহ্ন পাওয়া যায়।

পরদিন ৬ জুন ২০১৪ গ্রামবাসীরা তারাচান তঞ্চঙ্গ্যা (৩০) পীং-রসো চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, সাং-ব্যাঙছড়ি বাজার এলাকা, রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়ন এর মুখে সন্দেহজনক কয়েকটি কালো দাগ দেখে তাকে আটক করে। এই তারাচান আগে থেকে দুষ্ট প্রকৃতির বলে পরিচিত। একসময় সে ডাকাতির কাজেও জড়িত ছিল। গ্রামবাসীরা তারাচানকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে নির্দ্বিধায় অপর কয়েকজন বাঙালি সঙ্গীসহ উপ্রু মারমাকে ধর্ষণের পর হত্যার কথা স্বীকার করে। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের সময়, একটি গামছা পাওয়া যায় যা গণপিটুনির শিকার অভিযুক্ত রোহিঙ্গা বাঙালির বলে গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা যায়।

রাঙ্গামাটিতে এক আদিবাসী নারীর লাশ উদ্ধার

গত ২০ আগস্ট ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলা সদরে সরকারি পর্যটন মোটেল সংলগ্ন কাপ্তাই হ্রদ এলাকা থেকে বিশাখা চাকমা নামে এক আদিবাসী নারীর লাশ পাওয়া যায়। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা বিশাখা চাকমাকে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। তবে, এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ বিশাখা চাকমার হত্যাকারীদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করতে পারেনি। জানা যায়, গত ২০ আগস্ট ২০১৪ স্থানীয় লোকজন পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্স নামে সরকারি পর্যটন মোটেল সংলগ্ন দেওয়ান পাড়ার হ্রদ এলাকা থেকে মৃতদেশের পঁচার গন্ধ পায়। তারা কয়েক ঘন্টা পঁচার গন্ধ অনুসন্ধানের পর হ্রদে একটি ভাসমান লাশ খুঁজে পায়। এরপর তারা পুলিশে খবর দিলে, পরে কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোহেল ইমতিয়াজের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

মৃতদেহটি উদ্ধারের পর স্থানীয় লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনরা এক কন্যা সন্তানের জননী বিশাখা চাকমা ওরফে বিদেশি (৩০) পীং-সুশীল চাকমা এর মৃতদেহ হিসেবে শনাক্ত করে। বিশাখা চাকমা রাঙ্গামাটি শহরে তন্তুজ নামে স্থানীয় একটি টেক্সটাইল স্টোরে বিক্রেতা হিসেবে কাজ করত। বিশাখা চাকমার বাবা সুশীল চাকমা ও ভাই ইন্টু চাকমা জানায় যে, ১৪ আগস্ট থেকে বিশাখা চাকমা নিখোঁজ হয়।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক স্কুল ছাত্রী ধর্ষণ ঃ বিশ হাজার টাকা জরিমানা!

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল আনুমানিক ৯:০০ টায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বড়নাল ইউনিয়নের সুরেন্দ্র হেডম্যান পাড়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া এক জুম্ম স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের খবর পাওয়া গেছে।

জানা যায়, ঐ দিন সকাল ৮:০০টার দিকে তবলছড়ি সদরের কদমতলী উচ্চ বিদ্যালের ৭ম শ্রেণির ঐ ছাত্রী নিজেদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী ছড়ায় গোসল করতে যায়। এ সময় স্কুল ছাত্রীকে একা পেয়ে তবলছড়ি আদর্শগ্রামের মো: অলি মিয়ার পুত্র মো: শাহ আলম (২৩), সাং- লাল কুমার পাড়া, বড়নাল ইউপি, মাটিরাঙ্গা উপজেলা জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। মেয়েটির চিৎকার শুনে এলাকাবাসী সংঘবদ্ধ হয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন। এ সময় ধর্ষক পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় পাহাড়ি-বাঙালির সহযোগিতায় ধর্ষক মো: শাহ আলমকে আটক করে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা আলী আকবরের হাতে তুলে দেয়া হয়। চেয়ারম্যান আলী আকবর ধর্ষককে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা জরিমানা করে বিচার সম্পন্ন করেন বলে জানা গেছে।

লংগদুতে সেটেলার কর্তৃক এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী পাহাড়ি নারী অপহৃত, পরে বাঙালিদের সহায়তা উদ্ধার

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বিকাল আনুমানিক ৫:৩০ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার ৪ নং বগাচতর ইউনিয়নের নোয়াপাড়া নিবাসী মৃত অনিল চাকমার ১৯ বৎসরের এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কন্যাকে একই ইউনিয়নের রাঙ্গীপাড়া নিবাসী মোটর সাইকেল ড্রাইভার মো: কামাল হোসেন (৩০) পিতা-মো: আহসান আলী মিস্ত্রি নামের এক সেটেলার বাঙালি অপহরণ করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়েটি প্রায় সারাদিন বাড়িতে ফিরে না আসাতে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে বিকালে খোঁজাখুজি শুরু করে। কিন্তু কোথাও কোন হদিশ না পাওয়ায় গ্রামে জানাজানি করে। বিকালে মো: কামাল হোসেন গ্রামবাসীদের চোখে পড়লে তার উপর সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাই গ্রামবাসীরা সেটেলার বাঙালি পাড়ায় ঘটনাটি জানায়। বাঙালি পাড়ায় তা জানাজানি হলে তারাও মো: কামাল হোসেনকে খোঁজাখুজি করে তার হদিস পায়নি। ফলে সেটেলার বাঙালি পাড়ার বাঙালিরাও মেয়েটিকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালালে ১২ সেপ্টেম্বর খুব ভোরে কাপ্তাই হ্রদ এলাকায় নৌকা থেকে মো: কামাল হোসেনসহ মেয়েটিকে উদ্ধার করে। পরে মেয়ের অভিভাবককে ডেকে মেয়েটিকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। স্থানীয় রাঙ্গীপাড়া বিজিবি ক্যাম্প থেকে মেয়েটিকে সেখানে যেতে খবর পাঠানো হলে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনায় কোন মামলা হয়নি।

খাগড়াছড়িতে এক ত্রিপুরা আদিবাসী শিশু ধর্ষিত, ধর্ষককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ

গত ২ অক্টোবর ২০১৪ সকাল ১০ টায় খাগড়াছড়ি'র সদর উপজেলার ভাইবোনছড়া ইউনিয়নের রান্যাবাড়ি গ্রামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১৩ বছরের এক ত্রিপুরা আদিবাসী শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

জানা গেছে, ঘটনার সময় ওই শিশুটির বাবা প্রতিদিনের মতো খুব ভোরে শ্রমিক নিয়ে জঙ্গলে গাছ কাটার জন্য চলে যায়। পরে শিশুটির মা সকাল ৮টায় শারদীয় দূর্গাপুজার উৎসব দেখার জন্য ভাইবোনছড়া বাজারে চলে যায়। এদিকে, সকাল ১০টার সময় ভাইবোনছড়া গ্রামের মো. আব্দুল মালেকের ছেলে ভাড়াটে মোটরসাইকেল চালক মো: জিয়া রহমান (৩২) বাড়িতে ঢুকে শিশুটির কাছে খাবার পানি চায়। এ সময় বাড়িতে আর কেউ নেই জেনে মো: জিয়া রহমান শিশুটিকে একা পেয়ে গলা চেপে ধরে, ডান হাত, মাথায় ও মুখে আঘাত করে এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়। এরপর শিশুটির মা দুর্গাপুজা থেকে বাড়িতে ফিরে মেয়েকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পায় এবং মেয়ের কাছ থেকে ধর্ষণের ঘটনা জানতে পারে। পরে মো: জিয়া রহমান আবারও ভাড়া নিয়ে রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় (রাস্তার পাশে বাড়ি) মেয়ের সহায়তায় তাকে সনাক্ত করে এবং আটক করে ধর্ষণের বিষয়ে জানতে চায়। এ সময় তার মোটরসাইকেলে থাকা যাত্রী হপ্রেং ত্রিপুরা, পীং- মৃত সুনীতি কুমার ত্রিপুরা এর সামনে মো: জিয়া রহমান ধর্ষণের বিষয়টি স্বীকার করে এবং চিকিৎসা খরচ বাবদ টাকা দেয়ার প্রস্তাব করে। এসময়ে ধর্ষণের শিকার শিশুটির মা এ প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মো: জিয়া রহমান পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে মোটরসাইকেলে থাকা যাত্রীর সহায়তায় ধর্ষক মো: জিয়া রহমানকে ধরে গ্রামের কার্বারী কিনারাম ত্রিপুরার কাছে নিয়ে যায়। পরে এলাকাবাসী ধর্ষক মো. জিয়া রহমানকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। এ ঘটনায় খাগড়াছড়ি সদর মডেল থানায় শিশুটির বাবা স্মৃতিপূর্ণ ত্রিপুরা মামলা (মামলা নং ০২, তারিখঃ ০২/১০/২০১৪খ্রি: ধারাঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩)-এর ৯(১)) দায়ের করেছে। ধর্ষণের শিকার ওই শিশুটিতে পরে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নানিয়ারচরে এক জুম্ম কিশোরী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার

গত ২ অক্টোবর ২০১৪ বিকাল প্রায় ৪:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের নানাক্রুম গ্রামে নিজ বাড়িতে এক জুম্ম কিশোরী (১৪) একই ইউনিয়নের বগাছড়ি এলাকার বাসিন্দা মো: কবির হোসেন (৪৫) পীং-মৃত আব্দুর রশিদ নামে এক সেটেলার দুর্বৃত্ত কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়। জানা গেছে, ভিকটিম বাদী হয়ে ঐ দিনই রাত ১০:৩০ টায় নানিয়ারচর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনের অধীনে মামলা দায়ের করে। মামলা নং-১, ধারা ৪৯ (ক)। পুলিশ পরদিন ৩ অক্টোবর ২০১৪ ভোররাতে স্থানীয় বাঙালিদের সহায়তায় অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে মো: কবির হোসেনকে গ্রেফতার করে।

জানা গেছে, ঘটনার সময় উক্ত কিশোরী বাড়িতে একা অবস্থান করছিল। আর তা জানতে পেরে দুর্বৃত্ত কবির হোসেন কিশোরীকে বাড়ি থেকে টেনেহেচড়ে বের করে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এতে কিশোরীটি চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশী পাহাড়িদের আসতে দেখে পালিয়ে যায়। জানা গেছে, এই দুর্বৃত্ত এর আগে নিজের পুত্রবধুকেও একবার ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে জানা যায়।

লংগদুতে দুই জুম্ম স্কুলছাত্রী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার

গত ১৫ অক্টোবর ২০১৪ দুপুরের দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু উপজেলাধীন বগাচতর ইউনিয়নে দুই জুম্ম ছাত্রী (এসএসসি পরীক্ষার্থী) স্থানীয় তিন সেটেলার যুবক কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে। এলাকাবাসীর সহায়তায় তিন বখাটে যুবককে আটক করা হলেও পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়নি। স্থানীয় মুরুব্বীদের মধ্যস্থতায় আহুত সালিশে দোষীদের কিছু শাস্তি ও মুচলেকা নিয়ে সামাজিকভাবে নিষ্পত্তি করা হয়।

জানা গেছে, ধর্ষণের চেষ্টার শিকার দুই ছাত্রী স্থানীয় উগলছড়ি মহাজন পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী। উভয়ের বয়স ১৫-১৬ বছরের মধ্যে, গ্রাম-চিবেরেগা, বগাচতর ইউনিয়ন। ঐদিন স্কুলের পরীক্ষা শেষে তারা একসঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। দুপুর প্রায় ১:৩০-২:০০ টার দিকে তারা যখন মাঝপথে একটা নির্জন স্থানে এসে উপস্থিত হয়, সেখানে তখন হঠাৎ পথ রোধ করে দাঁড়ায় তিন বখাটে যুবক (১) ফরহাদ (১৯) পীং-মৃত সিরাজুল ইসলাম, সাং-মারিশ্যাচর, বগাচতর ইউনিয়ন, (২) মো: ইউসুফ (২০) পীং-মো: হানিফ (ফরিদ), সাং-ঐ ও (৩) হাবিব (২০) পীং-মো: সুন্দর আলী, সাং-ঐ। এক পর্যায়ে সেটেলার যুবকরা দুই ছাত্রীকে জোরজবরদস্তি করে পাশের জঙ্গলে নিয়ে যেতে চাইলে ছাত্রীরা চিৎকার জুড়ে দেয়। এমন সময় ছাত্রীদের পেছন পেছন আসা একটু দূরে থাকা অপর এক জুম্ম ছেলে পরীক্ষার্থী এগিয়ে আসলে বখাটে সেটেলার যুবকরা পালিয়ে যায়। অভিভাবকরা তাৎক্ষণিতভাবে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল গাফ্ফার ভূঁইয়াকে ঘটনার বিষয়ে অবহিত করেন এবং যথাযথ বিচার কামনা করেন। ইউপি চেয়ারম্যান ও উগলছড়ি মহাজন পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহিম এর নেতৃত্বে স্থানীয় বাঙালিদের সহায়তায় ৩ বখাটে যুবককে চিহ্নিত করে আটক করা হয়। এরপর বিকাল প্রায় ৫:০০ টার দিকে চিবেরেগা দোকান এলাকায় চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় অন্যান্য মুরুব্বীদের উপস্থিতিতে আটক ৩ বখাটেকে নিয়ে সালিশ করা হয়। সালিশে উক্ত অভিযুক্তদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হলে উপস্থিত সকলের সামনে বখাটেদের শারীরিক শাস্তি দেয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের কোন কাজ করবে না এবং এলাকায় এ ধরনের কোন কাজ হলে তারা দায়ী থাকবে বলে মুচলেকা নেয়া হয়।

কাউখালীতে একজন মারমা নারী অপহরণের চেষ্টা

গত ১৫ অক্টোবর ২০১৪ রাঙামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বড়ডলু পাড়ার বাসিন্দা ২৭ বছরের এক মারমা নারীকে জনৈক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক অপহরণের চেষ্টা করা হয় বলে জানা যায়। জানা যায় যে, সেদিন রাত ১১:০০ টার দিকে এক সন্তানের জননী ওই নারী নিজ বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে বাড়িতে না আসার ফলে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা তাকে খুঁজতে শুরু করে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাত আনুমানিক ২:৩০টার দিকে কাউখালী সদরের ব্র্যাক অফিসের সামনে মিনি মার্কেট থেকে পুলিশ তাকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে পুলিশ তাঁকে কাউখালী উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যানি চাকমার নিকট হস্তান্তর করে। ঘটনার শিকার উক্ত মারমা নারীকে কাউখালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় থানায় এখনো কোন মামলা হয়নি।

পানছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক চার বছরের এক চাকমা শিশু ধর্ষিত

গত ১৬ অক্টোবর ২০১৪ বিকালে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার কানুনগো পাড়ায় মো: লালন মিয়া (৩৫) নামের এক পাষন্ড সেটেলার বাঙালি ৪ বছর বয়সী এক পাহাড়ি শিশুকে ধর্ষণ করে। শিশুটিকে উদ্ধার করে পানছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

জানা গেছে যে, সেদিন বিকাল ৪:০০ টার দিকে ধর্ষণের শিকার শিশুটির মা ও তার প্রতিবেশী এক নারী তাদের দুই শিশু সন্তান নিয়ে বাড়ির পাশের ছড়ায় গোসল করতে যান। গোসল শেষে দুই শিশুকে ছড়ায় রেখে এসে তারা বাড়িতে চলে আসেন। এই সুযোগে সেখানে গরু চরাতে আসা ইসলামপুর গ্রামের ফরিদ মিয়ার ছেলে মো: লালন মিয়া শিশুটিকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটির কান্না শুনে এক প্রতিবেশী নারী ছুটে গিয়ে লালন মিয়া সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পানছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

সাজেকে দুই ত্রিপুরা নারীকে বিজিবি সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টা

গত ৩ নভেম্বর ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের অন্তর্গত শিয়ালদাই বিজিবি ক্যাম্পের দুই জওয়ান গ্রামের পার্শ্ববর্তী ছড়ায় গোসল করতে যাওয়া শিয়ালদাই গ্রামের দুইজন ত্রিপুরা নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তবে ঘটনার শিকার জুম্ম নারীদের চিৎকার শুনে গ্রামের লোকেরা এগিয়ে গেলে বিজিবি সদস্যরা ক্যাম্পে পালিয়ে যায়।

জানা যায় যে, সেদিন আনুমানিক ১২:৩০ ঘটিকায় শিয়ালাদাই গ্রামের পাঁচজন ত্রিপুরা নারী পাশের ছড়ায় গোসল করতে যায়। পাঁচজন থেকে প্রথমে দুইজন গোসল শেষ করে বাড়িতে চলে আসে। বাকী দুইজন- একজনের ২৩ বছর এবং আরেক জনরে বয়স ২৫ বছর- গোসল শেষে চলে আসার পস্তুতির সময় শিয়ালদাই বিজিবি ক্যাম্পের দুই জওয়ান তাদেরকে জাপটে ধরে। তারা স্পর্শকাতর অঙ্গে হাত দিতে থাকে এবং ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় ঘটনার শিকার নারীরা জোর গলায় চিৎকার শুরু করলে গ্রামের অধিবাসীরা এগিয়ে যায়। গ্রামবাসীদের দেখে বিজিবি সদস্যরা পালিয়ে গিয়ে ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে পড়ে। সাথে সাথে গ্রামবাসীরা গিয়ে ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার নাসিরের কাছে আপত্তি জানায়। কিন্তু সুবেদার নাসির বিষয়টা সামান্য বলে উড়িয়ে দেয়। ধর্ষণের চেষ্টাকারী দু'জন বিজিবি সদস্যের মধ্যে একজনের নাম রফিউল বলে জানা যায়। আরেকজন নাম জানা যায়নি।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ৫ নভেম্বর বাঘাইছড়ি বিজিবি সেক্টরের সিও শিয়ালদাই মৌজার হেডম্যান জুপতাং ত্রিপুরা ও জনৈক নলিনী ত্রিপুরাকে সেক্টর হেডকোটায়ারে তলব করেন এবং এই সামান্য বিষয়টি কেন বাইরে প্রচার করা হচ্ছে বলে হুমকি দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অপরদিকে এ ঘটনাটি বাইরে প্রচার করায় বর্তমানে শিয়ালদাই গ্রামের তজেন্দ্র ত্রিপুরা ও কার্বারী ভুজেন ত্রিপুরাকে গ্রামের বাইরে কোথাও যেতে দিচ্ছে না শিয়ালদাই বিজিবি ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষ।

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন

দীঘিনালায় সেনা সদস্য কর্তৃক তিন জুম্ম মেয়ে প্রহৃত

গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বড়াদাম সেনা সদস্য ক্যাম্পের কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন মো: আবদুল্লাহ ২৮ বীর এর আদেশে ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা স্থানীয় তিন জুম্ম মেয়েকে বেদম মারপিট করে গুরুতর আহত করেছে বলে জানা যায়। আহতরা হলেন- ১) সান্তনা চাকমা (৪০) স্বামী- ভদ্ররাজ চাকমা, গ্রাম- ইন্দ্রমনি পাড়া, ৫১ নং দীঘিনালা মৌজা, ৪ নং দীঘিনালা ইউনিয়ন ৮ নং ওয়ার্ড, উপজেলা-দীঘিনালা, ২) অসীমা চাকমা (১৪) পিতা- শান্তিময় চাকমা, সাং- ঐ ও ৩) আয়না চাকমা (১৫) পিতা- মরতছবো চাকমা, সাং- ঐ। আহতরা পরে দীঘিনালা হাসপাতালে ভর্তি হয় বলে জানা যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, সেনাবাহিনীর নাম দেয়া বড়াদাম সেনা ক্যাম্পটি মূলত দীঘিনালা বড়াদাম থেকে পূর্বে আনুমানিক ৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। ক্যাম্পের অবস্থান মূলত ইন্দ্রমনি পাড়ার বিনন্দচুগ এলাকায়। জানা গেছে, যেখানে ক্যাম্পটি অবস্থিত সেখানে ইতিমধ্যে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যাম্পের উত্তর পার্শ্বে স্থানীয় পাহাড়িদের কিছু জায়গা বেদখল করে ঘেরা দেওয়া হয়েছিল। সে জায়গাগুলি প্রহৃত উক্ত তিন মেয়েদের মালিকানাধীনে আছে বলে জানা যায়। তাই উক্ত তিন পাহাড়ি মেয়েরা গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রি: তারিখে সেনাবাহিনীর দেওয়া ঘেরা ভেঙ্গে দেয়। সেকারণে সেনা সদস্যরা উক্ত তিন মেয়েকে বেদম মারপিট করে আহত করেছে।

রুমা উপজেলায় পাইন্দু ও পলি মৌজায় বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগের ফলে ১০০ পরিবার উচ্ছেদের আশঙ্কায়

বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলার পাইন্দু ও পলি মৌজা অন্তর্গত বেথেল ও বেত্লেহেম পাড়ার অধিবাসীদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও অবহিত না করে গ্রামবাসীর জুম ভূমি ও বাগান-বাগিচার জায়গার উপর ক্যাম্প স্থাপনের জন্য বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এলক্ষ্যে বিজিবি এলাকাবাসীর জুম ভূমি ও রেকর্ডীয় জায়গা-জমিতে মাটি কাটা ও জঙ্গল পরিষ্কার শুরু করে।

গ্রামবাসীর জীবন-জীবিকার একমাত্র সম্বল উক্ত জমিতে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ বাতিল করার দাবিতে উক্ত বেথেল ও বেত্লেহেম পাড়ার অধিবাসীরা গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৪ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। উক্ত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থানটি বেথেল ও বেত্লেহেম পাড়ার অধিবাসীরা জুম চাষ ও মিশ্র ফলজ বাগান সৃষ্টি করে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করে আসছে এবং এসব উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। উক্ত স্থানে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করা হলে অত্র এলাকার ১০০-এর অধিক বম পরিবারের জীবিকা নির্বাহ বন্ধ হয়ে যাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই উক্ত জায়গায় বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ বন্ধ ও প্রত্যাহার করার জন্য দুই গ্রামের অধিবাসীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানায়।

বিজিবি সদস্য কর্তৃক শান্তিনগর বৌদ্ধ বিহারে জুতাপায়ে প্রবেশ করে ধর্মীয় পরিহানি

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার শান্তিনগর বিজিবি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার মো: তাহেরের নেতৃত্বে ৬/৭ জনের এক দল বিজিবি সদস্য শান্তিনগর জ্ঞানোদয় বৌদ্ধবিহারে জুয়াপায়ে প্রবেশ করে এবং ছবি তোলে। উল্লেখ্য যে, এর আগে একবার এভাবে জুতাপায়ে প্রবেশ করে বিজিবি সদস্য বিহারের পবিত্রতা নষ্ট করে।

রামগড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক, পরে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলহাজতে প্রেরণ এবং সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হামলা

গত ১৫ মার্চ ২০১৪ রাত ৮ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নে কর্ণেল (অব:) কামরুল হাসান কর্তৃক জুম্মদের ভূমি দখল করে সৃজিত বাগানের গাছ পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা কর্তন করেছে এমন অভিযোগ করে সেনাবাহিনী রাত ১০ টার দিকে পাতাছড়া ইউনিয়নের জুমছড়া ত্রিপুরা গ্রামে গিয়ে সেখান থেকে দেবেন্দ্র ত্রিপুরা (৩৫) পীং-বান্দারাম ত্রিপুরা ও বরেন্দ্র ত্রিপুরা (৪০) পীং-উপায় ত্রিপুরা নামক ২ নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করে নিয়ে যায়।

এরপর পাতাছড়া ইউনিয়নের পাতাছড়া গুচ্ছগ্রামের সেটেলার বাঙালিরা রাত ১২:৩০টার দিকে জরিচন্দ্র পাড়ার জুমছড়া গ্রামে হামলা চালায়। এসময়ে আতঙ্কিত এলাকার লোকজন ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। সেটেলার বাঙালিরা কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায় বলেও জানা যায়। সেনাবাহিনী কর্তৃক আটককৃতদের নামে রামগড় থানায় বন আইনে মিথ্যা মামলা (মামলা নং-২, ১৫ মার্চ ২০১৪ ধারা- ১৪৩/৪৪৭/৪৩৬/ ৪২৭) দায়ের করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। অজ্ঞাত আরো বহু জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। সেটেলার বাঙালিদের অগ্নিসংযোগে সলেন্দ্র ত্রিপুরা (৩৫) পীং-দয়াল চন্দ্র ত্রিপুরা গ্রাম-জুমছড়া, পাতাছড়া ইউনিয়ন, রামগড় এর বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

রামগড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক অস্ত্র গুঁজে দিয়ে দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে আটক

গত ১৬ এপ্রিল ২০১৪ ভোর রাত প্রায় ৩:৩০টায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের মানিক চন্দ্র কার্বারী পাড়ায় সেনাবাহিনী দুই নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে আটক করে। পরে আটককৃতদের নামে অস্ত্র আইনের ১৯ নং ধারায় রামগড় থানায় মামলা রুজু করার পর তাদের জেলহাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

জানা যায়, ঘটনার সময় স্থানীয় সিন্দুক জোনের ৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট সেনা সদস্যরা গুইমারা সাব জোন কমান্ডার ক্যাপ্টেন আহসানুল ইসলামের নেতৃত্বে পুষ্ট কুমার ত্রিপুরার বাড়ি ঘেরাও করে।

পরে সেনা সদস্যরা জোরপূর্বক ঘরে ঢুকে সবাইকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে উঠানে জড়ো করে দাঁড় করিয়ে রাখে। এ সময়ে ঘরে তল্লাশীর নামে ধানের গোলায় নিজেরাই অস্ত্র গুঁজে রেখে দেয় এবং সে অস্ত্র (দেশীয় তৈরি ৩.২ রিভলবার ও চার রাউন্ড তাজা গুলি) নিয়ে খন্ড লাল ত্রিপুরার ছেলে পুষ্ট কুমার ত্রিপুরা (৩৩) ও বেড়াতে আসা তার মেয়ের জামাই খাগড়াছড়ি সদরের সিঙ্গীনালা গ্রামের মংলাপ্রু মারমার ছেলে চাইহ্লা মারমার হাতে গুঁজে দিয়ে ফটো তুলে সিন্দুক জোনে নিয়ে যায়। সেখানে পুষ্ট কুমার ত্রিপুরা ও চাইহ্লা মারমার চোখ, হাত-পা বেঁধে রাখা হয়। এ সময় তারা পানি খেতে চাইলে তাদেরকে পানি পর্যন্ত দেয়নি বলে জানা গেছে। সকাল থেকে দুপুর ১২:০০টা পর্যন্ত আটককৃত ঐ ২ নিরীহ গ্রামবাসীকে খররৌদ্রের মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। পরে দুপুর একটার দিকে আটককৃতদের রামগড় থানায় সোপর্দ করে তাদের নামে অস্ত্র আইনে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। পরে ১৭ এপ্রিল ২০১৪ সকালে আটককৃতদের খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন উত্তরণ নামক সেনা শাসন বলবৎ থাকায় সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক প্রতিনিয়ত জুম্মরা ধর-পাকড়সহ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে।

বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণের কাজে বাধা দানের জন্য বাঘাইছড়ির দ্বিটিলা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি

গত ৩০ এপ্রিল ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা প্রশাসন উপজেলার দ্বিটিলা এলাকায় অজলচুগ নামক স্থানে একটি বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণের কাজ বাধাদানের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। জানা যায় যে, বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের অধিবাসীরা তদেকমারাকিজিং বৌদ্ধমন্দিরে ১০ ফুট উচ্চ বুদ্ধ মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেন। গত ২৮ এপ্রিল যখন তারা এই মূর্তি নির্মাণ শুরু করেন তখন দ্বিটিলা সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার উক্ত মূর্তি নির্মাণে বাধা প্রদান করেন।

জানা গেছে, বঙ্গলতলি ইউনিয়নের স্থানীয় লোকজন তদেকমারাকিজিং মন্দির এলাকায় একটি ১০ ফুট উঁচু বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এলক্ষে তারা গত ২৮ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ মূর্তি নির্মাণ শুরম্ন করেন। কিন্তু নির্মাণ কাজ যখন শুরু করা হল তখন স্থানীয় দ্বিটিলা সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার মূর্তি নির্মাণে বাধা প্রদান করে। পরদিনও যখন স্থানীয় লোকজন মূর্তি নির্মাণ শুরু করে তখনও একইভাবে বাধা দেয়া হয় এবং এত পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করা হয়। এরপর কিছু সাংবাদিক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

স্থানীয় প্রশাসন ঘোষণা করে যে, এলাকাটি বনবিভাগের জন্য সংরক্ষিত এবং সেখানে কোন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না। তারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে–এই বলে যে, পরিস্থিতি ভালো নয় এবং যে কোন সময় ঝগড়া হতে পারে।

বাঘাইছড়ির গঙ্গারাম দোর-এ বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে সেনাসদস্যদের বাধা প্রদান

গত ২২ জুলাই ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের উজো বাজার নিকটবর্তী গঙ্গারাম দোর এলাকায় জুম্ম গ্রামবাসীরা একটি বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করতে গেলে নিকটবর্তী বাঘাইহাট জোনের একদল সেনা সদস্য বাধা প্রদান করে। ঐদিন বিকেলে ঐ স্থানে সেনা ও বিজিবি সদস্যরা টহল জোরদার করে, অপরদিকে স্থানীয় লোকজনও জমায়েত হয়ে বুদ্ধমূর্তিটি নির্মাণের শুরু করার চেষ্টা করে। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে কিছুটা বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, ঐ স্থানে বিজিবি কর্তৃপক্ষ তাদের একটি ক্যাম্প নির্মাণ করার পরিকল্পনা করছে।

সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া, আদিবাসী জুম্মদের অধিকার সুনিশ্চিত না হওয়া এবং চুক্তি মোতাবেক আইন-শৃঙ্খলা, সাধারণ প্রশাসনসহ বিশেষ শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখল, উচ্ছেদের অপচেষ্টা ও সাম্প্রদায়িক হামলা এখনও নানাভাবে বিভিন্ন স্থানে অব্যাহত রয়েছে। তার কিছু চিত্র এখানে তুলে ধরা হল–

কমলছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর হামলা

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সকাল ১১:৩০টার দিকে খাগড়াছড়ি জেলা সদর থেকে মানব বন্ধন শেষ করে তিনটি জীপগাড়ী যোগে ভূয়াছড়ির নিজ নিবাসে ফেরার পথে একদল সেটেলার বাঙালি কমলছড়িমুখ পাড়ার শ্মশান এলাকায় পৌঁছলে সেখানে সম্মুখে পাওয়া দুই জুম্মকে ধারালো অস্ত্র ও লাঠি-সোটা দিয়ে আঘাত করে গুরুতরভাবে আহত করে। আহত দুই জুম্ম হল–(১) পানেক্যা চাকমা ওরফে পান্দুক্যা (৩২) পীং-মৃত বিনয় কুমার চাকমা, গ্রাম-কমলছড়িমুখ পাড়া, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও (২) আনন্দ লাল চাকমা (৪৫) পীং-মৃত সূর্য মোহন চাকমা, গ্রাম- ঐ। পরে আহতদের খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জানা গেছে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ কমলছড়িমুখ পাড়া নিবাসী সবিতা চাকমাকে ধর্ষণ ও খুন করার দায়ে কয়েকজন বালু বহনকারী ট্রাক্টর ড্রাইবার ও ভূয়াছড়ির সেটেলার বাঙালির বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি থানায় একটা মামলা হয়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে ভূয়াছড়ি সেটেলার পাড়া ও খাগড়াছড়ির শালবাগান এলাকার কিছু সংখ্যক সেটেলার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সকালে খাগড়াছড়ি সদরে এক মানব বন্ধন করে। মানব বন্ধন শেষে ভূয়াছড়ির সেটেলার বাঙালিরা তিনটি জীপগাড়ি যোগে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক শ্লোগান দিয়ে কমলছড়ি হয়ে বাড়ি ফিরছিল। এসময় তারা এই হামলা চালায় এবং গাড়ি থেকে দুই পাহাড়ি (চাকমা) মেয়েকে লক্ষ্য করে ঢিলও মারে। উল্লেখ্য যে, ঐদিন মৃত সবিতা চাকমার শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠান চলছিল।

কমলছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীর উপর হামলা, বৌদ্ধ বিহারে ভাঙচুর

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলাধীন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কমলছড়ি ইউনিয়নে ভূয়াছড়ি সেটেলার বাঙালি পাড়ার শতাধিক সেটেলার বাঙালি বার বছরের একজন বাঙালি ছেলে নিখোঁজের অজুহাত তুলে পার্শ্ববর্তী দুই জুম্ম গ্রাম বেতছড়ি ও বরনাল-এ হামলা করে। প্রথম দফায় সকাল প্রায় ৮.০০টায় হামলায় হামলাকারীরা স্থানীয় 'চৈত্য আদর্শ বৌদ্ধ বিহার'-এ ঢুকে বিহারের বুদ্ধমূর্তি, টেবিল ভাংচুর করে ও মাইকের তার ছিড়ে দেয় এবং ২ জুম্ম গ্রামবাসীকে আহত করে। আহত ২ গ্রামবাসী হল–(১) বিশ্বজিৎ চাকমা (২৯) পীং-বিলাস চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-বেতছড়ি, ২ নং কমলছড়ি ইউনিয়ন, ভূয়াছড়ি মৌজা, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও (২) সুখময় চাকমা (৩০) পীং-অনিল কুমার চাকমা, সাং-ঐ।

অপরদিকে আবারও সকাল ১১:০০টার দিকে একই হামলাকারী সেটেলার বাঙালিরা ভূয়াছড়ির পার্শবর্তী বরনালে হামলা চালিয়ে এক নারীসহ ২ জুম্ম গ্রামবাসীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে এবং এক জুম্ম তরণীকে লাঠিসোটার আঘাতে গুরুতর আহত করে। পরে উক্ত আহত তিনজনকে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত ৩ জন হলেন–(১) বিপ্লব চাকমা (৩০) পীং-তারা চন্দ্র চাকমা (ভগ), (২) রম্বাপুদি চাকমা (৬০) স্বামী-তারা চন্দ্র চাকমা (ভগ) ও (৩) মামুনী চাকমা (১৮) পীং-হেক্কালা চাকমা।

উল্লেখ্য, উক্ত ঘটনার পর প্রশাসনের আইন শৃংখলা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসন কর্তৃক ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত কমলছড়ি ইউনিয়নে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় বলে জানা যায়।

নানিয়ারচরে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম গ্রামবাসীর উপর হামলা

গত ২৭ এপ্রিল ২০১৪ বেলা আনুমানিক ১২:০০টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলা সদর এলাকায় স্থানীয় হ্রদে মাছ ধরার সময় ৮ জুম্ম গ্রামবাসী একদল সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হামলার শিকার হয়। এতে ১ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়।

জানা গেছে, ঐ দিন স্থানীয় ছনখলা পাড়া গ্রামের উক্ত ৮ জুম্ম নারী ও পুরুষ শ'কুড়ি বিল নামক কর্ণফুলী হ্রদ এলাকায় চিংড়ি মাছ ধরছিল। প্রতি বছর তারা এই মৌসুমে ঐ এলাকায় চিংড়ি মাছ ধরে আসছিল। কিন্তু এমন সময় ১০-১২ জনের একদল সেটেলার বাঙালি লাঠিসোটা নিয়ে মাছধরারত জুম্মদের হামলা চালায়। সেটেলারদের দাবি পাছে তাদের মাছের জাক (মাছ ধরার স্থান) রয়েছে। হামলায় রতন জ্যোতি চাকমা (২২) পীং-জ্যোতিষ্কর চাকমা নামের এক জুম্ম মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। চিকিৎসার জন্য রতন জ্যোতি চাকমাকে প্রথমে নানিয়ারচর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেটেলার বাঙালিদের এই হামলায় নেতৃত্ব দেয় মো: নুরু (৫০) পীং-মৃত জমির উদ্দিন, সাং-জাল্যাপাড়া ও আব্বাস পীং-অজ্ঞাত, সাং-ঐ।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুমভূমি বেদখলের চেষ্টা

গত ১৬ মে ২০১৪ সকালের দিকে রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলাধীন ৭নং লংগদু ইউনিয়নের ভাইবোন ছড়া বাজার এলাকার একদল সেটেলার বাঙালি কর্তৃক স্থানীয় জুম্ম জনগণের মালিকানাধীন জুমভূমি বেদখলের চেষ্টা করা হয় এবং ঐ ভূমিতে অন্তত ৩টি ঘরও নির্মাণ করা হয়।

জানা গেছে, ঐ দিন সকাল প্রায় ৮:০০ টায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্থানীয় বামে লংগদু সেনা সাবজোনের সুবেদার মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ১০-১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেনা দল প্রথমে ঐ এলাকায় টহল দেয়। এ সময় সেনা সদস্যরা ভূমির মালিকদের দলিলপত্র নিয়ে আগামী দিন তাদের ক্যাম্পে গিয়ে কম্যান্ডারের সাথে দেখা করার জন্য স্থানীয় জুমচাষীদের নির্দেশ দেয়। সেনাদলটি সেখান থেকে আসার পরপরই ২০-৩০ সদস্য বিশিষ্ট সেটেলার বাঙালিদের একটি দল ঐ জুমভূমিতে যায় যেখানে স্থানীয় জুম চাষীরা জুমচাষ করছিল।

সেটেলার বাঙালিদের মধ্যে দুই জন ভাইবোন ছড়া এলাকাস্থ মিসেস দীপ্তি চাকমা (৬৫) স্বামী-মৃত চিত্ত রঞ্জন চাকমা এর মালিকানাধীন হোল্ডিং নং-এইচ১২-ক (৪ একর) এর জুমভূমিতে দুটি ঘর নির্মাণ করে। উল্লেখ্য, ঐ ভূমিতে এখন স্থানীয় বাসিন্দা শান্তি রঞ্জন চাকমা (৩০) মালিকের অনুমতি নিয়ে জুমচাষ করছে। ঘর নির্মাণকারী ২ সেটেলার বাঙালি হচ্ছে–(১) রাজ্জাক (৩০) পীং-মৃত আলী নেওয়াজ, সাং-ভাইবোন ছড়া বাজার এলাকা, (২) ইউসুফ (৩২) পীং-মৃত হাকিম খান, সাং-ঐ।

অপরদিকে একই দলের ওলি উল্লাহ ওরফে রিকশাওয়ালা (৫৫) নামে অপর এক সেটেলার বাঙালি একই এলাকার ত্রিদিপ চাকমা পীং-মৃত নোয়ারাম চাকমার মালিকানাধীন হোল্ডিং নং-এইচ ৮০ (৫ একর) এর ভূমিতেও একটি ঘর নির্মাণ করে। ঐ জায়গায় বর্তমানে জুমচাষ করছে ত্রিদিপ চাকমার ছেলে মিলন চাকমা (২৮)। এছাড়া বাঙালি সেটেলাররা একই এলাকার সুপতি চাকমা (৩০) পীং-অজ্ঞাত এর ভূমিতেও জঙ্গল পরিষ্কার করে।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক বৌদ্ধ বিহারের জায়গা বেদখলের চেষ্টা

রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার আটরকছড়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত আটরকছড়া মৌজার বামে আটরকছড়া গ্রামের ভক্ত কুমার কাবারী পাড়ায় নির্মিত বৌদ্ধ বিহার 'প্রশান্তি অরণ্য কুঠির' এর নির্ধারিত জায়গা অবৈধভাবে বেদখল করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ স্থানীয় কতিপয় সেটেলার বাঙালি প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি বিহারের সুনির্দিষ্ট সীমানার ভিতরে ঢুকে কুঠিরের রোপণকৃত সেগুন ও আগর চারা উপড়ে দিয়ে ৪/৫টি বসতবাড়ি নির্মাণ করার জন্য খুঁটি স্থাপন করে এবং ব্যাপকভাবে জঙ্গল পরিষ্কার করে বলে এলাকাবাসীর সূত্রে জানা গেছে।

এ বিষয়ে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রশাসনকে যথাসময়ে বারংবার অবহিত করার পরও সুরাহা করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বিগত ৮ জুন ২০১৪ স্থানীয় হেডম্যান, গণ্যমান্য মুরুব্বী এবং কুঠির পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে লংগদু উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবিষয়ে তাকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূসম্পত্তি রক্ষা করার অনুরোধ কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। চেয়ারম্যান ২/১ দিনের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের আশ্বাস দেন। কিন্তু সমাধানতো দূরের কথা বরঞ্চ ১১ জুন ২০১৪ রাত আনুমানিক ১২.৩০ঘটিকার সময় মোঃ জলিল (৪৫) পীং-মোঃ হযরত আলী, সাং- সোনাই, ৫নং ব্লক, ৬নং মাইনীমুখ ইউনিয়ন, লংগদু নামে এক সেটেলার বসবাস করার জন্য পরিবার পরিজন নিয়ে কুঠিরের ভিক্ষু/শ্রামণদের ভাবনা/ধ্যান করার জন্য প্রায় ৯মাস আগে নির্মিত একটি ঘরে উঠে যা বৌদ্ধ ধর্মীয় মতে বৌদ্ধ ধর্মকে পরিহানি করার সামিল। এবিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করা হয় এবং উক্ত পরিবারকে ঐ ঘর থেকে সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়।

জানা যায়, লংগদু জোনের জোন আইএনসিও মোঃ জহির এবং লংগদু থানার এস আই মোঃ ইব্রাহিম সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মোঃ জলিলের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে উক্ত ঘরে দেখেন বা আছে বলে তখন স্বীকার করেন। তবে মোঃ জলিলকে তখন সেখানে পাওয়া যায়নি। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত এই পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়েছে বলে জানা যায়নি।

ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী দম্পত্তিকে গুলি

গত ২৩ জুলাই ২০১৪ রাত প্রায় ১.১৫ ঘটিকায় মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তাইন্দং ইউনিয়নের ৮ নং ওর্য়াড ও তাইন্দং মৌজার বাসিন্দা মি. জ্যোতি বিকাশ তঙঙ্গ্যা, পিতা- ঈশ্বর চন্দ্র তঙঙ্গ্যাকে ভূমি বিরোধের জের ধরে সেটেলার বাঙালি অগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করলে

জ্যোতি বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা ও তার স্ত্রী মিজ রিনি চাকমা (৩৪ বছর) আহত হয়। তাদেরকে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতাল থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, জ্যোতি বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যার শ্বশুর মুনিন্দ্র লাল চাকমা পিতা -চিকন চান চাকমার সাথে খোরশেদ আলম পিতা-রহমত আলী সাং-৭ নং ওয়ার্ড, তাইন্দং ইউনিয়ন এর ভূমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। জ্যোতি বিকাশ তার শ্বশুরকে জমি রক্ষা করার জন্য আইনগতভাবে সাহায্য করে। জ্যোতি বিকাশকে হত্যা করতে পারলে তার শ্বশুরের জমি খোরশেদ আলম বেদখল করতে পারবে। এ জন্য ঐদিন রাতে খোরশেদ আলম সহ রিপন এবং অন্য সহযোগীরা জ্যোতি বিকাশ ও তার স্ত্রী রিনি চাকমাকে হত্যা করতে গিয়েছিল। গুলি করে চলে যাওয়ার সময় বিজিবির নিকট রিপন (২৩) পিতা আলী আকবর, সাং-৩ নং ওয়ার্ড, তাইন্দং ইউনিয়ন ধরা পরে। অন্য তিন জন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

খাগড়াছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের জমি বেদখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল ৮.৩০টার দিকে খাগড়াছড়ি জেলাধীন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কমলছড়ি ইউনিয়নস্থ মধ্য বেতছড়িতে (১) সুমতি চাকমা (৫০) পীং-নিশি মোহন চাকমা ও (২) সুর মোহন চাকমা (৬২) পীং-নমচন্দ চাকমা এর মালিকানাধীন আনুমানিক ৫ একর পাহাড়ি জমি বেদখল করার উদ্দেশ্যে ঐ ইউনিয়নের ভূয়াছড়ি সেটেলার গুচ্ছগ্রাম থেকে ১৪-১৫ জনের একদল সেটেলার বাঙালি দা-কুড়াল নিয়ে উক্ত জমিতে জঙ্গল কাটতে যায়। জঙ্গল কাটার সময় জুম্ম গ্রামবাসীরা তা দেখে সেটেলারদেরকে জঙ্গল না কাটার জন্য বাধা প্রদান করে। কিন্তু এরপরও বাঙালিরা কোন কথা না শুনে জঙ্গল কাটতে থাকলে গ্রামবাসীরা দলে-বলে তাদেরকে ধাওয়া করে। এতে অধিকাংশ সেটেলার পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেও তিনজন সেটেলার গ্রামবাসীদের কাছে ধরা পড়ে। গ্রামবাসীরা তাদেরকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাদের মধ্যে দুইজনকে ছেড়ে দেয়।

কিন্তু একজন না ফেরার কারণে মহালছড়ি সেনা জোন হেডকোয়ার্টার থেকে কম্যান্ডিং আফিসারের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য, ভূয়াছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে জনৈক লেফটেন্যান্ট এর নেতৃত্বে আরেকদল সেনা সদস্য ও খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমানসহ খাগড়াছড়ির এসপি (সার্কেল) ঘটনাস্থলে চলে যান। সেনা ও পুলিশ চলে আসলে সেদিন বিকাল আনুমানিক ৪.০০টার সময় গ্রামবাসীরা মো: রাজ্জাক (৪৮) নামের ঐ বাঙ্গালিকে তাদের নিকট বুঝিয়ে দেন। এব্যাপারে খাগড়াছড়ি সদর থানায় অজ্ঞাতনামা ৬০ জন জুম্মর বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের করা হয় বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য যে, ভূয়াছড়ি গুচ্ছগ্রামের বাঙালিরা দীর্ঘ দিন ধরে এলাকার জুম্ম গ্রামবাসীদের জায়গা বেদখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে স্থানীয় মেম্বার-চেয়ারম্যানগণ খাগড়াছড়ি সদর থানায় ইতোপূর্বে অভিযোগ দিয়ে আসছিলেন।

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী অপতৎপরতা

সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায়, উপরন্তু একটি মহলের আশ্রয়-প্রশ্রয় দান, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ ও তাদের দোসর সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা এখনও পূর্বের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রেখেছে। উপরন্তু জনসংহতি সমিতির নিরস্ত্র সদস্য ও চুক্তির সমর্থক নিরীহ ব্যক্তিদের খুনসহ সাধারণ মানুষকে অপহরণ, খুন, অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায়, জোরপূর্বক চাঁদাবাজি, মারধর, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সাম্প্রতিক কালে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ১৪ নভেম্বর ২০১৩ হতে ২৬ অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল–

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে মাটিরাঙ্গায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

গত ১৪ নভেম্বর ২০১৩ সকাল ১১.২৫ তার সময় খাগড়াছড়ি'র মাটিরাঙ্গা উপজেলার বেলছড়ি ইউনিয়নের খেদাছড়া মৌজাস্থ রবি সুন্দর কাবারী পাড়া নিবাসী লক্ষী কুমার চাকমার দোকানে বসে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বাঙালি কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি বিঘা ধান্য জমি থেকে বার্ষিক চার হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এতে সেটেলার বাঙালিরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সেটেলার বাঙালিরাও পাহাড়ি কৃষকদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করা হবে এবং ধান কাটা বন্ধ করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে পলাশপুর বিজিবি কম্যান্ডার ও উপজেলা চেয়ারম্যান শামসুল হক ঘটনাস্থলে যান। পরে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও চাঁদাবাজি বন্ধ করার আশ্বাস দেয়ার পর উত্তেজনা কমে। এ ঘটনায় জড়িত ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা হল-(১) চন্দন চাকমা, (২) জিরান চাকমা, (৩) নতুন কুমার ত্রিপুরা, (৪) জনলাল ত্রিপুরা আর সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা হল-(৫) কিশোর ত্রিপুরা, (৬) সালমান ত্রিপুরা, (৭) দীপ চাকমা।

মাটিরাঙ্গায় চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক বাৎসরিক চাঁদা দাবি

গত ১৮ নভেম্বর ২০১৩ সকাল ১০টায় মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদরের ১০ নং তন্তুমাষ্টার পাড়া, কাঁঠাল পাড়া, মাইরুং পাড়ায় পরিবার প্রতি বাৎসরিক গণচাঁদা দাবি করে চিঠি পাঠিয়েছে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা। ইউপিডিএফের চীফ চাঁদা কালেক্টর অর্জুন চাকমা স্বাক্ষরিত চিঠিটি সহ-কালেক্টর পাই কুমার ত্রিপুরার মাধ্যমে পাঠানো হয় বলে জানা গেছে। ওই চিঠিতে হেডম্যান, কার্বারী, ইউপি মেম্বারদের চাঁদা উত্তোলন করে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এদিকে সর্বসিদ্ধি পাড়া, বামা গুমতি, গুমতি, বেলছড়ি এলাকায় প্রত্যেক বিঘা ধান্য জমিতে জুম্মদের জন্য ৩০০ টাকা, বাঙালিদের জন্য ২০০০ টাকা চাঁদা দাবি করে এলাকার হেডম্যান, কার্বারী, ইউপি মেম্বারদের কাছে চিঠি দিয়েছে ইউপিডিএফ। ইউপিডিএফের চাঁদা আদায়কারী সন্ত্রাসীরা হল-(১) মাটিরাঙ্গা উপজেলার ব্যাঙমারা, সাপমারা, আলুটিলা এলাকার চীফ চাঁদা কালেক্টর অর্জুন চাকমা, সহকারী কালেক্টর পাই কুমার ত্রিপুরা, (২) মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুমতি, বেলছড়ি, বামা গুমতি, তৈলাইফাং এলাকার চীফ চাঁদা কালেক্টর জীবন চাকমা, সহকারী কালেক্টর নতুন কুমার ত্রিপুরা, (৩) মাটিরাঙ্গার উপজেলার তাইন্দং, তবলছড়ি, বড়নাল ইউনিয়নের চীফ চাঁদা কালেক্টর বিনেশ্বর চাকমা, সহকারী কালেক্টর দিপু চাকমা।

জানা গেছে, ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের চাঁদা আদায়ের নির্ধারিত হার হচ্ছে– চাকুরীজীবী বেতনের ১০%, দিন মজুর পরিবার প্রতি ৩০০ টাকা, মধ্যবিত্ত পরিবার প্রতি ৫০০ টাকা, হেডম্যান/কার্বারী/ মেম্বার/ শিক্ষক ৭০০-১০০০ টাকা, ধান মেশিন ২০০০ টাকা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ২০০০ টাকা, ধান্য জমি (প্রতি বিঘা) জুম্ম ৩০০ টাকা, ধান্য জমি (প্রতি বিঘা) বাঙালি ২০০০ টাকা।

বাঘাইছড়িতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীর গুলিতে জনসংহতি সমিতির দুই সদস্যসহ ৩ জন নিহত

গত ২১ নভেম্বর ২০১৩ সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সিজক এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি শশাঙ্ক মিত্র চাকমা ওরফে প্রীতিষ বাবু (৫৮) ও সাংগঠনিক সম্পাদক নন্দ কুমার চাকমা (৪৬) এবং যুধিষ্ঠির চাকমা নামে এক নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হন। শশাঙ্ক মিত্র চাকমা ও নন্দ কুমার চাকমা উভয়ই জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য।

জানা গেছে, জনৈক এক গ্রামবাসী জরুরী কাজে তাদের সাথে ঐ দিন সকাল ৭:৩০টায় দেখা করার অনুরোধ জানালে, সেই অনুরোধে সাড়া দিতে গিয়ে তারা অন্যদিনের চেয়ে বেশ ভোরে সিজক কলেজ সংলগ্ন নির্ধারিত দোকানে আসতে থাকে। দোকানে পৌছার সাথে

সাথে আগে থেকে ওৎপেতে থাকা সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য এলোপাতাড়ি ব্রাশ ফায়ার করে। নিরস্ত্র শশাঙ্ক মিত্র চাকমা ও নন্দ কুমার চাকমা এবং তাদের পাশে থাকা অপর গ্রামবাসী যুধিষ্ঠির চাকমা ঘটনাস্থলেই নির্মমভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পরে পুলিশ তাদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। শশাঙ্ক মিত্র চাকমার স্ত্রী বাদী হয়ে সংস্কারপন্থীদের ৯ জন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু আজ অবধি পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

লক্ষীছড়ি ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২৫ নভেম্বর ২০১৩ রাত আনুমানিক ৭:৩০টার সময় খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলাধীন দুল্যাতলী ইউনিয়নস্থ রান্যামাছড়া থেকে রসিক্যা চাকমা (৩৭) পীং-নাইবা চাকমা নামে এক নিরীহ গ্রামবাসীকে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অপহরণ করেছে। জানা যায়, ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত সন্ত্রাসী দলে নেতৃত্ব দেয় সমীরণ চাকমা। অপহৃত রসিক্যা চাকমা একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ী। জানা গেছে, পরে অপহরণকারী সন্ত্রাসীরা মুক্তিপণের বিনিময়ে রসিক্যা চাকমাকে ছেড়ে দেয়। জানা গেছে, পরে অপহণকারীরা মুক্তিপণের বিনিময়ে রসিক্যা চাকমাকে ছেড়ে দেয়।

লংগদুর কাপ্তাইহ্রদে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্যদের উপর গুলিবর্ষণ

গত ২ ডিসেম্বর ২০১৩ আনুমানিক বিকাল ৩:৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার কাট্টলী বিল এলাকায় (কাপ্তাইহ্রদ) স্পিড বোট যোগে বাঘাইছড়ি হতে রাঙ্গামাটি ফেরার পথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের উপর ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা এক সশস্ত্র হামলা চালায়।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাঘাইছড়ি উপজেলার শিজক কলেজ মাঠে আয়োজিত গণসমাবেশ থেকে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ সভাপতি সুবর্ণ চাকমা, সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের স্টাফ সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা ও বরুন কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক টোয়েন চাকমা এবং লংগদু উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত গণসমাবেশ থেকে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কিশোর কুমার চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ একটি স্পিড বোট যোগে রাঙ্গামাটি ফেরার পথে লংগদু উপজেলার কাট্টলী বিল এলাকায় (কাপ্তাইহ্রদ) পৌছলে আগে থেকে ঘাপতি মেরে থাকা ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাদের উপর এলোপাতাড়ি গুলি করে। এছাড়া অতিরিক্ত জেলা হাকিমকে বহনকারী একটি স্পিড বোট এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বহনকারী আরেকটি স্পিড বোটেও সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র হামলা চালায়। এ হামলায় জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য হতাহত না হলেও অতিরিক্ত জেলা হাকিমের দু' জন সফরসঙ্গী আহত হয়েছেন বলে জানা যায়।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক বাঙালি ব্যবসায়ী অপহৃত

গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৩:৩০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষীছড়ি উপজেলার ৩নং বর্মাছড়ি ইউনিয়নস্থ বিনাজুড়ি গ্রাম থেকে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা আহম্মদ সোফা (৪৫) পীং-মো: তোফায়েল আহম্মদ, গ্রাম-খিরাম, নানুপুর ইউনিয়ন, ফটিকছড়ি উপজেলা, চট্টগ্রাম নামের আরও এক বাঙালি ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে। উল্লেখ্য, গত ২৪ নভেম্বর ২০১৩ সচিব চাকমা ও মিঠুন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ি সদর উপজেলার যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া থেকে আলমগীর হোসেন ও ওমর আলী নামের ২ বাঙালি ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে করেছিল। তাদের কাছ থেকে প্রথমে ২৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করলেও পরে দুই লক্ষ টাকা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়। দুই সপ্তাহ পরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা আবার এ অপহরণের ঘটনা ঘটালো।

দীঘিনালায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৩ জুম্ম গ্রামবাসী অপহৃত

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ রাত আনুমানিক ১১.০০ টার সময় ইউপিডিএফ এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়ন থেকে ৩ জুম্ম গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। জানা গেছে, অপহরণের পর অপহরণকারীরা তিনজনের জন্য নিম্নোক্ত হারে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয় বলে জানা গেছে–

(১) দয়াল চাকমা পীং-অমূল্য রঞ্জন চাকমা, গ্রাম-উপেন্দ্র পাড়া, চঙড়াছড়ি, মেরুং ইউনিয়ন, দীঘিনালা উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে মুক্তিপণ হিসেবে ১,০০,০০০ (একলক্ষ) টাকা ধরা হলে নগদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

(২) পত্যাধন চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, সাং-ঐ। তাকে ৩,৫০,০০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মুক্তিপণ ধরা হয় বলে জানা যায়।

(৩) মুকুন্দ চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, গ্রাম-চৌধুরী পাড়া, মেরুং ইউনিয়ন, দীঘিনালা উপজেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মুক্তিপণ ধরা হয় বলে জানা যায়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ৯ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ৪ জানুয়ারি ২০১৪ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৯ নিরীহ গ্রামবাসী অপহরণের শিকার হন। তবে দুই দিন যাবৎ আটকাবস্থায় নির্যাতনের পর ৬ জানুয়ারি ২০১৪ অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়।

জানা গেছে, ঐ দিন সকাল প্রায় ৯:০০ টায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের ৯ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে এসে বামা গোমতি সর্বসিদ্ধিপাড়ায় জড়ো করে এবং আটকে রাখে। ইউপিডিএফের অভিযোগ, উক্ত গ্রামবাসীরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের প্রার্থীর বিপক্ষে কাজ করছিল। অপহৃত গ্রামবাসীরা হল:- (১) ষোলো আনা ত্রিপুরা (৪২) পীং-মৃত পুষ্পরাম ত্রিপুরা, সাং-মাকুমতইসা রোয়াজা পাড়া; (২) রুহিনী কুমার ত্রিপুরা (৬০) পীং-দুলেন্দ্র ত্রিপুরা, সাং-ঐ; (৩) জীবনানন্দ ত্রিপুরা (৩৮) পীং-লক্ষী মোহন ত্রিপুরা, সাং-বুমুং করই পাড়া, বান্দরছড়া; (৪) মনি রঞ্জন ত্রিপুরা (৩৮) পীং-ভবানি কুমার রোয়াজা, সাং-ব্রিহনন্দ পাড়া, বান্দরছড়া; (৫) গোলাপ রঞ্জন ত্রিপুরা (৩৭) পীং-পুরান কুমার ত্রিপুরা (কার্বারী), সাং-পুরান কুমার পাড়া, বান্দরছড়া; (৬) মুখ্য রঞ্জন ত্রিপুরা (৪১) পীং-মৃত যতীন কুমার ত্রিপুরা, সাং-বৃহনন্দ পাড়া, বান্দরছড়া; (৭) শায়ন বিকাশ ত্রিপুরা (৪৩) পীং-মৃত চন্দন কুমার ত্রিপুরা, সাং-ভাঙামুরা; (৮) ধনজয় ত্রিপুরা (২৬) পীং-পরেশ ত্রিপুরা, সাং-ভাঙামুরা; এবং (৯) অতুল কুমার ত্রিপুরা (৩৭) পীং-মৃত রামধন ত্রিপুরা, সাং-গোকল মুনি পাড়া।

চিহ্নিত অপহরণকারীরা হল-(১) চন্দন চাকমা, ইউপিডিএফের সশস্ত্র গ্রুপের এলাকার প্রধান, (২) জেরিন চাকমা, (৩) বিনয় চাকমা, (৪) ধনমনি ত্রিপুরা পীং-ব্রজ কুমার ত্রিপুরা, সাং-ভাঙামুরা, (৫) কল্পা ত্রিপুরা, সাং-সর্বসিদ্ধি পাড়া।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক গ্রামবাসী অমানবিকভাবে প্রহৃত

গত ৭ জানুয়ারি ২০১৪ রাত আনুমানিক ১০:০০ টায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন মাটিরাঙ্গা সদর ইউনিয়নের ফেলা কুমার কার্বারী পাড়া গ্রামের বাসিন্দা গ্রামের কার্বারী জোসেফ ত্রিপুরা (৪০) পীং-মৃত ফেলা কুমার ত্রিপুরা ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক মারাত্মকভাবে প্রহারের শিকার হন।

জানা গেছে, কার্বারী জোসেফ ত্রিপুরা ঐ সময় নিজ বাড়িতে বসে টিভি দেখছিল। তখন চন্দন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং জোসেফ ত্রিপুরাকে বাড়ির বাইরে একটু নিয়ে গিয়ে কোন কথাবার্তা ছাড়াই অমানবিকভাবে বেদম প্রহার করে চলে যায়। পরদিন ৮ জানুয়ারি ২০১৪ জোসেফ ত্রিপুরার পরিবার ও প্রতিবেশীরা মারাত্মকভাবে আহত জোসেফকে মাটিরাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করায়।

লংগদুতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ৭ জানুয়ারি ২০১৪ রাত আনুমানিক নয়টায় রাঙ্গামাটির লংগদু উপজেলার মহাজনপাড়া থেকে কালাইয়া চাকমা (৩২) পিতা: উমেশ চন্দ্র চাকমাকে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃতকে ছেড়ে দেয়া হয়।

জানা যায়, ঘটনার সময় রাসেল চাকমা ও আপন চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীর সাতজনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে কালাইয়া চাকমাকে অপহরণ করে। এ অপহরণ ঘটনার আগে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মহাজনপাড়ায় সেনাবাহিনীর একটি টহলদল অবস্থান করেছিল বলে এলাকাবাসী জানায়। সেনাবাহিনী সেখান থেকে চলে যাওয়ার সাথে সাথে এ অপহরণ ঘটনা ঘটায় এলাকাবাসীর মনে সন্দেহ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

পানছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক নিরীহ গ্রামবাসী নিহত

গত ৮ জানুয়ারি ২০১৪ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিদ্যা মোহন কার্বারী পাড়ার কার্বারী নব রঞ্জন ত্রিপুরা (৪২) পিতা: মৃত বিদ্যা মোহন ত্রিপুরাকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে।

জানা যায়, ইউপিডিএফের উপ ত্রিপুরা (৩২) পিতা: ক্ষিরোদাস ত্রিপুরা'র নেতৃত্বে চারজন সন্ত্রাসী নবরঞ্জন ত্রিপুরার বাড়ির চাকর হাদুক রায় ত্রিপুরা (৫৫)কে ডেকে বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে মোবাইল ফোন দিতে বলে। হাদুক রায় নিজেকে বাড়ির চাকর বলে দাবি করলে তাকে ছেড়ে দিয়ে নবরঞ্জনকে ধরে নিয়ে যায় চার যুবক। এ সময় অভিযুক্তরা নবরঞ্জনের বড় মেয়ে নমিতা ত্রিপুরা(২১)'র মোবাইল ফোন সেটটি কেড়ে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বাড়ির লোকজন তিনটি গুলির শব্দ শুনতে পান। এ ঘটনায় ইউপিডিএফ কর্মী উপ ত্রিপুরা (৩২) ওরফে কাথাং ও দীপন ত্রিপুরা (৪৫) ওরফে লাম্পাইয়্যার নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ১০/১২ জনের বিরুদ্ধে পানছড়ি থানায় মামলা (মামলা নং-০৭; তারিখ: ০৯-০১-২০১৪ইং, ধারা- ৩৬৪/৩০২/০৪ দ:বি:) দায়ের করেছেন নিহতের স্ত্রী পারুল বালা ত্রিপুরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ নবরঞ্জন ত্রিপুরা দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরার পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করায় ইউপিডিএফ কর্মীরা নবরঞ্জন ত্রিপুরাকে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছিল।

কাউখালিতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির এক সমর্থককে গুলি

গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৪, রাত আনুমানিক ৭:০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাউখালী উপজেলার সদর ইউনিয়নের কচুখালী গ্রামের বাসিন্দা জনসংহতি সমিতির সমর্থক সোহেল চৌধুরী (৪৮) পীং- মৃত কংজয় কার্বারীকে নিজ বাড়িতে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে। জানা যায়, হাপানির রোগী সোহেল চৌধুরী ঐ সময় বাড়িতে চুলার পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন সন্ত্রাসী এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। এতে তার পায়ের হাটুর নীচে গুলি বিদ্ধ হলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান। তাকে আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ৫ জানুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত বিগত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সোহেল চৌধুরী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী উষাতন তালুকদারের পক্ষে প্রচারণার সময় নিজ এলাকায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এজন্য নির্বাচনের পূর্বে ও পরে ইউপিডিএফের পক্ষ থেকে মোবাইলে একাধিকবার তাকে হুমকি দেয়া হয় বলে জানা যায়।

রোয়াংছড়িতে জনসংহতি সমিতির এক কর্মীকে হত্যা

গত ২১ জানুয়ারি ২০১৪ রাত ৯:০০ টায় বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের বেতছড়া নাছালং পাড়ায় (হেডম্যান পাড়া) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। জানা যায়, ঘটনার দিন রেদাসে মারমা ওরফে রেঞ্চু নিজ গ্রামে যায়। রাতে একই গ্রামের (১) পুলুমং মারমা (৩৫) পীং-বোলীমং মারমা, (২) ক্যহাচিং মারমা (৩৪) পীং-কোলমং মারমা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা রেদাসে মারমাকে তুলে নিয়ে হত্যার পর লাশ গুম করে ফেলে।

দীঘিনালায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক গ্রামবাসীকে অপহরণ

গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৪ দুপুর সাড়ে বারটায় খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া এলাকার জারুলছড়ি গ্রামের প্রেম রঞ্জন চাকমা (৫০) পীং-রেবতী চাকমাকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ডেকে নিয়ে দুইদিন আটকে রেখে অমানবিক শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন প্রেম রঞ্জন চাকমা বাবুছড়া বাজারে কেনাকাটার জন্য গেলে ইউপিডিএফের কর্মিরা তাকে ডেকে নিয়ে যায় এবং দুইদিন তাকে আটকে রেখে অমানবিকভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায়। এদিকে প্রেম রঞ্জন চাকমা সেদিন বাজার থেকে ফিরে না আসলে স্বজনরা গ্রামের মুরুব্বীদের কাছে ঘটনাটি জানায়। গ্রামের মুরুব্বীরা সাথে সাথে ইউপিডিএফ নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে। পরে গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৪ ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী অপহরণকারীরা আহতাবস্থায় প্রেম রঞ্জন চাকমাকে মুরুব্বীদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। ইউপিডিএফের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে প্রেম রঞ্জন চাকমাকে মোবাইল ব্যবহার না করতে নিষেধ করা হয়েছিল। ইউপিডিএফদের অভিযোগ, প্রেম রঞ্জন চাকমা চুক্তিপক্ষের লোকজনদের সাথে যোগাযোগ রাখে। তাই প্রেম রঞ্জন চাকমাকে এই শাস্তি দেয়া হয়েছে জানিয়ে দেয়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ২ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৪ বিকাল ৪:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বান্দরছড়া মৌজার তরুণী কুমার পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে জেরিন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসীরা দু'জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। জানা গেছে, গুমতি এলাকায় গ্রামবাসীদের কাছে ধার্যকৃত চাঁদা উত্তোলন করে না দেয়ায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ওই দুজন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণের পর অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে জিম্মি করে রাখে।

অপহৃতরা গ্রামবাসীরা হল- (১) ফুল চাঁন ত্রিপুরা (৪৫) (গ্রামের কার্বারী) পীং-মৃত যোগেন্দ্র ত্রিপুরা এবং (২) শান্তি কুমার ত্রিপুরা (৫০) পীং-মৃত পূর্ণ কুমার ত্রিপুরা, গুমতি ইউপি, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি। জানা গেছে, পরে গ্রামবাসীর চাপে ও মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহরণকারীরা অপহৃতদের ছেড়ে দেয়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফের চাঁদা দাবি ও হত্যার হুমকি প্রদান

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ বিকাল প্রায় ৪:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১৯০ নং বান্দরছড়া মৌজাধীন গুমতি এলাকায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী জেরিন চাকমার নেতৃত্বে ৭ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ নন্দের বাঁশি ত্রিপুরার বাড়িতে গিয়ে তাকে ১৭,০০০ টাকা ও তার গ্রাম থেকে পরিবার প্রতি ৫০০ টাকা করে এক সপ্তাহের মধ্যে চাঁদা উত্তোলন করে দিতে নির্দেশ দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে চাঁদা উত্তোলন করে দিতে ব্যর্থ হলে তাকে হত্যা করা হবে বলেও হুমকি দিয়ে যায়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফের হামলা, ঘরের আসবাবপত্র ভাংচুর, নির্যাতনে দুই নারী আহত

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৪ দুপুর ১২:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা সদর উপজেলার ১০ নম্বর তপ্তর মাষ্টার পাড়ায় চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে বাড়ির আসবাবপত্র ভাংচুর ও দুজন নারীকে আহত করেছে। জানা গেছে, ইউপিডিএফ-এর চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাটিরাঙ্গা উপজেলার কালেক্টর চন্দন চাকমা ও সাব পোস্ট চাঁদা কালেক্টর জেরিন চাকমার নেতৃত্বে এ হামলার ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত দুজন নারী হল-(১) শেফালিকা ত্রিপুরা (২২) স্বামী-আশুতোষ ত্রিপুরা এবং (২) বকুল বালা ত্রিপুরা (৩০) স্বামী-জিতেন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রাম-১০ নম্বর তপ্তমাষ্টার পাড়া, মাটিরাঙ্গা।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের হামলায় নারীসহ ৩ জন আহত

গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ রাত প্রায় ৮:০০টায় ইউপিডিএফের চন্দন চাকমা ও জেরিন চাকমার নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ উপাসিং পাড়া গ্রামে অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ৮/১০ জন গ্রামবাসীকে মারধর করে। ঘটনার সময় মারাত্মকভাবে আহত হয় তিনজন। আহতরা হল-(১) মিন্টু ত্রিপুরা (২৫) পিতা- মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বিএ ১ম বর্ষ, মাটিরাঙ্গা ডিগ্রী কলেজ, গ্রাম-উপাশিং পাড়া(আমতলী), (২) কায়াং ত্রিপুরা (৩০) স্বামী-ধন কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম-উপাশিং পাড়া(আমতলী), (৩) মফিজ উদ্দিন (৩৫) পিতা-ইজু মিয়া, গ্রাম-উপাশিং পাড়া(আমতলী)।

হামলা শেষে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় ৫/৬ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় সংক্রান্ত কারণ ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রসিত বিকাশ খীসাকে ভোট প্রদান না করার কারণে এ হামলা চালানো হয় বলে জানা গেছে।

দীঘিনালায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক গ্রামবাসীকে অপহরণ

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রাত আনুমানিক ৮:৩০ ঘটিকায় ইউপিডিএফের চিহ্নিত সন্ত্রাসী মিলন চাকমার নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া থেকে নীলু কুমার চাকমা (২৮) পিতা দিবাকর চাকমা নামে এক গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয়। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয় বলে জানা গেছে।

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক তিন গ্রামবাসী অপহৃত

গত ৫ মার্চ ২০১৪ সকাল প্রায় ৮:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের বিনাজুরি ও কুতুকছড়ি গ্রাম থেকে রতন বসু ওরফে জয় বসু এর নেতৃত্বে ইউপিডিএফের ১২ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী তিনজন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা তিন রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলে যায়। তবে কি কারণে তাদেরকে অপহরণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি। পরে অপহৃতদের মধ্য হতে বর্মাছড়ি মৌজার হেডম্যান সাথোয়াই মারমাকে ছেড়ে দেয়া হলেও বাকীদের অজ্ঞাত স্থানে জিম্মি করে রাখা হয়। অপহৃতরা হলো:- সাথোয়াই মারমা (৫২) পীং-ধলছে মারমা, গ্রাম: বিনাজুরি; ভূষণ চাকমা (৫৩) পীং-ভাগ্য চন্দ্র চাকমা, গ্রাম: কুতুকছড়ি; এবং তুফান চাকমা (২৭)। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ১ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ১১ মার্চ ২০১৪ রাত আনুমানিক ১০:২০টায় ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার নানিয়ারচর ইউনিয়নের খুল্যাংপাড়া গ্রাম থেকে প্রাক্তন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মানিক্যধন চাকমা (৪৫) পীং-মৃত প্রেমানন্দ চাকমা নামের এক চুক্তি সমর্থককে অপহরণ করে। জানা গেছে, অপহরণের সময় মানিক্যধন চাকমা তার বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা প্রথমে তাকে বাড়ির বাইরে আসতে বলে। তিনি বাড়ির বাইরে আসার পর সন্ত্রাসীরা বাইরে থেকে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলে পরিবারের অন্যরা বাড়ির ভেতরে থাকতে বাধ্য হয়। এরপর সন্ত্রাসীরা মানিক্যধনকে মারধর করতে করতে বাড়ির পূর্ব দিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয় বলে জানা গেছে।

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক দুই নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২০ মার্চ ২০১৪ রাত ৭:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের পাত্রাছড়া গ্রাম থেকে কুতুকছড়ির দুই গ্রামবাসীকে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে।

জানা গেছে, একই ইউনিয়নের কুতুকছড়ি এলাকার দুই গ্রামবাসী সকালে লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের পাত্রাছড়ি গ্রামে তাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখান থেকে রাত ৭:০০টার সময় সুনীল কান্তি চাকমার নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী ওই দুই গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। মুক্তিপণ আদায়ের জন্য তাদেরকে অপহরণ করা হয় বলে এলাকাবাসীদের ধারণা। অপহৃতরা হল-(১) রিপন চাকমা (১৬) পীং-গুরু মনি চাকমা, গ্রাম-কুতুকছড়ি, লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি, (২) গোরল্যা চাকমা (১৭) পীং-বুদ্ধমনি কার্বারী, গ্রাম-কুতুকছড়ি নতুন বাজার, বর্মাছড়ি ইউনিয়ন, লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি। মুক্তিপণের বিনিময়ে পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয় বলে জানা গেছে।

বাঘাইছড়িতে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী কর্তৃক দুই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নির্যাতন

ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থী কর্তৃক নির্যাতিত জনৈক ব্যবসায়ী

গত ২১ মার্চ ২০১৪ রাত প্রায় ২:৩০ টায় রুনী, জানং, সরকাজ্যা ও ধিম্বা চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফ এবং সংস্কারপন্থীর ২১ জনের একটি যৌথ সন্ত্রাসী গ্রুপ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সিজক দোজর বাজার থেকে দুই ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, ঘটনার সময় ইউপিডিএফ এবং সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে অস্ত্রের মুখে তাদের অপহরণ করে জুরজুরিছড়া এলাকায় নিয়ে যায়। নির্যাতিতরা জানায়, গত ১৫ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠিত তৃতীয় দফা বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ইউপিডিএফ এবং সংস্কারপন্থী প্রার্থীকে ভোট না দেওয়ার অভিযোগে তাদের অপহরণ ও নির্যাতন করা হয়।

পরে ২১ মার্চ ২০১৪ সকাল ১০:০০টার দিকে এলাকাবাসীদের প্রতিবাদের মুখে পড়ে অপহৃত দুই ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দিয়ে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের অমানবিক শারীরিক নির্যাতনে মারাত্মক আহত হয় সিজক দোজর বাজার গ্রামের তপন বিকাশ চাকমা ওরফে বাবুইয়া (৪০) পীং-সুবল চন্দ্র চাকমা ও একই গ্রামের সুখ্যা চাকমা (৩০) পীং- জোগার চাকমা। সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে তপন বিকাশ চাকমা (বাবুইয়া)র চোখসহ সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সুখ্যা চাকমার হাত ও পিঠে রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে যায়। আহতদের গত ২১ মার্চ ২০১৪ বিকাল ৫:৩০ টায় রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নাইক্ষ্যংছড়িতে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের নামে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা

গত ২২ মার্চ ২০১৪ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫জন সদস্যের নামে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়।

জানা যায়, গর্জনবনিয়া পাড়ার মৃত মাথাইনু চাকমার ছেলে উপেন্দ্র লাল কার্বারী (৪৫) বাদী হয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা (মামলা নং-জি.আর-৩৮/১৪) দায়ের করে। উপেন্দ্র লাল কার্বারীর অভিযোগ-গত ২১ মার্চ ২০১৪ বিএনপি কর্মী দীপক বড়ুয়া ও সুজিত বড়ুয়াসহ এলাকার ২২ জন তোফায়েল আহম্মদের পক্ষে প্রচারণার সময় কালো টাকা বিতরণ করতে দেখে তাদেরকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করতে চাইলে দেশীয় অবৈধ অস্ত্রসহ ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাদীর উপর হামলা চালানো হয়। পরে এ ঘটনায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনসংহতি সমিতির পাঁচজন সদস্যকে জড়িয়ে হয়রানিমূলক মামলা করা হয়। মিথ্যা মামলার শিকার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যরা হল:- মংচাবা (৪৫) পিতা মৃত কনচ মোহন, গ্রাম: ফাত্রাঝিরি; মিলন চাকমা (২৫) পিতা: মৃত মংলা অং চাকমা, গ্রাম- ভালুকিয়া পাড়া; ছৈচিমং তঞ্চঙ্গ্যা (৩৮) পিতা মৃত মংকিতাইন তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- ফাত্রাঝিরি; শিমূল তঞ্চঙ্গ্যা প্রকাশ রমেশ (৩০) পিতা- মৃত মংফুচা তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- বরইতলী; সুমন তঞ্চঙ্গ্যা (৩২) পিতা অংলা চিং তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম- বরইতলী, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান।

বাঘাইছড়িতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক বাড়িতে গুলিবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ

গত ২৫ মার্চ ২০১৪ মঙ্গলবার আনুমানিক ভোর রাত সাড়ে চারটার সময় বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতলী ইউনিয়নের উত্তর খাগড়াছড়ি গ্রামের বাসিন্দা সুবল ধন চাকমা (৪৫) পিতা- দেব রতন চাকমার গুদাম ঘরে সংস্কারপন্থীর সাতজনের একটি সশস্ত্র দল আক্রমণ চালায়। সন্ত্রাসীরা প্রথমে বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ঢুকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে দরজা-জানালা দিয়ে ভেতরে এলোপাতাড়ি কয়েকশত রাউন্ড গুলি চালায়। এতে উত্তর পাবলাখালী গ্রামের সুরেশ চাকমা গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। পরে সন্ত্রাসীরা বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে পালিয়ে যায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা একটি মোটর সাইকেলও পুড়িয়ে দেয়। আহত সুরেশ চাকমাকে রাঙ্গামাটি জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের অগ্নিসংযোগে বাড়ি মালিকের আনুমানিক সাত/আট লক্ষ টাকার সম্পত্তি আগুনে পুড়ে যায়।

দীঘিনালায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক হেডম্যান ও কার্বারী অপহৃত

গত ২৮ মার্চ ২০১৪ রাত ৯:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা ৩ নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে।

জানা যায়, ৩১ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠিত দীঘিনালা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নব কমল চাকমা (হেলিকপ্টার প্রতীক)কে সমর্থন দেওয়ায় তাদের অপহরণ করা হয়। সংস্কারপন্থী প্রশান্ত চাকমা ও বর্ণ চাকমার নেতৃত্বে অপহরণের পর সন্ত্রাসীরা (১) নরেন্দু কার্বারী পীং-অজ্ঞাত, গ্রাম-কলেজ টিলা, দীঘিনালা ও (২) দীপংকর দেওয়ান, হেডম্যান, কবাখালী মৌজা, গ্রাম- মাষ্টার পাড়া, দীঘিনালাকে হত্যার হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে এবং বংশীনাথ চাকমা পীং-অজ্ঞাত, গ্রাম-তারাবনিয়া, দীঘিনালাকে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে মারাত্মক আহত করে। পরে গ্রামবাসীদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে অপহরণকারী সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের ২৯ মার্চ ২০১৪ বিকাল ৫:০০টার দিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

লক্ষীছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে ১ ব্যক্তি খুন, কিশোরী গুলিবিদ্ধ

গত ১৯ এপ্রিল ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষীছড়ি উপজেলা সদরের জুরগাছড়ি গ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে এক ব্যক্তিকে খুন ও এক কিশোরীকে মারাত্মকভাবে আহত করে।

জানা গেছে, ঐ দিন সকাল ৭:৩০ টায় ইউপিডিএফ এর ১০-১২ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী উক্ত গ্রামের প্রদীপ কুমার চাকমা (৪৫) পীং-বিষু কুমার চাকমার বাড়ির উপর এলোপাতারিভাবে ব্রাশ ফায়ার করে। এতে জয় কুমার চাকমা (৫০) পিতা-তিলাং ধন চাকমা নামে এক নিরীহ ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান এবং প্রদীপ কুমার চাকমার দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ১৭ বছরের মেয়ে কল্পরাণী চাকমা মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে পুলিশ এসে নিহতের লাশ ময়না তদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত কল্পরাণীকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়।

রাঙ্গামাটির বন্দুকভাঙ্গা থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৩ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২০ এপ্রিল ২০১৪ রাত আনুমানিক ১০:০০টায় ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন থেকে ৩ নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, ঘটনার সময় ৪০ জনের অধিক ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বন্দুভাঙা ইউনিয়নের কুরমারা, তংতুল্যা ও মাচ্ছ্যপাড়া গ্রামে হানা দিয়ে ৩ নিরীহ গ্রামবাসীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। মুক্তিপণ আদায় কিংবা এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য তাদেরকে অপহরণ করা হয় বলে এলাকাবাসীর ধারণা। অপহৃত তিন গ্রামবাসী হল:- শান্তি কুমার চাকমা (৬০) পীং-মাধব চন্দ্র চাকমা, গ্রাম: মাচ্ছ্যাপাড়া; মৃত্যুঞ্জয় চাকমা (৪৮) পীং-জগৎ কিশোর চাকমা, গ্রাম: কুরমারা এবং চন্দ্র চাকমা (৫০) পীং-মেয়া ধন চাকমা, গ্রাম: তংতুল্যা, বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়।

ইউপিডিএফের অব্যাহত সন্ত্রাসের মুখে ২৯ পরিবার জুম্ম গ্রামবাসীর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ

ইউপিডিএফের অব্যাহত হয়রানি, চাঁদাবাজি, হুমকি ও বেশ কিছু ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার কারণে অতিষ্ট ও আতংকিত খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত নারাইছড়ি গ্রামের ২৯ পরিবারের ৯২ জন নারী-পুরুষ ও শিশু অনন্যোপায় হয়ে গত ২৫ মে ২০১৪ হতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

উল্লেখ্য, গত ৩ মে ২০১৪ তারিখও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা নারাইছড়ি বাজারে অগ্নিসংযোগ করে প্রায় অর্ধশতাধিক দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়। এতেও অনেক গ্রামবাসী ও দোকানদার বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে।

উক্ত উভয় ঘটনায় গ্রামবাসীরা বার বার স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্পে অবহিত করে সহযোগিতা চাইলেও বিজিবি কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেনি। উপরন্তু তারা ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে প্রশয় দিয়ে থাকে বলে অনেকের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, পরে ৭ জুন ২০১৪ বিজিবি ও বিএসএফ এর মধ্যে ফ্যাগ বৈঠক শেষে ভারতে আশ্রয় নেওয়া উক্ত ৯২ জন গ্রামবাসীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিএসএফ কর্তৃপক্ষ মেজর জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বাধীন বিজিবি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে।

দীঘিনালায় ইউপিডিএফ কর্তৃক টাকা লুট

গত ১৩ মে ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের ধীরেন হেডম্যান পাড়া থেকে বাঁশের দুই চালি বাহকের কাছ থেকে ১৮,০০০/-(আটার হাজার) টাকা লুট করে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

জানা যায়, নাড়াইছড়ি থেকে বাঁশের চালি নিয়ে বাবুছড়ার দিকে আসার পথে দুপুর ২.০০ টার সময় ধীরেন হেডম্যান পাড়ায় পৌছলে সেখানে ওতপেতে থাকা ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দুই চালি বাহক (১) নীলময় চাকমা (২৯) পীং-স্নেহ কুমার চাকমা, গ্রাম-শচীন্দ্র কার্বারী পাড়া, বাবুছড়া, দীঘিনালা, (২) প্রিয় জ্যোতি চাকমা (২৬) পীং-কালাবাঁশী চাকমা, গ্রাম-শচীন্দ্র কার্বারী পাড়া, বাবুছড়া, দীঘিনালা-এর কাছ থেকে মোট ১৮,০০০/-(আটার হাজার) টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

লংগদুতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক ৪ নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত, পরে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি

গত ২৬ মে ২০১৪ রাত আনুমানিক ১০:০০-১১:০০টার মধ্যে জুপিটার চাকমার নেতৃত্বে ১০-১২ সদস্য বিশিষ্ট সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের একটি দল অস্ত্রের মুখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলার আটরকছড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ৪ নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। অপহৃত ৪ গ্রামবাসী হল:- প্রিয়ময় কার্বারী (৩৫) পীং-সোনাকাজি চাকমা, সাং-বড় উল্টাছড়ি; সুসময় চাকমা (৪৬) পীং-ঐ, সাং-ঐ; মদন চাকমা (৪৮) পীং-কমলা কান্ত চাকমা, সাং-উত্তর উল্টাছড়ি; জ্যোতি বিকাশ চাকমা কাল্যা (৫৫) পীং-রাত্রি মোহন চাকমা, সাং-চদগি ছড়া; এবং কুসুম জ্যোতি চাকমা।

জানা গেছে, অপহরণকারীরা প্রথমে উক্ত গ্রামবাসীদের বাড়ি ঘেরাও করে। এরপর একে একে ঘুম থেকে তুলে বাড়ির বাইরে নিয়ে এসে অপহরণ করে নিয়ে যায়। চিহ্নিত সন্ত্রাসী জুপিটার চাকমা, সাং-বাবুপাড়া, বাঘাইছড়ি সদর এর নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরাই এ অপহরণ ঘটনা ঘটায়। অপরহরণের সময় অপহরণকারীরা পরদিন মারিশ্যা-বাঘাইছড়িতে গিয়ে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করার কথা বলে।

অপহরণের প্রায় ৭ দিন পর, ২ জুন ২০১৪, সকাল প্রায় ৯:৩০ টায় মোট ৪,০৪,০০০ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা এলাকা থেকে অপহৃত গ্রামবাসীদের মুক্তি দেয়া হয়। এদের মধ্যে প্রিয়ময় চাকমা ও সুসময় চাকমাকে ২,৫০,০০০ টাকা, মদন চাকমাকে ৪০,০০০ টাকা, কুসুম জ্যোতি চাকমাকে ৭০,০০০ টাকা এবং জ্যোতি বিকাশ চাকমাকে ৫০,০০০ টাকা মুক্তিপণ দিতে হয়।

বাঘাইছড়িতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক দুই গ্রামবাসী অপহরণ ও চাঁদাবাজি

গত ৯ জুন ২০১৪ রাত আনুমানিক ১১:০০ টায় ৮/৯ সদস্য বিশিষ্ট সংস্কারপন্থীদের একটি সশস্ত্র দল (১) অরুন বিকাশ চাকমা তগন্যা (৫৭) পীং-রঞ্জন কার্বারী, সাং-রাঙা দুরছড়ি, খেদারমারা, বাঘাইছড়ি, (২) রমনী কার্বারী (৫৬) পীং-সিতারাম চাকমা, সাং-নলবনিয়া, ঐ নামের দুই গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় অচিরেই দেখা করতে বলে। এছাড়া তারা সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ডের জন্য ২০ জুনের মধ্যে দেড় লক্ষ টাকা হারে তাদেরকে পৌছে দেয়ার নির্দেশ দেয়।

অপরদিকে একই দিন সংস্কারপন্থীদের অপর একটি গ্রুপ বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করে। জানা যায়, সংস্কারপন্থীদের নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের কয়েকজন গ্রামের মুরুব্বী দুপুর প্রায় ২:০০টায় বাঘাইছড়ি সদরের চৌমুহনীতে সংস্কারপন্থী লোকদের সাথে দেখা করতে যায়। সেখান থেকে তাদেরকে চার কিলোর দোকানে, তারপর মারিশ্যাচর থুমের একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীদের নির্দেশ জারি করে যে, ২০ জুন ২০১৪ এর মধ্যে ওয়ার্ড প্রতি তাদেরকে ১,৫০,০০০ টাকা করে সংগ্রহ করে দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখে ধার্যকৃত টাকা দিতে ব্যর্থ হলে যে কোন সময় তাদেরকে অপহরণ করা হতে পারে এবং তখন মুক্তির জন্য দ্বিগুণ টাকা দিতে হবে।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক গ্রামবাসী নির্যাতনের শিকার

গত ১৫ জুলাই ২০১৪ কানুনগো চাকমার (পরিত্রাণ) নেতৃত্বে ৮-১০ জনের একদল ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার কৃষ্ণমাছড়া গ্রামে এক অভিযান চালায়। এতে ঐ গ্রামের ৭ গ্রামবাসীকে অমানবিকভাবে মারধর করে চলে যায়। মারধর করার সময় সন্ত্রাসীরা উক্ত গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে–জনসংহতি সমিতির কর্মীদের সহযোগিতা দেওয়া, ভাত খাওয়ানো, জায়গা দেওয়া–ইত্যাদি নানা অভিযোগ তুলে ঐরকম নির্যাতন করে বলে জানা যায়। ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক মারধরের শিকার গ্রামবাসীরা হল–(১) গঙ্গা কুমার চাকমা (৫৭) পীং-শান্তি কুমার চাকমা, (২) মিন্টু চাকমা (১৫) পীং-গঙ্গা কুমার চাকমা, (৩) রূপায়ন চাকমা (২২) পীং-কানুনগো চাকমা, (৪) রূপালী চাকমা (২১) পীং-তাসমিন চাকমা, (৫) নিয়তি চাকমা (২০) পীং-যোগাজ্যা চাকমা, (৬) জেকশন চাকমা ওরফে তুকলো (১৬) পীং-যোগাজ্যা চাকমা ও (৭) বৈদ্য চাকমা (১৭) পীং-সোতান্যা চাকমা

খাগড়াছড়িতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণের পর এক নিরীহ জুম্মকে হত্যা

গত ২৮ জুলাই ২০১৪ খাগড়াছড়ি সদরের খাগড়াপুর গ্রামের বাসিন্দা ভাড়ায় যাত্রী বহনকারী মোটরসাইকেল চালক চন্দন ত্রিপুরা (৩০) পীং-পুজা কুমার ত্রিপুরা নামের এক যুবক সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন।

জানা যায়, ঐদিন বিকাল ৫:৩০টায় দীঘিনালা বাজার থেকে সংস্কারপন্থীর দু'জন সন্ত্রাসী যাত্রী বেশে মহালছড়ি আসার জন্য চন্দন ত্রিপুরার মোটরসাইকেলটি ভাড়া করে। পরে রাত ১২টার দিকে চন্দন ত্রিপুরার বড় ভাই রঞ্জিত ত্রিপুরাকে মুঠোফোনে কল করে (০১৮২৮৮৫৩৩) সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণ দেয়া না হলে হত্যা করার হুমকি দেয়। এ সময়ে সন্ত্রাসীরা দুটি বিকাশ নম্বর দিয়ে (০১৯২৫৮১০৯২৩, ০১৮৫১৪৪৪৭৬৯) টাকা পাঠাতে বলে।

এদিকে, স্বজনরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর কান্তি মারমা (৩০) নামক এক মোটরসাইকেল চালকের তথ্যের ভিত্তিতে নান্যাচর উপজেলার মেজর টিলা নামক এলাকার জঙ্গলে গত ৩ আগস্ট ২০১৪ বিকাল তিনটায় মোটরসাইকেল চালক চন্দন ত্রিপুরার অর্ধ গলিত লাশ পাওয়া যায়। পরে পুলিশকে বিষয়টি জানালে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে রাঙ্গামাটি সদর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরদিন ৪ আগস্ট ২০১৪ সকাল সাড়ে দশটায় ময়নাতদন্তের পর লাশ পরিবারের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি প্রদানে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের বাধা
বাঘাইছড়ি ও কাউখালী উপজেলায় প্রশাসনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ১৪৪ ধারা জারি

গত ৪ আগস্ট ২০১৪ সকালে রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি ও কাউখালী উপজেলা সদর এলাকায় সর্বস্তরের জনগণ কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকলে কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিতকরণের দাবিতে পূর্বনিধারিত কর্মসূচি বানচাল করার লক্ষ্যে একই সময় ও স্থানে পার্বত্য চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীরাও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কর্মসূচির ডাক দেয়। পরে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে পূর্বনিধারিত এ কর্মসূচিতে বাধা প্রদান করে।

ঐদিন সকাল ১০টায় বাঘাইছড়ি উপজেলা মাঠে রাঙামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রতিবাদে পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কিন্তু এই কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য সংস্কারপন্থীরা হঠাৎ করে একই সময়ে সেখানে সমাবেশের ডাক দেয়। প্রশাসনও পূর্বনির্ধারিত এ কর্মসূচিকে সহযোগিতা না করে অযৌক্তিকভাবে বাধা দেয়। প্রশাসন ঐ স্থানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ৪ আগস্ট সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করে। অপরদিকে একইভাবে পূর্বনিধারিত শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য প্রশাসনের যোগসাজসে কাউখালী উপজেলায়ও পার্বত্য চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা হঠাৎ করে সমাবেশের ডাক দেয়। পরে প্রশাসন সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে।

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় ইউপিডিএফ কর্তৃক আরও এক গ্রামবাসী খুন

গত ৫ আগস্ট ২০১৪ রাতে মিলন চাকমা ও ডা: প্রীতি চাকমার নেতৃত্বে একদল ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার নাড়াইছড়ি গ্রামের অজিত তালুকদার (৩৫) পিতা- ধীরেন্দ্র লাল তালুকদার এর বাড়ি ঘেড়াও করে এবং নিজ বাড়ি থেকে অজিত তালুকদারকে ধরে নিয়ে যায়। নেওয়ার সময় আধপথে অজিত তালুকদারকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে জানা যায়।

আরও জানা গেছে, ৬ ও ৭ আগস্ট ২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যরাত থেকে সেই গ্রামের আরও দুইজন নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানা গেছে। তারা হলেন- ১) ধীরেন্দ্র লাল তালুকদার পিতা-মনোরথ তালুকদার, হেডম্যান, ৪৪ নং বামে ধনপাতা মৌজা। ২) সুদর্শন চাকমা (৪৫) পিতা- বসন্ত চাকমা। তারা বর্তমানে কোথায় আছেন কিংবা তাদেরকেও অজিত তালুকদারের মতো করে অপহরণ করা হয়েছে কিনা তা জানা যাচ্ছে না।

দীঘিনালার নাড়াইছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ১৩ টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

গত ১০ আগস্ট ২০১৪ ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নস্থ ধনপাতা মৌজার দেবানপাড়া নামে এক জুম্ম গ্রামের মোট ১৩ টি জুম্ম পরিবারের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ধনপাতা গ্রামের পূর্ব দিকে ব্যারাক তুলে আলাদা আলাদা করে দুই গ্রুপে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছে। সেখান থেকে মিলন চাকমা, অর্জুন, প্রীতি ও পাগলা মিলনের নেতৃত্বে আননুমানিক ৪০/৫০ জনের একদল সশস্ত্র ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী নাড়াইছড়ি বাজারের এক কিলোমিটার উপরে গিয়ে তাদের পুরানো ব্যারাকে আরও ব্যারাক তুলতে যায় বলে জানা যায়। কিন্তু এতে এলাকাবাসীরা নানা আশঙ্কায় সামান্য অসম্মতি জানায়। এরপরই বিকাল ৪.০০টার সময় ফিরে আসার মুহূর্তে দেবানপাড়ার মোট ১৩ টি বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে জানা গেছে। পুড়ে যাওয়া বাড়ির মালিকদের নাম হল-(১) পূর্ণজয় চাকমা, (২) মন্টু চাকমা, (৩) ডাঙ্গা চাকমা, (৪) দেবাশীষ চাকমা, (৫) শান্তি বিকাশ চাকমা, (৬) যুদ্ধজয় চাকমা, (৭) অমর কান্তি চাকমা, (৮) অমর চান চাকমা, পীং-বাঙাল্যা চাকমা, (৯) চিজিকালা চাকমা, (১০) রবিজয় চাকমা, (১১) বাঙাল্যা চাকমা, (১২) গয়েস সুর চাকমা ও (১৩) বিজক্ব চাকমা।

মহালছড়ির সিন্দুকছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক হামলা ও অপহরণ

গত ২৪ আগস্ট ২০১৪ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় রতন বসুর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের ইউপিডিএফ এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি থানার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নস্থ তৈকর্মা পাড়ায় হঠাৎ করে এক হামলা চালায়। হামলায় গ্রামের প্রেমমালা ত্রিপুরা (৩৫) স্বামী-জাম্ফু মারমা নামের এক মহিলাকে অমানুষিকভাবে মারধর করে আহত করে এবং গ্রামের অপর দুই ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। যাবার সময় প্রেমমালা ত্রিপুরাকে চিকিৎসার জন্য কোন সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। অপহৃত দুই ব্যক্তি হল-(১) প্রভাত ত্রিপুরা (৩৬) পিতা- বিমুক্ষা ত্রিপুরা, (২) তিলু ত্রিপুরা (২৬) পিতা-ঐ। জানা গেছে, অপহরণকারীরা পরে মুক্তিপণ আদায় করেই অপহৃতদের ছেড়ে দেয়।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক কার্বারীকে অপহরণের পর খুন

গত ২৭ আগস্ট ২০১৪ রাত প্রায় ৮:৩০ টায় ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নানিয়ারচর উপজেলাধীন ৩নং বুরিঘাট ইউনিয়নের নানাক্রুম গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে বিকাশ কার্বারী (৪৫) পীং-মৃত শিশু কুমার কার্বারী অপহরণের শিকার হন। জানা গেছে, বিকাশ কার্বারী ঐ সময় নিজের বাড়িতে টিভি দেখছিল। তখন ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি গ্রুপ সেখানে এসে বাড়িতে ঢুকে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বিকাশ চাকমা হত্যা করে।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ষাটোর্ধ এক চুক্তির সমর্থককে গুলি করে হত্যা

গত ৩০ আগস্ট ২০১৪ রাত আনুমানিক ১১:০০ টায় ইউপিডিএফ এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলাধীন ৪নং ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের রামহরি পাড়া গ্রামের বাসিন্দা চুক্তির সমর্থক শান্তি কুমার চাকমা (৬৫) পীং-তরী চন্দ্র চাকমা নামের এক ব্যক্তিকে নিজ বাড়ি থেকে কিছু দূরে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। হত্যার শিকার শান্তি কুমার চাকমা ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য।

দীঘিনালার বাবুছড়া ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ১৭ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বেলা আনুমানিক ২:৩০ টায় ইউপিডিএফ এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হঠাৎ হানা দিয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নে মধ্যমোন আদাম এলাকার অন্তত ১৭টি জুম্ম ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। ক্ষতিগ্রস্ত

পরিবার প্রধানের নাম যথাক্রমে- (১) বীর লক্ষণ চাকমা, পীং-গোলকধন চাকমা, (২) কালাচোগা চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, (৩) চিটিং বিকাশ চাকমা, পীং-আজিম চাকমা, (৪) অরুণ বিকাশ চাকমা, পীং-লুচ্চ মোহন চাকমা, (৫) শান্তি বিকাশ চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, (৬) স্নেহ রঞ্জন চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, (৭) বিপুলেশ্বর চাকমা, পীং-জাপানি মোহন চাকমা, (৮) শান্তিমনি চাকমা, পীং-সাধন কুমার চাকমা, (৯) স্মৃতি বিকাশ চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, (১০) শান্তিময় চাকমা, পীং-মঙ্গল চন্দ্র চাকমা, (১১) মিসেস মিলেস' চাকমা, স্বামী-মৃত প্রিয় রঞ্জন চাকমা, (১২) ধলেয়া চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, (১৩) দীনেশ কান্তি চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, (১৪) মেরেয়্যা চাকমা, পীং-অজ্ঞাত, (১৫) ওক্রমনি চাকমা, পীং-মেরেয়্যা চাকমা, (১৬) আমিচ্চো চাকমা, পীং-মেরেয়্যা চাকমা, (১৭) নিকুস্যা চাকমা, পীং-মেরেয়্যা চাকমা। অপরদিকে অগ্নিসংযোগে নেতৃত্বদানকারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা হল-মিলন চাকমা, তরুণ চাকমা (জলিয়া), অর্জন চাকমা ও পাগলা মিলন।

ইউপিডিএফ কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ে গ্রেনেড হামলা

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ভোর রাত আনুমানিক ৩:২৫ টায় রাঙ্গামাটি সদরস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর কার্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ এর ভাড়াটে এক সন্ত্রাসী গ্রেনেড হামলা চালায়। বিস্ফোরিত গ্রেনেডের আঘাতে আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে রাখা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের একটি গাড়ির গ্লাসগুলো ভেঙে যায় এবং একটি চাকা ফুটো হয়। এছাড়া আরও তিনটি গাড়ি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ের দেয়ালে একাধিক আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, সুশীল চাকমা (২৩) পীং-বাসুলাল চাকমা, গ্রাম-মাইসছড়ি, ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন, নানিয়ারচর উপজেলা নামের ইউপিডিএফ এর এক সন্ত্রাসী সদস্য আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ের উত্তরদিকের দেয়াল ঘেঁষে গ্রেনেডটি নিক্ষেপ করে। অবস্থা বেগতিক দুপুরের দিকে হামলাকারী সুশীল চাকমা নিজেই হামলার কথা স্বীকার করে পুলিশের কাছে ধরা দেয়। জানা গেছে, ইউপিডিএফ এর নীল নকশা অনুযায়ী এই সুশীল চাকমা রাঙ্গামাটিতে গ্রেনেড হামলার দায়িত্ব নেয়। গ্রেনেড বিস্ফোরণ সম্পন্ন হলে তাকে ইউপিডিএফ এর কর্তৃপক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেবে বলে চুক্তি হয়-এজন্য সে অগ্রিম ৫ হাজার টাকাও গ্রহণ করেছিল। হামলায় তাকে সহযোগিতার জন্য পাহাড়ি-বাঙালি আরও ৩ জন লোক নিয়োজিত ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর হামলাকারী সুশীল চাকমা সকালের দিকে শহরের রিজার্ভ বাজারস্থ পাহাড়িকা হোটেলে উঠে। সেখানেই তাকে ইউপিডিএফ কর্তৃক প্রতিশ্রুত টাকা প্রদান করার কথা। কিন্তু বিস্ফোরণের ফলাফলে অসন্তুষ্ট ইউপিডিএফ কর্তৃপক্ষ সেই টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সুশীল চাকমার সাথে তাদের বাকবিতন্ডা হয় ও মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এতে সুশীল চাকমা বিষয়টি পুলিশকে জানাবে বলে হুমকী দিলে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ইউপিডিএফরা সুশীলকে তাৎক্ষণিকভাবে খুন করার হুমকি দেয়। এজন্য আতঙ্কিত সুশীল চাকমা পাহাড়িকা হোটেলের কক্ষে নিজেকে আবদ্ধ রেখে আত্মীয়দের মাধ্যমে দুপুরের দিকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

দীঘিনালায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ১৭ জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

১৯ অক্টোবর ২০১৪ দুপুর ১২.৩০ টার দিকে মিলন চাকমা, বিপ্লব চাকমা ও অর্জুন চাকমার নেতৃত্বে আনুমানিক ৩০/৩৫ জনের একদল ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের চোদ্দেংছড়া মৌজার দোজরপাড়া নামক একটি চাকমা গ্রামে হানা দিয়ে ১৭ জুম্ম গ্রামবাসীর ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযো'গ করে সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছে। এতে বাড়ির সম্পূর্ণ জিনিষপত্রাদি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই গ্রামবাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদের খাওয়া-দাওয়াসহ বিভিন্ন সহযোগিতা দিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ তুলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এরূপ মানবতাবর্জিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। এ ঘটনায় যাদের ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে তারা হল-(১) পদ্ম লাল চাকমা (৩৫) পিতা- দেবেন্দ্র চাকমা, (২) দেবেন্দ্র চাকমা (৭৫) পিতা- মৃত আন্ডারা চাকমা, (৩) মিলন চাকমা (৩৭) পিতা- দয়াল চন্দ্র চাকমা, (৪) বাবুগুল চাকমা (৩৫) পিতা- তক্র কাবারী, (৫) তক্র কাবারী (৬৫) পিতা- মৃত সুরেন্দ্র চাকমা, (৬) ফরাকাজী চাকমা (৩০) পিতা- তক্র কাবারী, (৭) রাঙা রঞ্জন চাকমা (২৮) পিতা- মৃত ফুলরাজ চাকমা, (৮) শান্তি ভূষণ চাকমা (৬০) পিতা- মৃত বিনন্দ চাকমা, (৯) কৃপাধন চাকমা (৬০) পিতা- মৃত বাঙালা্যা চাকমা, (১০) কৃপামুখী চাকমা (৪৫) পিতা- মৃত বাঙালা্যা চাকমা, (১১) তুগুল চাকমা (২৬) পিতা- মিশ্রি কুমার চাকমা, (১২) প্রেমলাল চাকমা (২৬) পিতা- তেজেন্দ্র চাকমা, (১৩) মিশ্রি কুমার চাকমা (৭০) পিতা- মৃত রজনী চাকমা, (১৪) রেবতী কুমার চাকমা (৬৫) পিতা- মৃত রজনী চাকমা, (১৫) মেদেরা চাকমা (৩৮) পিতা- মিশ্রি কুমার চাকমা, (১৬) প্রতিন বিকাশ চাকমা (৩৬) পিতা- শান্তি ভূষণ চাকমা ও (১৭) বিজয় চাকমা (২৬) পিতা- অজ্ঞাত।

লংগদুতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ১ গ্রামবাসীকে অপহরণের পর হত্যা

গত ১৯ অক্টোবর ২০১৪ রাত আনুমানিক ৯:০০টায় ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার ৭নং লংগদু ইউনিয়নের কাত্তলী বড়াদম গ্রামের বাসিন্দা মিলন চাকমা ওরফে বাঘি (২৮) পীং-মৃত রাত্তোমনি চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় অপহরণকারীরা ২/৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে বলে জানা যায়। অপহৃতের পরিবার অপহরণকারীদের মধ্যে কালোমনি চাকমা (৩৭) পীং-আনন্দ চাকমা, সাং-সোনাই, মাইনীমুখ ইউনিয়ন ও সুমন চাকমা (৩০) পীং-গৌরব মনি চাকমা, গ্রাম-বড়াদম কাত্তলীকে চিনতে পারে বলে জানা যায়।

জানা যায়, অপহরণের পরদিন অপহৃত মিলন চাকমার আত্মীয়-স্বজনরা তাকে খোঁজ করার জন্য স্থানীয় ইউপিডিএফের চিহ্নিত চাঁদা সংগ্রহকারী কালোমনি চাকমা (৩৭) পীং-আনন্দ চাকমা, সাং-সোনাই, মাইনীমুখ ইউনিয়ন, লংগদু এর কাছে গেলে সে কিছু জানে না বলে জানায় এবং তাদের আঞ্চলিক পরিচালক প্রদীপময় চাকমা ওরফে বিশাল/পাগানা হুলা পীং-মৃত মানিক্যা চাকমা, সাং-বেঙিছড়া, লংগদু এর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়। এরপর তাৎক্ষণিকভাবে প্রদীপময় চাকমার সাথে যোগাযোগ করা হলে এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না বলে জানায়। এরপর জনগণ এ বিষয়ে চাপাচাপি করলে গত ২৫ অক্টোবর ২০১৪ প্রদীপময় চাকমা হঠাৎ করে ফোন করে এলাকার এক মুরুব্বীকে পরামর্শ দেয় যে, অপহৃত মিলন চাকমার আত্মীয়-স্বজনরা যাতে মিলন চাকমার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে দেয়। এতে অপহৃতের পরিবার নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, অপহৃত মিলন চাকমাকে হত্যা করে লাশ গুম করা হয়েছে।

লংগদুতে তিনবার জনসংহতি সমিতির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা

এ পর্যন্ত পরপর তিনবার রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন লংগদু উপজেলা সদরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির থানা শাখা কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। সর্বশেষ পরপর দুই দিন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার গত ২১ অক্টোবর ২০১৪ রাত আনুমানিক ১০:৪৫টায় কে বা কারা ভেতরের ছাদে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে এবং পরদিন ২২ অক্টোবর ২০১৪ রাত প্রায় ৯:১৫টার সময় তৃতীয়বার আবার কার্যালয়ের পূর্বপাশে একটি জানালা ও বাতির উপর কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়। উক্ত দ্বিতীয়বার পার্শ্ববর্তী মন্দির টিলা থেকে কার্যালয়ে আগুন জ্বলতে দেখে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ফোনে জানালে তাৎক্ষণিকভাবে চারদিক থেকে লোক এসে বড় কোন ক্ষতি ছাড়াই আগুন নেভাতে সক্ষম হয়। তবে এসময় আগুনে বিদ্যুৎ লাইনের তার, টিনের ডাসা-বাতি, ২টি ঢেউটিন ও মাচাং-এর কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে তৃতীয়বার কার্যালয়ের একটি অংশে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টার সময় টহলরত পুলিশের গাড়ি দেখে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য, এর পূর্বেও গত ৪ অক্টোবর ২০১৪ রাত আনুমানিক ১১:৩৫টায় আরেকবার কে বা কারা একইভাবে সমিতির এই কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করে এবং পাড়ার লোকজন দুর্গাপূজা দেখে বাড়ি ফেরার পথে আগুন জ্বলতে দেখলে জানাজানি হলে তা নেভানো হয়। এলাকাবাসীর ধারণা, ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থীদের ভাড়াতে সন্ত্রাসীরাই এই কাজ করেছে।

বাঘাইছড়িতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীর গুলিতে চুক্তি সমর্থক এক গ্রামবাসী খুন

গত ২৬ অক্টোবর ২০১৪ সকাল আনুমানিক ৭:৪৫টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরের মধ্য বাঘাইছড়ি এলাকায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীর গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় সুশীল বিকাশ চাকমা (৩৮) পীং-সুধীর কুমার চাকমা নামে চুক্তির সমর্থক এক নিরীহ গ্রামবাসী। জানা যায়, উক্ত গ্রামবাসীকে হত্যার পরপরই সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা কয়েকটি মোটর সাইকেল যোগে উত্তর দিকে সড়ক ধরে পালিয়ে যায়।

জানা গেছে, ঐ সময় সুশীল বিকাশ চাকমা তার গ্রামের পথ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পাশ থেকে ওতপেতে থাকা সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা তার দিকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এতে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

জানা গেছে, হামলাকারীরা সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিল। হামলাকারী ৬ জনের মধ্যে ৩ জনের পরিচয় হল–যুদ্ধ চাকমা, বসু চাকমা ও স্বতসিদ্ধ চাকমা, সর্বসাং-বাঘাইছড়ি এলাকা এবং তাদের মধ্যে ২ জন বাঙালি।

সাংগঠনিক সংবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

রাজস্থলীতে মংক্য মারমাকে হত্যার ঘটনায় পিসিপি সদস্যকে গ্রেফতার করায় জনসংহতি সমিতির প্রতিবাদ

রাজস্থলীতে মংক্য মারমাকে হত্যার ঘটনায় পিসিপি সদস্য অংসিংনু মারমাকে গ্রেফতার করায় জনসংহতি সমিতি প্রতিবাদ এবং তাকে অচিরেই নি:শর্তে মুক্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছে।

গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রাত আনুমানিক ৮:০০ ঘটিকা সময় রাঙামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মংক্য মারমাকে (৫০) গুলি করে হত্যার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করে দৈনিক কালের কণ্ঠ ও দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। উক্ত দু'টি পত্রিকায় একই ভাষায় উল্লেখ করা হয় যে, "নিহত ব্যক্তির পরিবার ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতারা এ ঘটনার জন্য সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে দায়ী করেছেন"।

উক্ত হত্যাকান্ডের সাথে জনসংহতি সমিতির জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন, কল্পনা-প্রসূত, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এই মিথ্যা অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, জনসংহতি সমিতির কোন বক্তব্য না নিয়ে উক্ত দু'টি পত্রিকায় একতরফাভাবে নিহত ব্যক্তির পরিবার ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের অভিযোগ প্রচার করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবার ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতারা আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে ফায়দা লুঠার জন্য এবং জনসংহতি সমিতির ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও বানোয়াট অভিযোগ তুলছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ জনসংহতি সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো অভিযোগ করা হয় যে, গতকাল রাত আনুমানিক ১০:৩০ ঘটিকা সময় উক্ত হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ কর্তৃক রাজস্থলীর কাকড়াছড়ি গ্রাম থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সদস্য অংসিংনু মারমা (২৪) পীং মংরে মারমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বেদম মারধর করা হয়।

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে পরিষদের আইন সংশোধনের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জনসংহতি সমিতির স্মারকলিপি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৯৮ সংশোধিত) অনুসারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রতিবাদে গত ২৫ মার্চ ২০১৪ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর এযাবৎ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এলক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়নেরও কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যে দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় সেই ক্ষমতাসীন দল তাদের দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অন্তর্বর্তী জেলা পরিষদসমূহ অগণতান্ত্রিকভাবে বছরের পর বছর ধরে পরিচালিত করে আসছে। বস্তুত: ৫-সদস্য বিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন পরিষদসমূহের জনগণের কাছে কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। ফলে এসব পরিষদ বর্তমানে দলীয় লোকদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ না নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য জেলা পরিষদে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদনা সহজীকরণের নামে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা ৫ সদস্য থেকে ১১ সদস্যে বৃদ্ধিকল্পে গত ১০ মার্চ ২০১৪ মন্ত্রীসভায় 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য

জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪', 'খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪' এবং 'বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪' নামে তিনটি খসড়া বিল অনুমোদন করা হয়েছে।

বস্তুত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনকে অব্যাহতভাবে পাশ কাটানো এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সুকৌশলে বাধাগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। শক্তিশালী পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন, পরিষদে সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি জনমুখী, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত পার্বত্য জেলা পরিষদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন বিকল্প নেই। মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার যতই বাড়ানো হোক না কেন তাতে করে কখনোই শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক পার্বত্য জেলা পরিষদ গড়ে উঠতে পারে না বা সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হতে পারে না। অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার বাড়ানো হলে সুবিধাবাদী ও কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কিছুই সাধিত হবে না। পক্ষান্তরে এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আরেক নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে এবং পার্বত্যবাসীদের প্রতি বঞ্চনা ও অবহেলা অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

প্রসঙ্গত ইহাও উল্লেখ্য যে, গত ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার নির্বাচনী ইসতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করলেও সরকার এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদের (২০০৯-২০১৩) শেষ পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল ৯ম জাতীয় সংসদে উত্থাপন করলেও অবশেষে তা সংসদীয় কমিটিতে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। অপরদিকে গত ১-৩ জুলাই ২০১২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার ও প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর অনুষ্ঠিত এক সভার মাধ্যমে অহস্তান্তরিত বিষয়সমূহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের উদ্যোগ নিলেও তাও অকার্যকর অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে। ঝুলিয়ে রাখা উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ না নিয়ে সরকার উল্টো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থীভাবে ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন লঙ্ঘন করে অন্তর্বর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার বাড়ানোর অগণতান্ত্রিক ও চুক্তি বিরোধী উদ্যোগ নিয়েছে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কালক্ষেপণ ও অসদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

এছাড়া জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমার স্বাক্ষরিত সমিতির স্মারকলিপিতে (১) অন্তর্বর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার চেয়ারম্যানসহ ৫ (পাঁচ) সদস্য থেকে ১১ (এগার) সদস্যে বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ বাতিল করা; (২) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা এবং এলক্ষ্যে- (ক) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা প্রণয়ন করা ও (খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে প্রণীত পার্বত্য জেলা ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন করা; এবং (৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করার দাবি জানায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত করার দাবিতে জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে মিছিল, সমাবেশ ও স্মারকলিপি পেশ

গত ৮ মে ২০১৪ সকাল ১১:০০ টায় রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিসহ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত করার দাবিতে' মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি শ্রী গুণেন্দু বিকাশ চাকমার সভাপতিত্বে রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের দক্ষিণ ফটকে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্রী সজীব চাকমা, সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি শ্রী উদয়ন ত্রিপুরা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রী ত্রিজিনাদ চাকমা। স্মারকলিপি পাঠ করে শোনান মহিলা সমিতির নেত্রী জোনাকি চাকমা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নীতিগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান অস্থিতিশীল সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সর্বোপরি জুম্ম জনগণের অধিকার ও অস্তিত্ব অনিশ্চিত রেখে সরকারের উদ্যোগে এখনই মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত বলে মনে করে না।

সমাবেশের শেষ পর্যায়ে জনসংহতি সমিতির একদল প্রতিনিধি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বরাবরে লিখিত স্মারকলিপিটি ডেপুটি কমিশনার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নিকট পেশ করেন। জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে উল্লেখিত দাবিসমূহ হল- (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখা; (২) রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটিতে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করা; (৩) স্বাস্থ্য বিভাগের প্রশাসন ও পরিচালনা উন্নয়নসহ পার্বত্য জেলা ও উপজেলার হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও নার্স নিয়োগসহ চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ, ডাক্তারদের আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (৪) পার্বত্য অঞ্চলে একটি প্যারা-মেডিকেল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা এবং (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা এবং সরকারের চুক্তি পরিপন্থী ও জনবিরোধী আইন প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণের উপর ঢাকায় জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন

পার্বত্য চট্টগ্রম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা এবং সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও জনবিরোধী আইন প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণের পরিপ্রেতিতে গত ১৪ জুলাই ২০১৪ ঢাকাস্থ হোটেল সুন্দরবন-এ এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট কলামিষ্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত ও ঝুলিয়ে রাখা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ না নিয়ে সরকার উল্টো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন লঙ্ঘন করে একতরফাভাবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন প্রণয়ন এবং রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বলে শ্রী লারমা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও পার্বত্যবাসীর আশা-আকাড়ক্ষার বিপরীতে এই অগণতান্ত্রিক ও জনবিরোধী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হলে তার জন্য যে কোন অনাকাড়িক্ষত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে।

আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যদের উপর হামলার প্রতিবাদ জনসংহতি সমিতির

সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যদের উপর ন্যাক্কারজনক হামলায় তীব্র প্রতিবাদ এবং হামলাকারীদের অচিরেই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানায় জনসংহতি সমিতি।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের সম্মানিত সদস্যদের উপর গত ৫ জুলাই ২০১৪ দুপুরের দিকে রাঙ্গামাটিতে সেটেলার বাঙালিদের উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নৃশংসভাবে হামলা করা হয়। কমিশনের কো-চেয়ার এবং তত্ত্বাবধায়ক

সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের নেতৃত্বে সফররত কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ড. ইফতেখারুজ্জামান ও কমিশনের সফরসঙ্গী ইলিরা দেওয়ান আহত হন। উক্ত হামলায় সেটেলার বাঙালিরা কমিশনের সদস্যদের বহনকারী গাড়ী ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করে। হামলায় কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও (ওসি) আহত হন বলে জানা গেছে।

গত ৬ জুলাই ২০১৪ জনসংহতি সমিতির তথ্য প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন চায় না এবং যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জিইয়ে রেখে নিজেদের হীনস্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে তারাই এ হামলা চালিয়েছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদাদের বিবৃতি

রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যদের উপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, হামলার নিন্দা ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি

গত ৫ জুলাই ২০১৪ রাঙ্গামাটিতে সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যদের উপর হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, নিন্দা ও সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, ২৯৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য আসনের সংসদ সদস্য ও আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সদস্য উষাতন তালুকদার। গত ৬ জুলাই ২০১৪ এক সংবাদ বিবৃতির মাধ্যমে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার নিন্দা ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার এ দাবি জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী মহল দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতিকে নাজুক করা এবং চলমান শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যদের উপর হামলা সেই ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। তিনি অনতিবিলম্বে এই উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারকে আহ্বান জানান এবং হামলাকারীদের আইনের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করার জোর দাবি জানান।

বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সফরকারী দলের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে আরো অধিকতর সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন ছিল। উল্লেখ্য, হামলাকারীরা কথিত সমঅধিকার আন্দোলনের সদস্য বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন থেকে অভিযোগ করা হয়।

আদিবাসী নারী নেত্রীকে ধর্ষককারী ও ঢুডু সরেনের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে ঢাকায় জনসংহতি সমিতি ও ঐক্যন্যাপের মানববন্ধন

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঢাকার শাহবাগস্থ জাতীয় জাদুঘরের সামনে আদিবাসী নারী নেত্রী বিচিত্রা তির্কিকে হামলা ও যৌন হয়রানি এবং আদিবাসী ঢুডু সরেন হত্যাকারীদের শাস্তির দাবীতে ঐক্য ন্যাপ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক দীপায়ন খীসার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মানব বন্ধনে সভাপতিত্ব করেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি প্রবীণ রাজনীতিবিদ পংকজ ভট্টাচার্য। সংহতি বক্তব্য রাখেন ঐক্য ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ তারেক, সাংবাদিক ও লেখক আবু সাঈদ খান, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি নূর মোহাম্মদ তালুকদার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজীব মীর, মানবাধিকারকর্মী রাখী ম্রং প্রমুখ।

ঐক্য ন্যাপের সভাপতি জননেতা পংকজ ভট্টাচার্য সমাপনী বক্তব্যে বলেন, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে ধর্ষণের ঘটনাই প্রমাণ করে নিপীড়ক হিসেবে রাষ্ট্রের ভূমিকা কোন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। কেবল ঢুডু সরেন কিংবা বিচিত্র তির্কি-ই নয়, ভূমি দখলকে কেন্দ্র করে কথায় কথায় আজ আদিবাসীদের খুন করা হচ্ছে। তিনি বিচিত্রা তির্কি-র ধর্ষণ ঘটনায় জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করার দাবী জানান

সংহতি বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যারযের শিক্ষক রাজীব মীর বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্বই হচ্ছে নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সেখানে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ঠিক উল্টো, যেখানে রাষ্ট্র নিজেই নিপীড়ক হয়ে আদিবাসীদের অধিকার হরণ করছে। এভাবে দেশ চলতে পারে না। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, রাষ্ট্র এখনো আদিবাসীবান্ধব হয়ে উঠতে পারে নি। তিনি প্রশ্ন রাখেন, রাষ্ট্র কবে আদিবাসীবান্ধব হয়ে উঠবে?? আবু সাঈদ খান বলেন, কখনো ধর্মের দোহাই দিয়ে, কখনো জাতীয়তার দোহাই দিয়ে প্রতিনিয়ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের উপর নিপীড়ন অব্যাহত রয়েছে। তাই দেশপ্রেমিক এবং সত্যিকার গণতন্ত্রকামী জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। রানা দাশগুপ্ত বলেন, ভূমি দখলের উদ্দেশ্যেই সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের উপর নিপীড়ন চালানো হয়ে থাকে। সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের বিষয়গুলো বিশেষ আইন দ্বারা বিচার করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ

রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম স্থগিত করার দাবিতে ঢাকায় মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ৩ জুন ২০১৪ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গমাটি মেডিকেল কলেজ এবং রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত করার দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর যৌথভাবে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সদস্য শুভকর চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহনগর শাখার সভাপতি জুয়েল চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক কেরিংটন চাকমা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অনন্ত ধামাই, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিলের পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক সুমন মারমা এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে নিশা চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের জনসাধারণের, বিশেষ করে জুম্ম জনগণের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সরকার একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য জুম্ম গ্রামে এখনও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় নেই, শত শত প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষক নেই এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষার পরিবেশ নেই। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও মানসম্মত শিক্ষক, অবকাঠামোগত সুবিধা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণাদির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ হতে এমবিবিএস কোর্সে ১ম বর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার প্রশাসনিক অনুমতি প্রদানকে নিন্দা জানান।

একই দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ নীতিগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে নয়, উচ্চ শিক্ষার বিরোধী নয়। আমরা নিশ্চয়ই চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামেও শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতি বিধান হোক, অত্রাঞ্চলের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত করা হোক। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌলিক সমস্যা ও বাস্তবতাকে অবহেলা করে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বা পদক্ষেপ গ্রহণ বাস্তবসম্মত হতে পারে না।"

সমাবেশে সরকারের নিকট নিম্নোক্ত দাবি উত্থাপন করা হয়- ১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যতীত

রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। ২. রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটিতে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। ৩. পার্বত্য জেলা ও উপজেলার হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও নার্স নিয়োগসহ চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে।

পিসিপির উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

"আত্মকেন্দ্রিকতা নয়, সকলের একাত্মতায় এগিয়ে চলি প্রগতির পথে, গড়ে তুলি উজ্জ্বল ভবিষ্যত"–এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৬ আগস্ট ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা-২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি চ.বি শাখার সভাপতি শ্রী অনিল মারমার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী কে এস মং মারমা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দীন, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আজগর চৌধুরী, সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রভাষক শ্রী বসুমিত্র চাকমা, বান্দরবান সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীমতি ওয়াইচিং প্রু মারমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রী জ্যোতিষ্মান চাকমা (বুলবুল) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদিক চন্দ্রা ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চ.বি শাখার সহ-সভাপতি শ্রী সুইচিং মং মারমা। নবীনদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জনক তঞ্চঙ্গ্যা আর বিদায়ীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন চিদ্রাসাং মারমা।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামি অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার গভীর ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। জুম্ম ছাত্র সমাজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং তার মোকাবেলার জন্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্র সমাজকে কঠিন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রী কে এস মং মারমা তার বক্তব্যে পিসিপির গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামি অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার গভীর ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। জুম্ম ছাত্র সমাজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং তার মোকাবেলার জন্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্র সমাজকে কঠিন সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দীন বলেন, বর্তমান সরকারের রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে আদিবাসীদের জনসংখ্যার ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং দ্রুত অবৈধ বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটবে। তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের এইসব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে আদিবাসী ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

বিশেষ অতিথি শ্রীমতি ওয়াইচিং প্রু মারমা বলেন, অতীতে যেকোনো আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, হিল উইমেন্স ফেডারেশন গঠনে তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অবদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ অতিথি প্রভাষক বসু মিত্র চাকমা তার বক্তব্যে বর্তমান আদিবাসী জুম্ম ছাত্র সমাজকে আদিবাসীদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রী জ্যোতিষ্মান চাকমা (বুলবুল) তার বক্তব্যে পার্বত্যাঞ্চলের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামোগত সমস্যা ও স্কুল-কলেজে শিক্ষক স্বল্পতাসহ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই শোচনীয় হওয়ায় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে তা আদিবাসী জুম্মদের ভর্তি হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। তাই তিনি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রতিরোধে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদিকা চন্দ্রা ত্রিপুরা তার বক্তব্যে জুম্ম নারী সমাজকে জেগে উঠার আহবান জানান। এছাড়াও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধান, অত্রাঞ্চলে সার্বিক উন্নয়ন, শান্তি এবং নারী সমাজের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা দাবী জানায়, সকল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫%শিক্ষা কোটা চালু করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের পূর্বে রাঙ্গামাটিতে মেডিক্যাল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত করা। পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান, অত্রাঞ্চলে সার্বিক উন্নয়ন, শান্তি এবং নারী সমাজের নিরাপত্তা ও অগ্রগতির স্বার্থে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা।

কাপ্তাইয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নবীনবরণ ও কাউন্সিল সম্পন্ন
জুম্মদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার আহ্বান

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কাপ্তাই থানা শাখার উদ্যোগে কাপ্তাই সুইডিশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কাপ্তাই কলেজ ও রাঙ্গুনিয়া কলেজের নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত নবীনবরণ ও থানা শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কাপ্তাই থানা শাখার সভাপতি এসিং মং মারমা ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী শক্তিপদ ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রী নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কাপ্তাই থানা শাখার সভাপতি শ্রী মংনুচিং মারমা, কাপ্তাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ দিলদার হোসেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, রাইখালী মৌজার হেডম্যান উচিংথোয়াই চৌধুরী বাবলু প্রমূখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতায় পৌছে দিয়ে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয়ার জন্য শাসক গোষ্ঠী প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে মেঠে উঠেছে বলে এবং জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার জন্য সরকার রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের নামে নতুন ষড়যন্ত্রের পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ করেন। তারা এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সজাগ থেকে ছাত্র-জনতাকে জুম্ম স্বার্থবিরোধী সকল ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ভূমিকা পালন করার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আরও বলেন, কোন সমাজকে উন্নতির দিকে অথবা পেছনের দিকে ধাবিত করার, সর্বোপরি পরিবর্তন করার হাতিয়ার হচ্ছে ছাত্র ও যুব সমাজ। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নির্যাতন নিপীড়নের বাস্তবতা, জুম্ম জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিয়ত যে ষড়যন্ত্র সেগুলো প্রতিহত করা তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র ও যুব সমাজকে এম এন লারমার আদর্শে আদর্শিত হয়ে আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে জুম্ম জনগণ যে বাস্তুহারা ও অস্তিত্বের হুমকির দিকে ধাবিত হবে সেটি একমাত্র এম এন লারমা বুঝতে পেরেছিলেন এবং ২০ বছর বয়সে তিনি তার প্রতিবাদ জানানোর জন্য কারাবরণ করেন যেখানে অনেক তথাকথিত মুরব্বি, রাজা, হেডম্যান, কার্বারী থাকা সত্ত্বেও সেই বাস্তব সত্যকে অনুধাবন করতে পারেননি। তাই ছাত্র ও যুব সমাজকে এম এন লারমাকে জানতে হবে, তাঁর আদর্শকে ধারণ করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের হাল ধরতে হবে।

তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক জনবিরোধী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী উদ্যোগ রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত করার দাবী জানান। তিনি আরও বলেন, যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলেজের মান উন্নত নয় সেগুলো আগে উন্নয়নের উদ্যোগ না নিয়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠান কাদের স্বার্থে আসবে তা সহজে অনুমেয়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও তার আলোকে প্রণীত আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উদ্যোগ গ্রহণ

করার কথা থাকলেও সরকার তা না করে একতরফাভাবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যা জনবিরোধী ও চুক্তির লংঘন। প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর সভাপতির বক্তব্যের মধ্যদিয়ে নবীনবরণ ও কাউন্সিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু ও পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের দাবিসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে পিসিপির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি কলেজে জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষা দিবস-২০১৪ উপলক্ষে 'মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু ও আদিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করণসহ অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন কর'–এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রধান ফটকের সামনে রাঙ্গামাটি–চট্টগ্রাম মহাসড়কে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

উক্ত মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্টাফ সদস্য সাবেক ছাত্রনেতা ত্রিজিনাদ চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি চঞ্চনা চাকমা। আরো বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য অন্তিক চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রূপম চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা প্রমুখ। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সভাপতি রিন্টু চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন ছাত্রনেতা সম্রাটসুর চাকমা।

মানববন্ধনে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট নিম্নোক্ত দাবি জানানো হয়– আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে অবিলম্বে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে; উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা সিট বৃদ্ধি করতে হবে; আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলোতে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে; বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনপূর্বক শিক্ষা ক্ষেত্রে আদিবাসী সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থাকে অর্ন্তভুক্তি করত পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী সাহিত্য, সংস্কৃতি, রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তি ও ঐতিহ্যসমূহকে সন্নিবেশিত করতে হবে; পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের সকল কার্যক্রম স্থগিত করতে হবে এবং অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

পিসিপি'র শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)এর গতিশীল ও নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্তরে শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ও কাউন্সিলে নতুন কমিটি গঠন বা পুরানো কমিটি নবায়ন করার পাশাপাশি অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা, চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তিসহ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট জোর আহ্বান জানানো হয়।

রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখাঃ- "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত করুন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১১ জুন ২০১৪ কলেজ কক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার ১৮তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে রিন্টু চাকমাকে সভাপতি, সম্রাটসুর চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নীতিশ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কলেজ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

রাঙ্গামাটি শহর শাখাঃ- গত ১৩ জুন ২০১৪ রাঙ্গামাটি আউটার স্টেডিয়াম, আশিকা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি শহর শাখার ১৬তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোহেল চাকমাকে সভাপতি, পুলক চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুপিয়ন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট শহর কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বিলাইছড়ি থানা শাখাঃ- গত ২৯ জুলাই ২০১৪ বিলাইছড়ি উপজেলা শিল্পকলা মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বিলাইছড়ি থানা শাখার ১৪তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে দীপায়ন দেওয়াকে সভাপতি, আলোময় তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুনীল তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট থানা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখাঃ- গত ২০ জুন ২০১৪ কাপ্তাই উচ্চ বিদ্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখার ২য় বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্লেটো চাকমাকে সভাপতি, রিপেল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও জগৎ জ্যোতি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট সুইডিশ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

লংগদু থানা শাখাঃ- গত ২১ আগস্ট ২০১৪ তারিখে লংগদু উপজেলা মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, লংগদু থানা শাখার ১৮তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিনয় সাধন চাকমাকে সভাপতি, দয়াল কান্তি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রিকেন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট থানা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা মহানগর শাখার কাউন্সিলঃ- গত ২৮ আগস্ট ২০১৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির শহীদ মুনির চৌধুরী মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখার ২২তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেমসন আমলাই বমকে সভাপতি, ক্যারিংটন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুলভ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট মহানগর কমিটি ঘোষণা করা হয়।

লামা থানা শাখা ও মাতামুহুরী ডিগ্রী কলেজ শাখাঃ- গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, লামা থানা শাখার উদ্যোগে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, লামা থানা শাখা ও মাতামুহুরী ডিগ্রী কলেজ শাখার যৌথভাবে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সুইগ্য মং মারমাকে সভাপতি ও উথোইচা মারমাকে সাধারণ সম্পাদক করে লামা থানা শাখা এবং মউজো মারমাকে সভাপতি ও বিচিত্র তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক করে মাতামুহুরী ডিগ্রী কলেজ শাখা কমিটি ঘোষণা করা হয়।

থানচি থানা শাখাঃ- "পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদ এর বিরুদ্ধে পাহাড়ী ছাত্র ও যুব সমাজ ঐক্যবদ্ধ হোন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, থানচি থানা শাখার ৭ম কাউন্সিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে নুসেমং মারমাকে সভাপতি ও সুইনুমং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট থানচি থানা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বাঘমারা থানা শাখাঃ- গত ৪ অক্টোম্বর ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাঘমারা থানা শাখার ১৬ তম কাউন্সিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে যাকোব ত্রিপুরাকে সভাপতি ও গোপাল চন্দ্র চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট বাঘমারা থানা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

রোয়াংছড়ি থানা শাখাঃ- গত ৫ অক্টোম্বর ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রোয়াংছড়ি থানা শাখার ১১তম কাউন্সিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে মংয়ইপ্রু মারমাকে সভাপতি ও উপ্পাঅং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট রোয়াংছড়ি থানা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিলসহ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত করার দাবিতে রাঙ্গামাটিতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৪ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লংঘন করে অবিলম্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া বাতিলসহ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত করার দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে সকাল ১০:৩০টায় জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণ হতে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে বনরূপা ঘুরে এসে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের দক্ষিণ ফটকে এসে সমাপ্ত হয় এবং সেখানে সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি বাচ্চু চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য শ্রী উদয়ন ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতি জোনাকী চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জ্যোতিষমান চাকমা (বুলবুল), পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্রী পাপুল বিকাশ চাকমা প্রমুখ। সমাবেশে সঞ্চালনা করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন না করে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা মানেই সরকারের গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করে বিচ্ছিন্ন এসব উন্নয়ন প্রকল্প কখনো টেকসই হতে পারে না। এছাড়াও উন্নয়নের নামে ভূমিদখল ও স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার নীলনকশা বাস্তবায়নে সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। সরকারের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হলে ছাত্র ও যুব সমাজ বসে থাকবে না এবং এ বিষয়ে যেকোন ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সরকারকে দায়ী থাকতে হবে বলে বক্তারা হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন ।

বক্তারা আরো বলেন, আমরাও উচ্চ শিক্ষা চাই। তবে ভূঁয়া উন্নয়নের নামে এসব উচ্চ শিক্ষা প্রকল্প পার্বত্য জুম্ম জনগণ মেনে নিতে পারবে না। বক্তারা পার্বত্য এলাকার পাহাড়ি-বাঙালি জনগণ যেন উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য দাবি জানান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন

ঢাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে "আদিবাসী নারীর মানবাধিকার : প্রেক্ষিত নারীর উপর বৈষম্য ও সহিংসতা" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

৯ ডিসেম্বর ২০১৩ ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস (১০ ডিসেম্বর) উপলক্ষে "আদিবাসী নারীর মানবাধিকার: প্রেক্ষিত নারীর উপর বৈষম্য ও সহিংসতা" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক রাখী দাস পুরকায়স্থ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য দীপায়ন খীসা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ-সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই প্রমুখ। আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মনিরা ত্রিপুরা এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জেনী বম্।

আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্যে মনিরা ত্রিপুরা বলেন, নারীর অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার। মানুষ হিসেবে এই মানবাধিকারের বদৌলতে আদিবাসী নারীদের সকল প্রকার বৈষম্য ও সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। তার প্রমাণ বিগত প্রায় ১৭ বছরেও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনার যথাযথ কোন বিচার না হওয়া এবং সমগ্র বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত আদিবাসী নারীদের ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা অহরহ ঘটনা।

জেনী বম্ তার প্রবন্ধে আদিবাসী নারীর উপর বৈষম্য ও সহিংসতার বাস্তবতা তুলে ধরে আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি তাদের উপর চলমান সকল প্রকার বৈষম্য ও সহিংসতা অবসানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অবিলম্বে কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার ও ভূমি জবরদখল রোধকল্পে একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবি তুলে ধরেন।

আলোচনায় দীপায়ন খীসা বলেন, "সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমেই নারী মুক্তি সম্ভব।"

রাখী দাস পুরকায়স্থ তার বক্তব্যে আদিবাসী নারীদের জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় প্রান্তিকতার কথা তুলে ধরে আদিবাসী বা দেশের সকল নারীদের প্রতি সরকার যে অঙ্গীকার প্রদান করেছে তা বাস্তবায়নের দাবি তুলে ধরেন।

রোকেয়া কবীর তার বক্তব্যে বাংলাদেশের প্রান্তিক নারীদের বিশেষ করে আদিবাসী নারীদের প্রতি সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ সনদে উল্লেখিত "রাষ্ট্র আদিবাসী নারী ও শিশুরা যাতে সকল প্রকার সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে রক্ষা পায় ও তা নিশ্চয়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে তা নিশ্চিত করার জন্য, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে" ঘোষণাকে দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান।

রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, "বাংলাদেশে নারীরা প্রান্তিক অবস্থায় রয়েছে কিন্তু তার চেয়েও প্রান্তিকে রয়েছে আদিবাসী নারীরা। আদিবাসী নারীরা পাঁচ প্রকারে বৈষম্যের শিকার হয় এক. জাতিগত প্রান্তিকতা, দুই. আঞ্চলিক প্রান্তিকতা, তিন. লিঙ্গীয় প্রান্তিকতা, চার. ধর্মীয় প্রান্তিকতা, পাঁচ. ভাষাগত প্রান্তিকতা। পুরুষতন্ত্র ও মৌলতন্ত্র নারীদের প্রধান শত্রু।"

কমলছড়িতে সবিতা চাকমাকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটিতে মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি জেলার কমলছড়ি ইউনিয়নের চেঙ্গীচর এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সবিতা চাকমাকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মিছিলটি রাঙ্গামাটি শহরের উত্তর কালিন্দীপুরস্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির জেলা কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে বনরূপা পেট্রোল পাম্প এলাকা ঘুরে এসে রাঙ্গামাটি নিউ মার্কেট প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয় এবং এতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ পরিচালনা করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা। সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খাগড়াছড়ির কলমছড়ি চেঙ্গী চর এলাকায় সেটেলার বাঙালিদের লালসার শিকার হয়ে সবিতা চাকমা নামে এক সন্তানের জননীকে নৃশংসভাবে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর দুই দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কাউকে গ্রেপ্তার না করায় বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এভাবে একের পর এক নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হয়ে চললেও দোষী ব্যক্তিদের কাউকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা না করা এবং এভাবে দায়মুক্তির ফলে অপরাধীরা এ ধরনের মানবতা বিরোধী ন্যাক্কারজনক ঘটনা সংঘটনে আরো অধিকতর পরিমাণে উৎসাহিত হচ্ছে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

ঢাকায় একই বিষয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তি না হওয়া, সর্বোপরি সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন না করার ফলে জুম্ম নারীদের উপর এ ধরনের লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছে বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন।

সমাবেশে বক্তারা অচিরেই সবিতা চাকমার ধর্ষণ ও হত্যার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা; সবিতা চাকমার পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর সংশোধন পূর্বক অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধান, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করার দাবি জানান।

অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদ দিবস পালিত

ঢাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুন ২০১৪ রাজধানী ঢাকার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোল টেবিল কক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৮তম প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে 'কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনার যথাযথ বিচার চাই, অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই'-এই দাবিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি চঞ্চনা চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সম্মানিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ড. হামিদা হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং আইন ও সালিস কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি শ্রী উষাতন তালুকদার এমপি, নিজেরা করি'র সমন্বয়কারী খুশী কবীর, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী রোজালিন ডি.কস্তা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার তন্দ্রা চাকমা প্রমুখ। উক্ত আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন মনিরা ত্রিপুরা, সাধারণ সম্পাদক, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর শাখা।

আলোচনায় ড. হামিদা হোসেন বলেন, সরকারের উপর ভরসা না করে বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কল্পনা চাকমা অপহরণের রহস্য উদঘাটন করতে হবে। কল্পনা চাকমা অপহৃত হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল যা আজও অপ্রকাশিত। তিনি তথ্য কমিশনের আইন ব্যবহার করে রিপোর্টটির খোঁজ নেয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল বলেন, দীর্ঘ ১৮ বছর পার হয়ে গেলেও কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের বিচার কোন সরকার করেনি। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর নিরাপত্তা ও মানবাধিকার রক্ষায় শ্রদ্ধাশীল নয়। আর কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের উপযুক্ত বিচার না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। তারা নাগরিক হিসেবে সঠিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি শ্রী উষাতন তালুকদার এমপি বলেন, পত্রিকার তথ্যের বরাত দিয়ে সরকারের একজন সরকারি কর্মকর্তা কল্পনা চাকমার বেঁচে থাকার কথা বলেছেন। যদি কল্পনা চাকমা বেঁচে থাকেন তাহলে তাঁকে উদ্ধার করা সরকারের দায়িত্ব। তিনি সরকারের কাছে সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

আলোচনায় খুশী কবির বলেন, অপহরণের ১৮ বছর পার হলেও এ অপহরণ ঘটনা ক্রমাগত নাটকীয়তার দিকে মোড় নিচ্ছে। তিনি কল্পনা চাকমার অপহরণের প্রতিবাদ কর্মসূচি আরো জোরদারকরণের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়াও মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি জনা গোস্বামী, আইইডির প্রতিনিধি সুবোধ এম বাস্কে, উবিনীগের প্রতিনিধি রোকেয়া বেগম, নারী পক্ষের প্রতিনিধি রওশন আরা, সিএচটি কমিশনের হানা শামস আহমেদ, ডেইলী স্টারের প্রতিনিধি তামান্না ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি ও আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য চৈতালী ত্রিপুরা। মূল প্রবন্ধে মনিরা ত্রিপুরা কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনাটি তুলে ধরেন এবং কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা ও লাল বিহারী চাকমা স্পষ্টতই টর্চের আলোতে অপহরণকারীদের মধ্যে তাদের বাড়ির পার্শ্ববর্তী কজইছড়ি সেনাক্যাম্পের কমান্ডার লেঃ ফেরদৌস (সম্পূর্ণ নাম মোঃ ফেরদৌস কায়ছার খান, বর্তমানে মেজর) এবং তার পাশে দাঁড়ানো ভিডিপি প্লাটুন কমান্ডার মোঃ নূরুল হক ও মোঃ সালেহ আহম্মদকে চিনতে পারেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি তার প্রবন্ধে সরকারের নিকট নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরেন–

● অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনা এবং অপহরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হত্যার শিকার রূপন চাকমা, সুকেশ চাকমা, মনোতোষ চাকমা ও সমর বিজয় চাকমা হত্যাকান্ডের যথাযথ বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

● ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের উপযুক্ত ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

● পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান, অত্রাঞ্চলে সার্বিক উন্নয়ন, শান্তি এবং নারী সমাজের নিরাপত্তা ও অগ্রগতির স্বার্থে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা।

রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

একই দিন সকাল ১০:০০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি জেলা সদরে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের দক্ষিণ ফটকে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এক মানববন্ধন এর আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রীমতি জড়িতা চাকমা এবং বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্রী সজীব চাকমা, ব্লাস্ট, রাঙ্গামাটির জেলা সমন্বয়ক এ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা। সভা সঞ্চালনা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতি সুপ্রভা চাকমা।

আলোচনায় নেতৃবৃন্দ কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের এবং অপহরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক নির্মমভাবে হত্যার শিকার রূপন চাকমা, সুকেশ চাকমা, মনোতোষ চাকমা ও সমর বিজয় চাকমা হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বিগত ১৮ বছরেও কল্পনা চাকমার হদিশ দিতে না পারা এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া রাষ্ট্রের চরম ব্যর্থতা বলে উল্লেখ করেন।

নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজের নিরাপত্তা ও অগ্রগতির স্বার্থে এবং পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান, অত্রাঞ্চলে সার্বিক উন্নয়ন ও শান্তির স্বার্থে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান।

বিলাইছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির থানা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৯ জুলাই ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার বিলাইছড়ি শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের থানা শাখার সাথে যৌথভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০:০০টায় শুরু হওয়া সম্মেলন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের থানা শাখার বিদায়ী সভাপতি দীপায়ন দেওয়ান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, জুরাছড়ির উপজেলা চেয়ারম্যান শুভ মঙ্গল চাকমা, হেডম্যান শান্তি বিজয় চাকমা ও বিলাইছড়ি মহিলা সমিতির নেত্রী অরুণাদেবী চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিলন কুসুম তঞ্চঙ্গ্যা।

সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নকে অবহেলিত রেখে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়িত না করে পার্বত্য চুক্তি ও জনমতের বিপরীতে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ প্রণয়ন করায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করার ক্ষেত্রে ছাত্র ও নারী সমাজের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে শ্রীমতি শ্যামা চাকমাকে আহ্বায়ক ও শ্রীমতি অরুণাদেবী চাকমাকে সদস্য সচিব করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখা ঘোষণা করা হয়।

জুরাছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির থানা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০:০০ঘটিকায় মহিলা সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার বিদায়ী সভাপতি শ্রীমতি আল্পনা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রীমতি জড়িতা চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কিশোর কুমার চাকমা, মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ঝর্ণা চাকমা, জনসংহতি সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার সভাপতি রঞ্জিত দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মায়াচান চাকমা, জুরাছড়ির উপজেলা চেয়ারম্যান উদয়জয় চাকমা, বনযোগীছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তোষ কুমার চাকমা, হেডম্যান করুণাময় চাকমা ও বিনোতা দেওয়ান। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জুরাছড়ি উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীমতি শেফালী দেওয়ান এবং এছাড়া বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের জুরাছড়ি থানা শাখার সভাপতি সুজিত চাকমা ও যুব সমিতির সভাপতি ইমন চাকমা। সভায় উপস্থাপনা করেন জয়া দেওয়ান।

সভায় নেতৃবৃন্দ যার যার অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংগঠন জোরদার করার আহ্বান জানান এবং আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য যুব সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনসহ সকল অঙ্গসংগঠনসমূহকে প্রত্যয়ী ভূমিকা রেখে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য-লক্ষ্য তুলে ধরে প্রয়াত নেতা এম এন লারমার জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে উজ্জীবিত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

অতিথিবৃন্দের বক্তব্য শেষে শ্রীমতি আলপনা চাকমাকে আহ্বায়ক করে মহিলা সমিতির জুরাছড়ি থানা শাখার ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন–শ্রীমতি শেফালী দেওয়ান, শ্রীমতি জয়া দেওয়ান, শ্রীমতি উষারাণী চাকমা, শ্রীমতি স্বপ্না চাকমা, শ্রীমতি ঝিনুকা চাকমা, শ্রীমতি শুভাগী চাকমা, শ্রীমতি ললিতা চাকমা, শ্রীমতি শেফালী চাকমা, শ্রীমতি পুষ্পরাণী চাকমা ও শ্রীমতি সুচরিতা চাকমা। কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ঝর্ণা চাকমা।

চুক্তি লংঘন করে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত করাসহ বিভিন্ন দাবিতে এবং আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে
পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৪ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির উদ্যোগে সরকার কর্তৃক চুক্তি লংঘন করে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের উদ্যোগ স্থগিত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ বাতিল করার দাবিতে এবং আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জনসংহতি সমিতির জেলা কার্যালয়ের প্রাঙ্গণ হতে শুরু হয়ে বনরূপা ঘুরে এসে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের দক্ষিণ ফটকে এসে সমাপ্ত হয় এবং সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

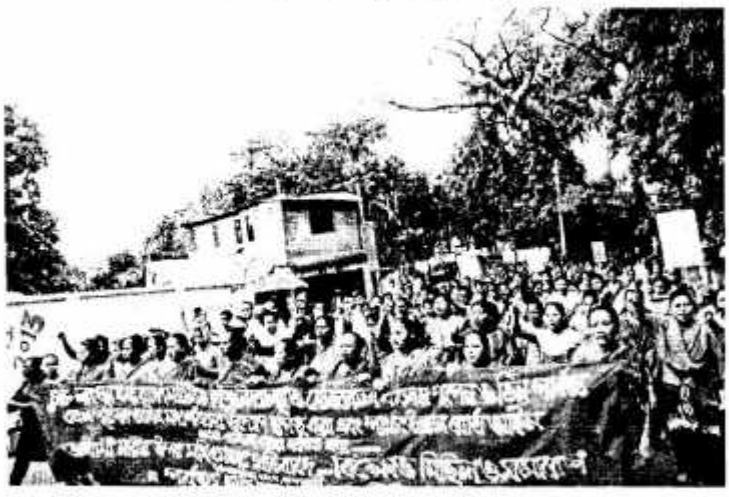

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বান্দরবান সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান ওয়াইচিং প্রু মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তাপস চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশকের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা প্রমুখ। এছাড়া সমাবেশে মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে সূচনা বক্তব্য রাখেন মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা এবং সমাবেশে সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মনি চাকমা ও মহিলা সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ না করে উপরন্তু চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট আইনকে লংঘন করে রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ প্রণয়নসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে অভিযোগ করেন। তারা সরকারের এ ধরনের আচরণ ও কর্মকান্ডকে অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িকতাপ্রসূত, জনবিরোধী ও পার্বত্য চুক্তি পরিপন্থী কাজ বলে উল্লেখ করেন।

এছাড়া একের পর এক সেনা ও বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, ইকোপার্ক ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ও উন্নয়ন এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণার নামে আদিবাসী জুম্মদের জায়গা-জমি অহরহ অধিগ্রহণ বা বেদখল করা হচ্ছে এবং বর্তমান সরকারের আমলেও পাকিস্তানী আমলের নীতি অনুসরণে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন।

অপরদিকে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া এবং সার্বিক অবস্থার মৌলিক কোন অগ্রগতি না হওয়ায় আগের মতই জুম্ম নারীদের অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে চলেছে নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন।

সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে বাংলাদের সরকারের নিকট জরুরি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত দাবি তুলে ধরা হয়– (১) অবিলম্বে (ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম স্থগিত রাখা, (খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের উদ্যোগ বন্ধ করা এবং (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ বাতিল পূর্বক উন্নয়ন বোর্ড বিলুপ্ত করা; (২) সেনা ও বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, ইকোপার্ক ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণার নামে জুম্মদের জায়গা-জমি অধিগ্রহণ ও বেদখলের প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং ইতোমধ্যে গৃহীত প্রকল্প বাতিল করা; (৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং (৪) কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনাসহ চুক্তি পরবর্তী জুম্ম নারীর উপর সহিংসতার নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দোষীদের যথাযথ বিচারের ব্যবস্থা করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি

বাঙ্গালহালিয়ায় যুব সমিতির ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৫ আগস্ট ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজস্থলী থানা যুব সমিতির সভাপতি সুভাষ তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন অধিবেশনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাজস্থলী থানা শাখার সভাপতি পুলুখই মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তাপস চাকমা। সম্মেলন শেষে মংবাচিং মারমাকে সভাপতি ও সুইচিং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যুব সমিতির নতুন বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়ন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

রাজস্থলীতে যুব সমিতির সাংগঠনিক সফর ও বিভিন্ন গ্রাম কমিটি গঠিত

গত ১৭ সেপ্টেম্বর-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির সাংগঠনিক সফর অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৯টি গ্রামে গ্রাম শাখার কমিটিও গঠন করা হয়। সাংগঠনিক সফরে নেতৃত্ব দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সদস্য টুনু চাকমা, যুব সমিতির রাজস্থলী থানা শাখার সহ-সভাপতি রটিল তঞ্চঙ্গ্যা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মাটিরাঙ্গা থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিরঞ্জন ত্রিপুরা। নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ৯টি গ্রাম সফর করেন এবং প্রতিটি গ্রামে ৯ সদস্য বিশিষ্ট গ্রাম কমিটি গঠন করেন। কমিটিগুলি হল–দীলিপ ত্রিপুরাকে সভাপতি ও চন্দ্রসিং ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক করে বলিপাড়া গ্রাম কমিটি, অসীম ত্রিপুরাকে সভাপতি ও সুমন ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক করে কৃষ্টপাড়া গ্রাম কমিটি, যতিন লাল ত্রিপুরাকে সভাপতি ও বাবুচান ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক করে দক্ষিণছড়ি গ্রাম কমিটি, বংসুল ত্রিপুরাকে সভাপতি ও ঈশ্চর চন্দ্র ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক করে মিতিঙ্গাছড়ি গ্রাম কমিটি, লালমনি ত্রিপুরাকে সভাপতি ও শুক্রমনি ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক করে তলাছড়ি পাড়া গ্রাম কমিটি, সিমন ত্রিপুরাকে সভাপতি ও গঙ্গামনি ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক করে হাতিছড়া গ্রাম কমিটি, চিলাপ্রু ত্রিপুরাকে সভাপতি ও শুক্র ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক করে নারাইছড়ি গ্রাম কমিটি, হাসুমনি ত্রিপুরাকে সভাপতি ও লাভা ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক করে মুইদং পাড়া গ্রাম কমিটি, উষামং খিয়াংকে সভাপতি ও পিটর খিয়াংকে সাধারণ সম্পাদক করে অংজাই পাড়া গ্রাম কমিটি।

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত করা'র দাবিতে
যুব সমিতির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত করা'র দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

ঐদিন সকাল ১০:৩০টায় শহরের কল্যাণপুর মুখ হতে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বনরূপা ঘুরে এসে ডিসি অফিসের দক্ষিণ ফটকে এসে সমাপ্ত হয় এবং সেখানেই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুনির্মল দেওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা, মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক জোনাকী চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের আগে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ অবিলম্বে স্থগিত করা না হলে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

এছাড়া নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয়ে পার্বত্য চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী গ্রেনেড হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান।

আন্তর্জাতিক সংবাদ

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৩তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত, জনসংহতি সমিতির দু'জন প্রতিনিধির যোগদান

গত ১২-২৩ মে ২০১৪ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৩তম অধিবেশন নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মঙ্গল কুমার চাকমা ও উজানা লারমা তালুকদার অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অধিবেশনে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সদস্য রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায় ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আরো যোগদান করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের বিনতাময় ধামাই, কাপেং ফাউন্ডেশনের পল্লব চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের এলসা স্টামাটোপোলো ও হানা সামস আহমেদ প্রমুখ অধিকার কর্মীরা। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে যোগ দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা ও ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা।

এবারের অধিবেশনের প্রতিপ্রাদ্য বিষয় ছিল "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে বিধৃত সুশাসনের মূলনীতি"। প্রতিপ্রাদ্য বিষয়ের উপর এশিয়া আদিবাসী ককাসের পক্ষে জনসংহতি সমিতির মঙ্গল কুমার চাকমা বক্তব্য প্রদান বলেন। তিনি মানবাধিকার বিষয়ক আলোচ্য সূচিতে আরেক পৃথক বক্তব্য প্রদান করেন। মানবাধিকার বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করলেও সরকার চুক্তি অনুযায়ী প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে গঠিতপার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের গুরুত্ব ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তর করেনি। এসব পরিষদের নির্বাচন

বক্তব্য রাখছেন উজানা লারমা তালুকদার

অনুষ্ঠানের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো সুশাসন গড়ে উঠেনি বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সমতলের আদিবাসীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ কার্যাদি বিভাগে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের অংশগ্রহণ, পরামর্শ ও সম্মতির কোন সুযোগ নেই। আদিবাসীদের দাবি সত্ত্বেও আদিবাসীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে উক্ত বিভাগে একটি উপদেস্টা কমিটি গঠনের প্রস্তাব সরকার উপেক্ষা করে চলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জনসংহতি সমিতির আরেক প্রতিনিধি উজানা লারমা তালুকদার উদ্ভূত ইস্যুসহ স্থায়ী ফোরামের ভবিষ্যত কর্ম সংক্রান্ত ৮নং আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় ও অধিকার স্বীকৃতি বিষয়ে জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্র ও আদিবাসীদের মধ্যে ধারাবাহিক সংলাপ ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের প্রথা ও রীতি অনুসারে তাদের জাতিগত পরিচিতি ও সদস্য নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র, বিশেষত এশিয়ার দেশগুলো আদিবাসীদের পরিচিতি ও অধিকার স্বীকৃতি প্রদানে উপেক্ষা করে চলেছে। এটা আদিবাসী জাতিসমূহকে, বিশেষ এশিয়ার আদিবাসীদেরকে আরো বেশি প্রান্তিকতা ও বঞ্চনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আদিবাসীদেরকে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জাতিসত্তা ও সম্প্রদায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা আদিবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে তথা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংঘাত নিরসণের স্বার্থে সদস্য-রাষ্ট্র ও আদিবাসীদের ব্যাপক ভিত্তিক সংলাপ ও পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত করা জরুরি বলে তিনি অভিমত তুলে ধরেন।

এছাড়া রাজা দেবাশীষ রায় বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ে, কাপেং ফাউন্ডেশনের পল্লব চাকমা ভূমি বিরোধ ও ভূমি দাবি নিরসন সম্পর্কিত উত্তম প্রথা ও উদাহরণ সংক্রান্ত ৩নং আলোচ্য বিষয়ে এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের বিনতাময় ধামাই ভূমি কমিশন, এশিয়া বিষয়ে অর্ধ-দিবস আলোচনা, আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন, আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোটিয়রের সাথে সংলাপ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এশিয়া বিষয়ে অর্ধ-দিবস আলোচনায় (৫ নং আলোচ্য বিষয়) অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ফোরামের কোন দলিলে বা বক্তব্যে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার না করার জন্য ফোরামকে পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ সরকার দেশের সকল নাগরিককে আদিবাসী হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। দেশের লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও জনমিতিগত দলিল ও বৈশিষ্ট্য

অনুসারে, দেশের জনসমষ্টির অংশ বিশেষ ও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বেলায় সংশ্লিষ্ট আইএও কনভেনশনে বিধৃত "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী" সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বরাবরের মতো সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিশীল বলে উল্লেখ করেন। নারীর উপর সহিংসতার ক্ষেত্রে সারাদেশের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের ঘটনা অনেক কম বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের ঘটনা বেশি দেখানোর এবং যথাযথ প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী হিসেবে দেখানোর কোন সুযোগ নেই বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, সাধারণত আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের মতো জাতিসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে জাতিসংঘস্থ দেশের স্থায়ী মিশন থেকে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। কিন্তু অভিনবভাবে এবারই প্রথম ঢাকা থেকে দু'জন আদিবাসীকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আদিবাসীদের মুখ দিয়ে আদিবাসী বিরোধী বক্তব্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা ও ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা কেবলমাত্র এশিয়া বিষয়ে অর্ধ-দিবস আলোচনায় (৫ নং আলোচ্য বিষয়) অংশগ্রহণ করেছিলেন। দু সপ্তাহ ব্যাপী চলমান অন্যান্য কোন অধিবেশনে তারা আর অংশগ্রহণ করেননি অথবা তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সাথে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদের বৈঠক

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৩তম অধিবেশনের পর ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ নিউইয়র্কের জেকশন হাইটের এক রেষ্টুরেন্টে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের নিউইয়র্ক শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের এক নৈশভোজ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির পক্ষে মঙ্গল কুমার চাকমা ও পল্লব চাকমা এবং ঐক্য পরিষদের নিউইয়র্ক শাখার সভাপতি নবেন্দু দত্ত, সিতাংশু গুহ, ড. টমাস ডুলু রায়, শ্যামল চক্রবর্তী, রতন তালুকদার, নয়ন বড়ুয়াসহ ১২ জন নেতা উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গল কুমার চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিষয়ে ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রভাবাভিযান চালানো ও জনমত গঠনের ক্ষেত্রে তিনি নিউইয়র্কস্থ ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করেন। পল্লব চাকমা সারাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন। ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দও দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিষয়েতাদের মতামত তুলে ধরেন এবং দেশে প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান তথা সংখ্যালঘুসহ দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধির যোগদান

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬/২৯৬ রেজুলেশন মোতাবেক গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের (৬৯তম অধিবেশন) একটি উচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন- যাকে আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন নামে অভিহিত করা হয়েছিল- (A high-level plenary meeting of the General Assembly to be known as the World Conference on Indigenous Peoples) নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক প্রথম বিশ্ব সম্মেলন। আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন নামে খ্যাত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এই ৬৯তম অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের অভীষ্ঠ লক্ষ্য ত্বরান্বিত করা। এ সম্মেলনে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের সমঝোতা দলিল- যাকে "আউটকাম ডকুমেন্ট" বলা হয়- সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

এ বিশ্ব সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের বিশেষজ্ঞ সদস্য রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ সাধারণ সম্পাদক এবং এ বিশ্ব সম্মেলনের গ্লোবাল কোঅর্ডিনেটিং গ্রুপের সদস্য বিনতাময় ধামাই, কাপেং ফাউন্ডেশনের লিনা জেসমিন লুসাই ও মেইনথেইন প্রমিলা, বৃহত্তর সিলেট আদিবাসী ফোরামের পিডিশন প্রধান প্রমুখ আদিবাসী অধিকার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল ৯:০০ ঘটিকায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের হলে সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনের সভাপতি মি. কুতেসা-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। হৌডেনোসৌনির প্রধান সিড্ড হিল-এর আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী প্রার্থনার মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অন্যান্যের মধ্যে উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষন দেন জাতিসংঘের মহাসচিব বান-কি মুন, বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মুরালেস, পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য গ্রুপের পক্ষে ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট সৌলি নিনিস্টো, আফ্রিকা রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে কঙ্গো প্রেসিডেন্ট ডেনিস সাচ্চোউ, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে এস্তোনিয়ার প্রসিডেন্ট টোমাস হেনরিক ইলভেস, ল্যাতিন আরেরিকা ও ক্যারিবেয়ান রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট এনরিক পেনা নিয়েটো, আর্কটিক আদিবাসী অঞ্চলের পক্ষে কলম্বিয়ার সিনেটর লুইস ইভেলিস, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার জেইড রাদ আল-হুসেইন এবং জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের চেয়ারপার্সন ড. ডালি সাম্বো ডোরোক।

উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতিসংঘের মহাসচিব বান-কি মুন বলেন, সকল উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীতব্য আউটকাম ডকুমেন্ট-এর মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের মধ্যকার ফারাক কমে আসবে। তিনি অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ এবং আদিবাসীদের মধ্যকার অংশীদারিত্ব জোরদারকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সম্মেলনের সফলতা সকল মানবতার অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনের সভাপতি মি. কুতেসা তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, আদিবাসী জাতিসমূহ নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং সেজন্য সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের উচিত তাদের প্রতিশ্রুতি আরো নতুন করে পুনর্ব্যক্ত করা এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র- যাতে আদিবাসীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকারের প্রতি সর্বসম্মতি ও সুরক্ষার বিধান করা হয়েছে- তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। সম্মেলন আয়োজনের ইতিহাসে এই সম্মেলন আয়োজন সংক্রান্ত প্রক্রিয়াটি হচ্ছে একটি অভূতপূর্ব, কেননা এই সম্মেলন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তথা সর্বসম্মত একটি "আউটকাম ডকুমেন্ট" অর্জনে সদস্য-রাষ্ট্র ও আদিবাসী জাতিসমূহের সহযোগিতার ক্ষেত্রে আদিবাসী জাতিসমূহকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি ইভো মুরালেস, যিনি স্বয়ং একজন আদিবাসী, তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, জীবন, মাতাধরিত্রী ও শান্তি হলো আদিবাসী জাতিসমূহের মৌলিক নীতি, যেগুলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আগ্রাসনে আজ হুমকির মধ্যে পড়েছে। ব্যাঙ্ক ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বলিভিয়ায় আদিবাসীদের আন্দোলনের ফলে আদিবাসীরা কেবল ভোট প্রদানে সক্ষম হয়নি, সরকারও পরিচালনা করছে। জলবায়ু পরিবর্তন এই গ্রহের প্রধানতম গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এটাকে আদিবাসী জাতিসমূহের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মোকাবেলা করাই হচ্ছে উত্তম পন্থা, কেননা আদিবাসীরা জানে মাতা ধরিত্রীর সাথে কিভাবে সম্প্রীতি রেখে বাঁচতে হয়। তিনি আদিবাসী জাতিসমূহের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের "আউটকাম ডকুমেন্ট" সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত আউটকাম ডকুমেন্টে ৪০টি কার্যপরিচালনাকারী প্যারাগ্রাফ রয়েছে যেখানে জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহ আদিবাসীদের অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। আদিবাসীদের অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি, ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদ, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা, প্রথাগত জ্ঞান, পৃথক পরিসংখ্যান সম্বলিত তথ্য, জাতিসংঘের সংস্থা ও বিশেষায়িত এজেন্সী, ২০১৫-উত্তর উন্নয়ন, আদিবাসী যুব ও নারী উন্নয়নসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ।

সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের সমঅংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আদিবাসী প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা ও সমঝোতা সাপেক্ষে এই আউটকাম ডকুমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়। আদিবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ এই আউটকাম ডকুমেন্টকে স্বাগত জানান। তবে সেই সাথে তাঁরা এই মর্মে উদ্বেগও প্রকাশ করেন যে, এই ডকুমেন্টে আদিবাসীদের উপর চলমান রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, আদিবাসী ভূখন্ডে সামরিকায়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাজনৈতিক নিপীড়নের বিষয়ে কোন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। অধিকন্তু আন্তঃরাষ্ট্রীয় আলোচনার সময় আদিবাসীদের প্রস্তাবিত অনেক বিষয় দুর্বল, পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে এবং এমনকি কতিপয় ক্ষেত্রে যেখানে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের বিধানও যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি বলে আদিবাসী প্রতিনিধিবৃন্দ অভিযোগ করেন।

সম্মেলনে যথাক্রমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়নে জাতিসংঘ ব্যবস্থার পদক্ষেপ, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়ন এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের অধিকার- এই তিনটি বিষয়ে পৃথক তিনটি গোলটেবিল আলোচনা এবং ২০১৫-উত্তর স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন কর্মসূচিতে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার সংক্রান্ত একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে ২৩ সেপ্টেম্বর বিকাল ৬:০০ ঘটিকায় সমাপনী অধিবেশনের মাধ্যমে আদিবাসী বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী প্রতিনিধিদের মধ্যে রাজা দেবাশীষ রায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়নে জাতিসংঘ ব্যবস্থার পদক্ষেপ এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের অধিকার সংক্রান্ত যথাক্রমে ১ম ও ৩য় গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য প্রদান করেন। জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি মঙ্গল কুমার চাকমা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ২য় গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিনতাময় ধামাই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়নে জাতিসংঘ ব্যবস্থার পদক্ষেপ এবং ২০১৫-উত্তর স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন কর্মসূচীতে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার সংক্রান্ত যথাক্রমে ১ম গোলটেবিল আলোচনা ও প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মঙ্গল কুমার চাকমা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গোলটেবিল আলোচনায় বলেন, বাংলাদেশ সরকার সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আদিবাসী জাতিসমূহের উপর জোর করে উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ইত্যাদি অভিধা চাপিয়ে দিয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে স্রেফ আদিবাসীদের সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু

আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার, আদিবাসীদের অংশগ্রহণ, পরামর্শ এবং স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির অধিকার ব্যতীত সংস্কৃতি সুরক্ষা করা যায়নি। কিন্তু সংবিধানে সেসব অধিকারের স্বীকৃতি নেই। অধিকন্তু সরকার আদিবাসীদের অংশগ্রহণ, পরামর্শ এবং স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির অধিকার লঙ্ঘন করে একতরফাভাবে আদিবাসী সংশ্লিষ্ট আইন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে যা আদিবাসীদেরকে আরো বঞ্চনা ও প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এই বিশ্ব সম্মেলনের বিভিন্ন গোলটেবিল ও প্যানেল আলোচনায় জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রের অনেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী থেকে শুরু করে আদিবাসী ও উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী যোগদান করে বক্তব্য প্রদান করলেও বাংলাদেশের মন্ত্রী পর্যায়ের কেউ অংশগ্রহণ করেননি। অথচ সেসময় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে, বিশেষ করে জলবায়ু সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ১০জন মন্ত্রী সফর করছিলেন বলে জানা যায়। এ থেকে দেশের অধিকার-বঞ্চিত, বৈষম্য-জর্জরিত ও দারিদ্র-পীড়িত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই অনুমান করা যায়। এই বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা কেবলমাত্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের অধিকার সংক্রান্ত ৩য় গোলটেবিল আলোচনায় যোগদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বরাবরই মতো হাস্যকরভাবে দাবি করেন যে, বাংলাদেশে যারা আছে তারা সবাই আদিবাসী। পক্ষান্তরে আবার আদিবাসীদেরকে 'আদিবাসী' না বলে 'এথনিক মাইনোরিটি' বা 'জাতিগত সংখ্যালঘু' করে বলেন, বাংলাদেশ সরকার সংবিধানে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। তারই আলোকে সরকার জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৩টি বিষয় হস্তান্তরিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। ইত্যাদি চুক্তি বাস্তবায়নের সাফাই গেয়ে চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়সমূহ আড়াল করার চেষ্টা করেন।

গত ৪ নভেম্বর ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসীর গুলিতে খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলা সদরে নিজ বাড়ির পাশে শহীদ হন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মানিকছড়ি থানা এলাকার তৎকালীন সংগঠক আপ্রু অং মারমা ওরফে পেসকা (৩২) পীং- অংশা মারমা।

গত ২১ নভেম্বর ২০১৩ বাঘাইছড়ির সিজকে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে শহীদ হন শশাঙ্ক মিত্র চাকমা ওরফে প্রীতিষবাবু (৫৮) ও নন্দ কুমার চাকমা (৪৬)। মৃত্যুর কিছুদিন আগে রাঙ্গামাটিতে শহর এলাকায় তোলা ছবিটির সামনে ডানদিকে নিজের নাতিকে কোলে প্রীতিষবাবু আর একটু পেছনে বামদিকে (প্রীতিষবাবুর ডানদিকে) নন্দ কুমার চাকমা। তাঁরা উভয়েই জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য যাঁরা জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় বিসর্জন দিয়েছিলেন জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। অস্ত্র সমর্পণের পরও তাঁরা একই চেতনায় উজ্জীবিত থেকে জনসংহতি সমিতির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিজেদের ভূমিকা সমুন্নত রাখেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রীতিষবাবু পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি ও নন্দ কুমার চাকমা সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেই বিভেদপন্থী জাতিবিধ্বংসী হত্যাকারীদের ধিক্কার জানাই। লাল সালাম ও গভীর শ্রদ্ধা জানাই শহীদদের।